[On Education]

বার্ট্রাণ্ড রাসেল

অনুবাদক

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চন্দ

কলিকাতা পুস্তকালয়

শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ
মার্চ, ১৯৫৫

দ্বিতীয় সংস্করণ
ডিসেম্বর ১৯৫৭

তৃতীয় সংস্করণ
জানুয়ারী ১৯৬৫

প্রকাশক :
শ্রীমণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী
কলিকাতা পুস্তকালয়
৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
সলিল কুমার বসু
এশিয়ান প্রিণ্টার্স
পি-১২, সি. আই. টি. নিউ রোড
কলিকাতা-১৪

শ্রীমতী সুব্রতা চন্দ

করকমলেষু

সাপ্তাহিক দেশ বলেন—

শিশুর কল্পনা, ভয়, কৌতূহল, স্নেহ-মমতার ক্ষুধা, স্বাস্থ্যবোধ ইত্যাদি যাবতীয় প্রসঙ্গের শিক্ষাপ্রদ, চিন্তাজনক আলোচনা আছে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের On Education বইখানিতে। শিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র চন্দ সেই প্রবন্ধগুলির মূলানুগ অনুবাদ করে বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের শ্রী ও সমৃদ্ধি বাড়ালেন তো বটেই, তাছাড়া বাংলা ভাষাভাষী পিতামাতার উপকার করলেন।...নারায়ণবাবুর অনুবাদ সুখপাঠ্য। বইখানির ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদি সবই নিখুঁৎ।

দৈনিক যুগান্তর বলেন—

বর্তমানযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী লর্ড বার্ট্রাণ্ড রাসেলের On Education একটি মূল্যবান চিন্তাশীল গ্রন্থ।...শিক্ষার সহিত মনস্তত্ত্ব ও সমাজ-বিজ্ঞানের যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ সে কথা বিস্মৃত হইলে শিক্ষা যান্ত্রিক হয়া পড়ে এবং শিক্ষার্থীকে ব্যক্তি-চরিত্রের বিকাশ ঘটানোর পরিবর্তে তাহার স্বাভাবিক মানসিক শক্তি ও প্রবণতা দিনের পর দিন সঙ্কুচিত হইয়া যায়। ইহার ফল হয়ভয়াবহ, শিক্ষিত সৃষ্টি হয় কিন্তু মানুষ সৃষ্টি হয় না।

এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া মনস্তত্ত্ব ও সামাজিক চৈতন্যমূলক যে নূতন শিক্ষাপদ্ধতির সর্বাঙ্গীণ প্রবর্তনের যুগ আসিয়াছে রাসেলের বইটি তাহার উপরে আলোক সম্পাত করিবে। চিন্তার যে স্বাধীন বলিষ্ঠতার জন্য রাসেল কীর্তিত আলোচ্য গ্রন্থেও তাহার পরিচয় রহিয়াছে।

মনস্বী দার্শনিক রাসেলের অনবদ্য রচনাগুলিকে বাংলায় রূপান্তরিত করা অসম্ভব। অনুবাদকের নিষ্ঠা সেদিক হইতে তাহাকে অনেকখানি সাফল্য দিয়াছে। বইখানি শিক্ষিত, শিক্ষার্থী ও শিক্ষাব্রতী মহলে সাগ্রহে পঠিত হইবে বলিয়া আমরা আশাকরি।

দৈনিক আনন্দবাজার বলেন—

চিন্তানায়ক রাসেলের নূতন করে পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।...বইটি অভিভাবক ও শিক্ষকদের জন্য লিখিত.........প্রথমাবধিই কীভাবে শিশুকে মানুষ করে তুলতে হবে, ভাবীকালে তার মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য শৈশব ও কৈশোর থেকে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন—আলোচ্য গ্রন্থে রাসেল তা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। অনুবাদ সুখপাঠ্য। এই গ্রন্থের অনুবাদ করে শ্রীচন্দ একটি সামাজিক কর্তব্য পালন করেছেন।

ভূমিকা

সংসারে এমন অনেক পিতামাতা আছেন যাঁহারা বর্ত্তমান লেখকের মত নিজেদের ছেলেমেয়েদিগকে যথাসম্ভব উৎকৃষ্ট শিক্ষা দিতে চান কিন্তু বর্ত্তমানের অধিকাংশ বিদ্যালয় নানা ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া সেখানে পাঠাইতে ইচ্ছুক নহেন। বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিগত চেষ্টা দ্বারা এইরূপ পিতামাতার অসুবিধা দূর করা সম্ভব নহে। অবশ্য বাড়িতে শিক্ষয়িত্রী বা গৃহশিক্ষক রাখিয়া সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা-দান করা যায় কিন্তু ইহার ফলে তাহাদিগকে সমবয়সীদের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিতে হয়। স্বভাবতই শিশুরা সমবয়সীদের সঙ্গ কামনা করে, ইহা না পাইলে তাহাদের শিক্ষার অঙ্গহানি ঘটে। অধিকন্তু, কোন বালক বা বালিকা অন্যান্য বালকবালিকাদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে না পারিয়া যদি নিজেকে বেমানান বা অন্যদের হইতে পৃথক মনে করে, তাহাতে বড়ই কুফল ফলে। যদি তাহারা মনে করে যে, তাহাদের পিতামাতার জন্যই সঙ্গীদের নিকট বেখাপ্পা হইয়া পড়িয়াছে, তবে তাহাদের মনে পিতামাতার নিকট যাহা সবচেয়ে অপ্রীতিকর তাহাই তাহারা ভালবাসিতে শুরু করে। এইসব বিষয় বিবেচনা করিয়া বিবেকবান অভিভাবক আদৌ কোথাও ভাল স্কুল না থাকায় কিংবা দুই একটা থাকিলেও তাঁহাদের নিজেদের অঞ্চলে না থাকায়, বহু দোষত্রুটিপূর্ণ বিদ্যালয়েই ছেলেমেয়েদিগকে পাঠাইতে বাধ্য হন। এইভাবে সন্তানের কল্যাণ-কামী জনক জননীকে শুধু সমাজের মঙ্গলের জন্যই নয়, নিজেদের সন্তানবর্গের মঙ্গলের জন্যও শিক্ষা-সংস্কারের প্রতি মনোনিবেশ করিতে হয়। পিতামাতার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হইলে তাঁহাদের সন্তানদের শিক্ষাসমস্যা সমাধানের জন্য সকল স্কুলই ভাল না হইলেও চলে, দেশের মধ্যে যেখানেই হোক উপযুক্ত স্কুল থাকিলেই হইল। কিন্তু দিনমজুর জনকজননীর পক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার বিনা কিছুতেই উপকার হইবে না। একজন অভিভাবক যেরূপ শিক্ষা-সংস্কার কামনা করেন অপর একজন হয়ত তাহার বিরোধিতা করিবেন। ইহার ফলে আরম্ভ হইবে শিক্ষা সম্বন্ধে প্রবল আন্দোলন কিন্তু সংস্কারকগণের শিশু সন্তানসন্ততির বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বে এ আন্দোলনের ফল প্রাপ্তির আশা করা বৃথা। এইভাবে দেখা যাইতেছে আমাদের নিজেদের সন্তানের প্রতি স্নেহের জন্যই আমরা ধাপে ধাপে রাজনীতি ও দর্শনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে গিয়া উপনীত হই।

এই বিস্তৃত ক্ষেত্র হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিতে চেষ্টা করিব। যে বিষয়গুলি বর্ত্তমান যুগে বিরুদ্ধ মতবাদ ও প্রধান তর্কের স্থল হইয়া আছে সেগুলি সম্বন্ধে

আমি যে অভিমতই পোষণ করি না কেন, এই পুস্তকে বর্ণিত বক্তব্যের অধিকাংশ তাহা দ্বারা প্রভাবান্বিত নয়। তবে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবমুক্ত হওয়াও অসম্ভব। মানবচরিত্র সম্বন্ধে আমাদের আদর্শ কি এবং আমাদের সন্তানসন্ততিকে সমাজে কিরূপ কাজে আত্মনিয়োগ করাইতে চাই তাহার উপরই নির্ভর করে আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার স্বরূপ কেমন হইবে। যুদ্ধকামীর নিকট যে শিক্ষা শ্রেয় মনে হয়, শান্তিকামী তাহা নিজের সন্তানের জন্য পছন্দ করিবেন না। একজন কম্যুনিষ্টের শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদীর দৃষ্টিভঙ্গীর অনুরূপ হইবে না। একটি মৌলিক মত পার্থক্যের ক্ষেত্রে আসা যাক্ঃ একদল লোক মনে করেন শিক্ষা কতকগুলি নির্দিষ্ট বিশ্বাস সঞ্চারিত করার উপায়স্বরূপ : আবার একদল মনে করেন শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল স্বাধীন বিচারক্ষমতা জাগ্রত করা। এই দুই দলের মধ্যে মিল হওয়া অসম্ভব। যেখানে এইরূপ বিষয় প্রসঙ্গতঃ আসে সেখানে এড়াইয়া গেলে চলে না। আবার শিক্ষামনস্তত্ত্ব ও শিক্ষণতত্ত্বের (Pedagogy) ভিতর এমন অনেক জানিবার বিষয় আছে, যাহা এইরূপ প্রশ্ন হইতে স্বতন্ত্র এবং শিক্ষার সহিত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। ইতোমধ্যেই ইহা হইতে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গিয়াছে কিন্তু এই নূতন জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার পূর্বে অনেক কিছু করণীয় আছে। জীবনের প্রথম পাঁচ বৎসর সম্বন্ধে ইহা বিশেষভাবে সত্য। এই সময়ের উপর পূর্বে যতটুকু গুরুত্ব আরোপ করা হইত, পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহার গুরুত্ব তাহার চেয়ে অনেক বেশী। জীবনের প্রথম পাচ বছরের উপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে শিক্ষা সম্বন্ধে পিতামাতার গুরুত্বও বাড়িয়া যায়।

আমার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হইল যেখানে সম্ভব বিতর্কমূলক বিষয়গুলি পরিহার করা। কোন কোন ক্ষেত্রে বিতর্কমূলক রচনার প্রয়োজন আছে কিন্তু জনক-জননীকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত রচনার মধ্যে তাঁহাদের সন্তানদের কল্যাণকামনা থাকাই বাঞ্ছনীয়। শিশুর কল্যাণকামনার সঙ্গে আধুনিক জ্ঞানের সংযোগ ঘটিলে অনেক শিক্ষা সমস্যার সমাধান পাওয়া যাইতে পারে। আমার নিজের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান ব্যাপারে যে জটিলতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহা অবলম্বন করিয়াই এ পুস্তক লিখিত। অতএব ইহা কেবল সুদূর পরাহত বা তাত্ত্বিক (theoretical) আলোচনা নয়, আশা করা যায় ইহা যেসব পিতামাতা সন্তানের শিক্ষার জন্য অনুরূপ জটিলতা উপলব্ধি করিতেছেন, তাঁহাদের চিন্তাধারাকে কথঞ্চিৎ স্বচ্ছ করিতে পারিবে—তাঁহারা আমার সঙ্গে একমত হউন বা না হউন তাহাতে কিছু যায় আসে না। পিতামাতার মতামত যথেষ্ট মূল্যবান; উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে অনেক সময় তাঁহারা শ্রেষ্ঠ

শিক্ষাবিদগণের প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইয়া পড়েন। পিতামাতা যদি তাঁদের পুত্রকন্যার জন্য সুশিক্ষা চান, আমার স্থির বিশ্বাস আছে যে, ইচ্ছুক এবং যোগ্য শিক্ষকের অভাব হইবে না।

এই পুস্তকে আমি প্রথম আলোচনা করিব শিক্ষার লক্ষ্য কি : কি ধরনের ব্যক্তি এবং কি ধরনের সমাজ আমরা গড়িয়া তুলিতে চাই। স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক যে-কোন প্রক্রিয়াতেই হোক্ সুশ্রী, সুঠাম উন্নত ধরনের লোক প্রজননের প্রশ্ন এখানে বিবেচনা করিব না, ইহা মূলতঃ শিক্ষাসমস্যার বাহিরের বিষয়। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানের আবিষ্কারের উপর আমি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি। ইহা দেখাইয়াছে যে, আমাদের পূর্ব পূর্ব প্রজন্মের (generation) উৎসাহী শিক্ষাবিদ্‌গণ শিশুর চরিত্রগঠনের উপর বাল্যশিক্ষার যতটুকু প্রভাব আছে বলিয়া অনুমান করিতেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা তদপেক্ষা অনেকগুণ বেশী। আমি শিক্ষাকে দুইটি পৃথক ভাগে ভাগ করিতেছি—চরিত্রের শিক্ষা ও জ্ঞানের শিক্ষা (education in knowledge)। সঠিকভাবে বলিতে গেলে শেষেরটিকেই বলা চলে শিক্ষণ বা শিক্ষাদান। এই ভাগ শেষ পর্যন্ত না টিকিলেও ইহার উপকারিতা আছে। যে ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহার মধ্যে কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক ; এবং অনেক প্রয়োজনীয় গুণের সার্থক প্রয়োগের জন্য যথেষ্ট জ্ঞানেরও আবশ্যকতা আছে। আলোচনার খাতিরে শিক্ষণ বা শিক্ষাদানকে চরিত্রের শিক্ষা হইতে পৃথক করিয়া রাখা যায়। আমি প্রথমে চরিত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিব, কারণ বাল্যবয়সে ইহা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। এই আলোচনার জের আমি কৈশোরের ভিতর দিয়া যৌবনাগম পর্যন্ত টানিয়া লইব এবং এই প্রসঙ্গে যৌনশিক্ষার প্রশ্নও বিবেচনা করিব। অবশেষে আমার আলোচনার বিষয় হইবে হাতেখড়ি ও অক্ষর পরিচয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বুদ্ধিমূলক (intellectual) শিক্ষা, ইহার লক্ষ্য, ইহার পাঠক্রম ; ইহার সম্ভাব্যতা। জীবন এবং কর্মক্ষেত্র হইতে মানুষ যে অতিরিক্ত শিক্ষালাভ করে, তাহা আমার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করি নাই। কিন্তু বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ যাহাতে অভিজ্ঞতা হইতে জ্ঞানলাভ করিতে পারে সে বিষয়ে বালকবালিকাদিগকে সক্ষম করিয়া তোলা বাল্যকালীন শিক্ষার একটি বিশিষ্ট উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত।

অনুবাদকের নিবেদন

ইংরেজ মনীষী লর্ড বার্ট্রাণ্ড রাসেল একজন সুপরিচিত দার্শনিক ও গণিতবিদ্। মৌলিক এবং বলিষ্ঠ চিন্তা-ধারার জন্য তিনি জগৎ-জোড়া খ্যাতির অধিকারী। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে তাঁহার মননশীলতা বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

তাঁহার ON EDUCATION পুস্তকখানা ১৯২৬ সনে প্রকাশিত হয়। 'শিক্ষা-প্রসঙ্গ' তাহারই বাংলা অনুবাদ। ইহাতে শিশু ও শৈশব এবং শিশু-মনোবিজ্ঞান সম্পর্কিত তাঁহার যে অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বর্তমানে ইহা সর্বজনস্বীকৃত যে, শিক্ষার ভিতর দিয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশ লাভ করে; কাজেই উন্নত সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি — সব কিছুই নির্ভর করে সুশিক্ষার উপর, কেননা এসবের ধারক ও বাহক যে মানবদল তাহাদের চরিত্র গঠিত হয় শিক্ষার মাধ্যমেই। শিক্ষার প্রতি রাসেলের দৃষ্টিভঙ্গী উদার এবং ব্যাপক।

এই পুস্তক বিশেষ করিয়া পিতামাতা এবং শিক্ষকের জন্য লিখিত; লেখকের অভিমত তাঁহার নিজের সন্তানের পর্যবেক্ষণ এবং শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত। শিশুর চরিত্র কিভাবে গড়িয়া উঠে এবং কিভাবে ইহাকে সুন্দর, বলিষ্ঠ ও উন্নত রূপদান করা যায়, এ বইতে সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে। শিক্ষানীতি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, শিশুর চরিত্রগঠন, ভয়, খেলা, সত্যবাদিতা, শাস্তি, স্নেহ, যৌনশিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে রাসেলের মতামতের সঙ্গে প্রত্যেক সন্তান-কল্যাণকামী পিতামাতার পরিচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি।

বাংলা অনুবাদ যথাযথ এবং মূলানুগ করার চেষ্টা করা হইয়াছে। অল্প কয়েকটি স্থানে গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত ভাব একটু বিশদ করিবার জন্য যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা বন্ধনী-চিহ্নের মধ্যে দেখান হইয়াছে। এই অনুবাদ-গ্রন্থের ভিতর দিয়া যদি সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের দেশে পিতামাতার মনে কিছুটা দায়িত্ববোধ জাগাইতে পারি, এরূপ মানসিক আলোড়নের ফলে আমাদের ভাবী নাগরিকদিগের সুষ্ঠু জীবনগঠনে যদি কিছুটা সহায়তা হয়, যদি বাংলা সাহিত্যের একটা দিকে অন্ততঃ কিছুটা পুষ্টি সম্পাদিত হয় তবে আমার সকল শ্রম সার্থক মনে করিব।

টাকী গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুল
দোলপূর্ণিমা
১৩৬১

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

দ্বিতীয় সংস্করণ

শিক্ষা-প্রসঙ্গ প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর বইখানি বিবিধ সাময়িক ও শিক্ষাবিষয়ক পত্রিকায় অভিনন্দিত হয়। শিক্ষাবিদ্ এবং শিক্ষাব্রতী মহলে এর সমাদর হয়েছে দেখে আমরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করছি। বই-এর উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধনের জন্য সুধীজনের প্রস্তাব ও উপদেশ সাদরে গৃহীত হবে।

ন. চ.

জলপাইগুড়ি জিলা স্কুল
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪

তৃতীয় সংস্করণ

বিশ্ববিখ্যাত চিন্তানায়ক লর্ড্ রাসেলের শিশুর শিক্ষাবিষয়ক চিন্তাধারা তাঁহার গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত। তিনি নিজের শিশু সন্তানের আচরণ ও বুদ্ধির উন্মেষের প্রতিদিনকার বিবরণ সযত্নে রক্ষা করিয়া তাঁহার রচনার ভিত্তি করিয়াছেন। কিরূপ যত্ন অধ্যবসায়, চারিত্রিক সততা এবং দূরদৃষ্টি লইয়া পিতা-মাতাকে সন্তান পালনের দায়িত্ব বহন করিতে হয় লর্ড রাসেলের রচনায় তাহা সুপরিস্ফুট। আমরা মনে করি প্রতি চিন্তাশীল পিতামাতা রাসেলের অভিজ্ঞতা হইতে আচরণীয় কর্তব্যের পথ-নির্দেশ পাইতে পারেন। আর যাঁহারা ছোটদের শিক্ষা ও জীবন গঠনের কাজে ব্রতী, তাঁহাদের কাছেও 'শিক্ষা-প্রসঙ্গ' আলোক-বর্তিকার মতো দিক-নির্দেশক হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

প্রথম প্রকাশের পর হইতে 'শিক্ষা-প্রসঙ্গ' সংবাদপত্রে ও বিদ্বৎ-সমাজে সমাদৃত হইয়াছে। অনুবাদক হিসাবে ইহাতে আমাদের যথেষ্ট আত্মতৃপ্তি আছে।

'লেখনী,
বারাসাত
ঝুলন-পূর্ণিমা, ১৩৭১

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

সূচীপত্র

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

উনবিংশ অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব

আগের দিনের লেখা সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিষয়ক রচনা পাঠ করিলেও বোঝা যায় যে, বর্তমানের শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে এমন কিছু নূতনত্ব আসিয়াছে যাহা পূর্বেকার প্রামাণিক গ্রন্থের মধ্যেও ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেকার দুইজন বড় শিক্ষা-সংস্কারক লক্ (Locke) ও রুশো (Rousseau)। ইঁহারা উভয়েই খ্যাতির অধিকারী হইয়াছিলেন, কেননা তাঁহারা তৎকালে প্রচলিত শিক্ষা-সংক্রান্ত অনেক ভ্রম দূর করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিদ্ যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের কেহই ততদূর যান নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তাঁহারা উভয়েই উদারতা ও গণতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন, তথাপি উভয়েই কেবল অভিজাত শিশুর শিক্ষাই বিবেচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের পরিকল্পনায় একটি শিশুর শিক্ষার জন্য একজন বয়স্ক ব্যক্তি সর্বক্ষণ নিয়োজিত হইবে। ইহার ফল যতই উৎকৃষ্ট হোক না কেন, আধুনিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন কোন লোকই এ পরিকল্পনা বিবেচনার যোগ্য মনে করিবেন না, কারণ এক-একটি শিশুর জন্য একজন করিয়া সর্বক্ষণস্থায়ী গৃহ-শিক্ষকের ব্যবস্থা করা গাণিতিক দিক দিয়া অসম্ভব। আধুনিক মানুষ নিজের ছেলে-মেয়ের শিক্ষার জন্য বিশেষ কোন সুযোগ সুবিধার খোঁজ করিতে পারে কিন্তু যে শিক্ষাব্যবস্থা সকলের জন্য উন্মুক্ত নয়, অন্ততঃপক্ষে যাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ ঘটিলে তাহারা উপকৃত হইতে পারে এমন সকলের জন্যও উন্মুক্ত নয়—সে শিক্ষাপ্রণালীকে কেহ শিক্ষা বিস্তার সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম বলিয়া মনে করিবে না। অবশ্য একথা আমি বলি না যে, যে-সুযোগ সুবিধা সকলের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয় তাহা সচ্ছল লোকেরাও পরিহার করুন। ইহা করিলে ন্যায়ের কাছে সভ্যতাকে বিসর্জন দিতে হয়। আমি ইহাই বলিতে চাই যে, আমরা ভবিষ্যতের জন্য এমন শিক্ষাব্যবস্থা গড়িয়া তুলিব যাহা প্রত্যেকটি বালক-বালিকাকে আত্মবিকাশের জন্য পূর্ণ সুযোগ দান করিবে। আদর্শ শিক্ষা-ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক হইতে হইবে, যদিও এ আদর্শ অবস্থা লাভ করা সময় সাপেক্ষ। বর্তমান যুগে এ ব্যবস্থা সকলেই স্বীকার করিবেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলিতে আমি ইহাই বুঝাইতেছি। আমি এমন ব্যবস্থাই

সমর্থন করিব যাহা সর্বজনীন হইতে পারে, যদিও কেহ ব্যক্তিগতভাবে নিজের সন্তানসন্ততির জন্য অধিকতর সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিলে আমার আপত্তি করার কোন হেতু নাই। এইরূপ সংকুচিত গণতান্ত্রিক প্রণালীও লক্ ও রুশোর শিক্ষাবিষয়ক রচনাতে নাই। রুশো যদিও আভিজাত্যে বিশ্বাস করিতেন না, তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে কিন্তু এই বিশ্বাসহীনতার পরিচয় মেলে না।

গণতন্ত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। গণতন্ত্র বলিতে যদি ইহাই বুঝায় যে, সকলের জন্য একই স্তর সুনির্দিষ্ট থাকিবে, তবে তাহার ফল হইবে মারাত্মক। কতক বালকবালিকার বুদ্ধি অপরের চেয়ে বেশী এবং তাহারা উচ্চ শিক্ষা হইতে অন্যের তুলনায় অধিকতর সুফল লাভ করিতে পারে। কতক শিক্ষক উৎকৃষ্টতর শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, কাহারো বা স্বাভাবিক শিক্ষাক্ষমতা অপরের চেয়ে বেশী। কিন্তু **সকলের** পক্ষেই উত্তম শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করা অসম্ভব। সর্বোচ্চ শিক্ষাও সকলের জন্যই বাঞ্ছনীয় মনে করা গেলেও বর্তমানে ইহা কদাচ সম্ভবপর নয়। কাজেই গণতান্ত্রিক নীতি অপপ্রয়োগ করিয়া বলা চলে, যেহেতু উচ্চশিক্ষা লাভ সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে অতএব কাহাকেও ইহা দেওয়া উচিত নয়! এইরূপ নীতি গৃহীত হইলে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং শত বৎসরের জন্য শিক্ষার সাধারণ স্তর নীচে নামিয়া যাইবে। বর্তমান মুহূর্তে mechanical equality-র বা যান্ত্রিক সমতার জন্য অগ্রগতি ব্যাহত করা উচিত হইবে না। সামাজিক অবিচারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিলেও বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় মূল্যবান সুফল ও সম্ভাব্যতা যথাসম্ভব কম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকতা আনয়ন করিতে হইবে। অত্যন্ত সতর্কতার সহিত এ বিষয়ে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক।

শিক্ষাব্যবস্থা যদি সর্বজনীন অর্থাৎ সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য না হয় তবে তাহাকে সন্তোষজনক বলা চলে না। অর্থশালী লোকের ছেলেদের পরিচর্যার জন্য তাহাদের জননী ছাড়া ধাত্রী, পরিচারিকা ও অন্যান্য ভৃত্য থাকিতে পারে। কিন্তু যে-কোনরূপ সমাজব্যবস্থাতেই **সকল** ছেলেমেয়ের প্রতি এইরূপ যত্ন ও পরিচর্যার বিধান করা অসম্ভব। অতিরিক্ত আদর ও তত্ত্বাবধানের ফলে শিশুকে যে কোন সামান্য কাজের জন্য পরমুখাপেক্ষী করিলে ইহার ফল ভাল হয় কিনা সে বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ আছে। কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি ক্ষীণমনা (feebleminded) কিম্বা অসাধারণ প্রতিভাবান এই দুই শ্রেণীর অস্বাভাবিক বালকবালিকা ছাড়া অন্যের জন্য এরূপ পরিচর্যার ব্যবস্থা অনুমোদন করিবেন না। বর্তমান যুগে বিজ্ঞ পিতা তাঁহার ছেলেমেয়ের

শিক্ষার জন্য সর্বজনীন নয় এমন কোন শিক্ষণ-পদ্ধতি পরীক্ষামূলকভাবে অবলম্বন করিতে পারেন। এইরূপ পরীক্ষা সত্যই বাঞ্ছনীয়, তবে ইহা এরূপ হওয়া চাই যাহাতে সে-পদ্ধতি ফলপ্রদ হইলে যেন সকলের জন্য প্রয়োগ করা সম্ভবপর হয়; ইহা যেন কেবল অল্পসংখ্যক ভাগ্যবানের জন্যই সীমাবদ্ধ না রাখিতে হয়। সৌভাগ্যের কথা এই যে, বর্তমান যুগের শিক্ষাতত্ত্ব ও প্রণালীর কতক উৎকৃষ্ট উপাদান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হইতে পাওয়া গিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ম্যাডাম মন্তেসারি বস্তী অঞ্চলের শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়েই তাঁহার পরীক্ষামূলক কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ প্রতিভাবান ছাত্রের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিতেই হইবে কিন্তু যেরূপ শিক্ষা সকল ছাত্রই গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না।

আধুনিক শিক্ষার আরো একটি বিতর্কমূলক প্রবণতা আছে, ইহাও গণতন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এটি হইল শিক্ষাকে আলঙ্কারিক করার চেয়ে কার্যকরী করার আন্দোলন। ভেবেলেনের Theory of the Leisure class পুস্তকে আলঙ্কারিক (ornamental) শিক্ষার সঙ্গে আভিজাত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয় সুস্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে। শিক্ষার উপর এই সম্বন্ধের কিরূপ প্রভাব পড়িয়াছে, শুধু তাহাই আমাদের বিবেচ্য। বালকদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিতর্কের বিষয় হইল—প্রাচীন সাহিত্যিক শিক্ষা না আধুনিক কার্যকরী শিক্ষা কোন্‌টি গৃহীত হওয়া উচিত? বালিকাদের শিক্ষায় 'ভদ্র মহিলা' আদর্শ এবং বালিকাদিগকে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা—এই দুইটির মধ্যে আদর্শগত সংঘর্ষ চলিতেছে। কিন্তু যেখানেই শিক্ষার সঙ্গে বালিকাদের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সেখানেই স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সমতা (sex equality) বিধানের চেষ্টা দ্বারা সমগ্র শিক্ষার সমস্যাকে বিকৃত করা হইয়াছে। বালকদিগকে যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহা সন্তোষজনক নয় ইহা বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও বালিকাদিগকেও বালকদের অনুরূপ শিক্ষাদানের চেষ্টা হইতেছে। ফল হইতেছে এই যে, স্ত্রীশিক্ষাবিদগণ বালকদের শিক্ষার মত অকেজো শিক্ষাও বালিকাদিগকে দিতে চেষ্টিত এবং বালিকাদের যে মাতৃত্বের জন্য বিশেষ টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার দরকার আছে এ ধারণার ঘোরতর বিরোধী হইয়া উঠিয়াছেন। শিক্ষাসংস্কারের ক্ষেত্রে এইরূপ অন্তঃপ্রবাহী বিপরীতমুখী স্রোত সমস্যাকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে; তবে একটি শুভ লক্ষণ এই যে, 'ভদ্র মহিলা' তৈয়ার করা এক সময়ে স্ত্রী-শিক্ষার যে আদর্শ ছিল তাহা এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে। পরস্পরের সঙ্গে জড়াইয়া

ফেলিয়া, সমস্যাটিকে জটিলতর না করিবার উদ্দেশ্যেই এখন আলোচনা শুধু বালকদের শিক্ষাক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা হইতেছে।

নানা প্রশ্নসংকুল অনেক বিতর্কমূলক বিষয় বর্তমান প্রশ্নের উপর নির্ভর করিতেছে। বালকেরা কি কেবল প্রাচীন সাহিত্যই অধ্যয়ন করিবে অথবা কেবল বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিবে? এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য এই যে, প্রাচীন সাহিত্য আলঙ্কারিক শিক্ষার অঙ্গ এবং বিজ্ঞান প্রয়োজনীয় বিষয়। কোন ব্যবসা বা বৃত্তি অবলম্বনের জন্য কি যথাশীঘ্র সম্ভব বালককে টেকনিক্যাল শিক্ষা দিতে হইবে? এখানেও প্রয়োজনীয় এবং আলঙ্কারিক শিক্ষার কথা উঠে। বালকদিগকে কি বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও মনোজ্ঞ আচরণে অভ্যস্ত করিতে হইবে, না এগুলি কেবল আভিজাত্যের চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হইবে? শিল্পী ভিন্ন অন্যের নিকট শিল্পের রসবোধের কোন মূল্য আছে কি? উচ্চারণ অনুসারে কি ইংরাজি বানান ঠিক করা উচিত? আলঙ্কারিক ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা সম্বন্ধে বিতর্কে এইরূপ বহু বিতণ্ডার অবতারণা করা চলে।

তথাপি এই সমগ্র বিতর্কই আমার নিকট অবাস্তব বলিয়া মনে হয়। সংজ্ঞাগুলি নির্ধারণ করিতে গেলেই বিতর্ক হাওয়ায় মিলাইয়া যায়। যদি প্রয়োজনীয় শব্দটি ব্যাপক অর্থে এবং 'আলঙ্কারিক' শব্দ সংকীর্ণ অর্থে ব্যাখ্যা করা যায় তবে এক পক্ষ প্রাধান্য লাভ করে, আবার বিপরীত ভাবে ব্যাখ্যা করিলে অন্যপক্ষ প্রধান মনে হয়। ব্যাপক এবং প্রকৃত অর্থে একটি কাজ তখনই প্রয়োজনীয় বলা চলে যখন ইহাতে সুফল পাওয়া যায়। এই সুফলগুলি শুধু প্রয়োজনীয় বা কার্যকরী বলিয়াই নয়, অন্যান্য দিক হইতে বিবেচনা করিলেও ভাল বলিয়া বিবেচিত হওয়া চাই। নতুবা ইহার সঠিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না। আমরা একথা বলিতে পারি না যে, প্রয়োজনীয় কাজ তাহাকেই বলা চলে যাহার ফল হয় কার্যকরী। কার্যকরী বা প্রয়োজনীয় কাজের সারকথা হইল ইহাই যে, ইহার ফল শুধু কার্যকরীই নয়। শেষ পর্যন্ত কাজের ফল ভাল হইল কিনা তাহা জানিবার জন্য পরপর সাজানো কতকগুলি কাজ ও তাহার ফল লক্ষ্য করিতে হইবে। লাঙ্গল প্রয়োজনীয়, কেননা ইহা দ্বারা মাঠ চাষ করা হয়। শুধু মাটি ভাঙার জন্যই চাষ করার কোন সার্থকতা নাই। ইহা উপকারী এই জন্য যে, ইহার ফলে জমি বীজ বুনিবার যোগ্য হয়। বীজ বপন করা প্রয়োজনীয় কাজ, যেহেতু ইহার ফলে শস্য উৎপন্ন হয়। শস্য প্রয়োজনীয়, কারণ ইহা হইতে প্রস্তুত হয় খাদ্য। খাদ্য প্রয়োজনীয়, কারণ ইহা জীবন রক্ষা করে, কিন্তু জীবনের নিজস্ব মূল্য থাকা উচিত। জীবন যদি কেবল অন্য

জীবনের উপায় স্বরূপ হয় তবে ইহাকে মোটেই প্রয়োজনীয় বলা যায় না। অবস্থাভেদে জীবন ভাল এবং মন্দ হইতে পারে; কাজেই ভাল জীবনের উপায় স্বরূপ হইলে প্রয়োজনীয়। কোন্ কাজ কি জন্য প্রয়োজনীয় ইহা অনুসরণ করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত একটি স্থানে উপনীত হইতে হয় যেখান হইতে কার্য পরম্পরার সমগ্র শৃঙ্খলটি লম্বিত। 'প্রয়োজনীয় কথাটিকে এই-ভাবে ব্যাখ্যা করিলে শিক্ষা প্রয়োজনীয় মনে করিতে হইবে কিনা সে প্রশ্ন উঠে না। শিক্ষা অবশ্যই প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইবে, কেন না শিক্ষাদান ব্যাপারটিই কাম্য উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্যলাভের উপায় মাত্র। 'প্রয়োজনীয়' (useful) বা কার্যকরী শিক্ষার সমর্থকগণ কিন্তু ঠিক এভাবে চিন্তা করিতেছেন না। তাঁহারা চাহিতেছেন শিক্ষার ফলও কার্যকরী হউক। কথাটিকে স্থূলভাবে প্রকাশ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়: তাঁহারা (কার্যকরী শিক্ষার সমর্থকগণ) বলিবেন, যে যন্ত্র তৈয়ার করিতে পারে সেই শিক্ষিত লোক। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যন্ত্রের প্রয়োজন কি? উত্তর হইবে—ইহা দ্বারা মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং দেহের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জিনিষপত্র প্রস্তুত করা যায়—যেমন খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ ইত্যাদি। কাজেই দেখা যায় এইরকম কার্যকরী শিক্ষার পক্ষপাতী ব্যক্তি কেবল দেহের সন্তোষ সম্পাদনের উপরই মূল্য দেন; যাহা দেহের প্রয়োজন ও অভিলাষ মিটাইতে পারে কেবল তাহাই তাঁহার নিকট প্রয়োজনীয়।

কার্যকরী শিক্ষা বলিতে কেহ যদি এইরূপই মনে করেন এবং এই অভিমত প্রচার করেন তবে তাঁহাকে নিশ্চয়ই ভ্রান্ত বলিতে হইবে। তবে যখন অনাহারে লোক মরিতেছে, তখন রাজনীতিক হিসাবে তাঁহার অভিমত ঠিক হইতে পারে, কেননা বর্তমান মুহূর্তে জীবনধারণোপযোগী জিনিষের প্রয়োজন অন্য যে-কোন জিনিষ অপেক্ষা বেশী।

এই বিতর্কের অপর দিক আলোচনা করিতেও অনুরূপ বিস্তৃত বিশ্লেষণ দরকার। এই দিকটিকে আলঙ্কারিক বলিলে 'প্রয়োজনীয়, শিক্ষার সমর্থক-দিগের অভিমত এক রকম মানিয়া লওয়া হয়। কারণ আলঙ্কারিক বলিতে কমবেশী তুচ্ছ জিনিষকেই বোঝায়। 'ভদ্রলোক' ও ভদ্র মহিলা' বলিতে মধ্য-যুগীয় ধারণার প্রতি আলঙ্কারিক সংজ্ঞা প্রয়োগ করা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর 'ভদ্রলোক' বিশুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলিতেন, উপযুক্ত ক্ষেত্রে কথাপ্রসঙ্গে প্রাচীন সাহিত্য হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিতেন, ফ্যাশন করিয়া পোষাক পরিতেন, আদবকায়দা ভালমত বুঝিতেন এবং প্রশংসা অর্জনের জন্য কখন দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করা উচিত তাহা জানিতেন।

অতি সংকীর্ণ অর্থে তাঁহার শিক্ষা আলঙ্কারিক হইয়াছিল কিন্তু আমাদের

যুগে কোন ধনবান ব্যক্তিই তাঁহার মত ভব্যতায় সন্তুষ্ট হইবেন না। প্রাচীন অর্থে 'আলঙ্কারিক শিক্ষার আদর্শ হইল অভিজাত (aristocratic)। ইহা বলিতে এমন এক শ্রেণীর লোক বুঝায় যাহাদের অর্থ আছে প্রচুর, কাজ করার প্রয়োজন নাই। ভদ্রলোক এবং চমৎকার-ভদ্র মহিলাদের কাহিনী ইতিহাসের মনোজ্ঞ বিষয়বস্তু বটে ; তাঁহাদের আত্মচরিত এবং পল্লীর বাসভবন আমাদিগকে আনন্দ দান করে অথচ আমরা তাহা আমাদের পরবর্তী বংশধরদের জন্য রাখিয়া যাইতে পারিলাম না। কিন্তু তাঁহাদের চমৎকারিত্ব চরম ছিল বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই, তথাপি ইহার জন্য অবিশ্বাস্য পরিমাণে খরচ করিতে হইত। হগার্থের Ginlane পুস্তক পাঠে আলঙ্কারিক শিক্ষার জন্য কিরূপ খরচ করিতে হইত সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যায়। বর্তমান যুগে এই সংকীর্ণ অর্থে কেহই আলংকারিক শিক্ষার সমর্থন করিবেন না।

কিন্তু প্রকৃত সমস্যা তাহা নয়। আসল প্রশ্ন হইল : সাক্ষাৎভাবে কার্যকরী হয় এমন জ্ঞানদানই কি আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে, না ছাত্রদিগকে মানসিক সম্পদ দানের চেষ্টা করিতে হইবে ? বারো ইঞ্চিতে এক ফুট এবং তিন ফুটে এক গজ ইহা জানা প্রয়োজনীয় কিন্তু এই জ্ঞানের কোন অন্তঃস্থিত মূল্য (intrinsic value) নাই। যেখানে মেট্রিক প্রণালী প্রচলিত সেখানে তো তাহা একেবারেই অকেজো। পক্ষান্তরে (কাহারো পক্ষে তাহার খুল্লতাতকে হত্যা করার বিরল ঘটনা ছাড়া) 'হ্যামলেট' নাটকের রস উপলব্ধি করার ক্ষমতা দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের কোন কাজে লাগিবে না। কিন্তু ইহা মানুষকে এমন মানসিক সম্পদ দান করে যাহা হইতে বঞ্চিত হওয়া তাহার পক্ষে আফ্‌শোষের বিষয়। এই মানসিক সম্পদই তাহাকে একজন চমৎকার মানুষে পরিণত করিতে পারে। যিনি মনে করেন কার্যকরী জ্ঞানই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, তিনি এই ধরণের মানসিক সম্পদ বা ক্ষমতার পক্ষপাতী।

কার্যকরী শিক্ষার সমর্থক ও তাহাদের বিরুদ্ধপক্ষের বিতর্কের মধ্যে তিনটি মূল সমস্যা জড়িত আছে। প্রথমতঃ অভিজাত ও গণতন্ত্রবাদীদের মধ্যে বিরোধে অভিজাতগণ মনে করেন যে, অধিকার প্রাপ্ত (priviledged) শ্রেণীর জন্য শিক্ষা এমন হইবে যেন তাহারা অবসর সময় আরামে বিলাসে যাপন করিতে শিক্ষা পায় এবং নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে এমন শিক্ষা দিতে হইবে যেন তাহারা অন্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাজে তাহাদের দৈহিক শ্রম নিয়োজিত করিতে পারে। এই মতের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রবাদীরা যে অভিমত পোষন করেন তাহা কতকটা অস্পষ্ট এবং ঘোলাটে। অভিজাতদের পক্ষে অকেজো শিক্ষা তাহারা অপছন্দ করেন কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলেন যে, দিনমজুরদের শিক্ষা যেন কেবল

কার্যকরী শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা না হয়। কাজেই বিলাতের পাব্লিক স্কুলে প্রাচীন পদ্ধতিতে প্রদত্ত সাহিত্য-প্রধান শিক্ষার বিরোধিতা দেখিতে পাই; আবার সেই সঙ্গে এ দাবীও উত্থাপিত হইয়াছে যে, মজুরদের গ্রীক ও ল্যাটিন শিক্ষার জন্য যেন সুযোগ দান করা হয়। এই নীতির মধ্যে সামান্য অস্পষ্টতা থাকিলেও মূলে সত্য আছে। গণতন্ত্রবাদীরা সমাজকে একটি প্রয়োজনীয় এবং অন্যটি আলঙ্কারিক বা অপ্রয়োজনীয় এই দুই ভাগে ভাগ করিতে চান না। কাজেই তাঁহারা আলঙ্কারিক শ্রেণীকে অধিক পরিমাণে কেবল কার্যকরী শিক্ষা এবং এ যাবৎ প্রয়োজনীয় শ্রেণীকে অধিক পরিমাণে কেবল আনন্দদায়ক শিক্ষা দিবার পক্ষপাতী। এই দুইটি উপাদান—কাযকরী শিক্ষা ও আলঙ্কারিক শিক্ষা —কি পরিমাণে মিশাইতে হইবে গণতন্ত্র তাহা নির্ধারণ করিবে।

দ্বিতীয় সমস্যা হইল দুইদল লোকের মধ্যে মতবিরোধ। ইহাদের একদল মনে করেন কেবল সংসারের প্রয়োজন মিটানোই শিক্ষার উদ্দেশ্য, অন্য দল শিক্ষার মারফৎ কেবল মানসিক আনন্দলাভেই পক্ষপাতী। যদি ধনশালী আধুনিক ইংরাজ ও আমেরিকাবাসীদিগকে কোন যাদুবিদ্যার সাহায্যে এলিজাবেথের যুগে লইয়া যাওয়া যায় তবে স্যার ফিলিপ্ সিডনির সমাজ, চিত্তহারী সংগীত এবং স্থাপত্যের সৌন্দর্য বর্তমানকালের বাথরুম, চা, কফি, মোটর গাড়ী এবং অন্যান্য বিলাসের উপকরণের অভাব মিটাইতে পারিবে না। নেহাৎ গোঁড়া সংস্কার দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইলে এরূপ লোকের অধিকাংশের ধারণা এই যে, উৎপাদিত জিনিসের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য বাড়ানোই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। তাহারা ঔষধ এবং স্বাস্থ্যবিদ্যা শিক্ষার অন্তর্গত করিতে পারেন কিন্তু সাহিত্য, শিল্প বা দর্শন সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন উৎসাহ নাই। রেনেশাঁস্ যুগে যে সাহিত্যপ্রধান পাঠ্যতালিকা প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহার উপর আক্রমণ চালাইতে এরূপ লোকই অগ্রণী হইয়াছেন।

দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য অপেক্ষা মানসিক সম্পদেরই যে মূল্য বেশী শুধু একথা দ্বারা এ দাবী ঠেকানো যাইবে না। একথার ভিতর সত্যতা আছে কিন্তু ইহাই সবখানি সত্য নয়। কারণ দৈহিক স্বাচ্ছন্দের মূল্য খুব বেশী না হইলেও ইহার অভাব—দেহধারণের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহার অভাব—মানুষের মানসিক গুণরাশি নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। যখন হইতে মানুষ দুরদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তখন হইতেই খাদ্যাভাব, রোগ এবং ইহাদের চিরজাগরুক ভীতি বহু মানুষের উপর আশঙ্কার ছায়াপাত করিয়াছে। খাদ্যের অভাবে বহু পাখী মরিয়া যায় কিন্তু ইহাদের ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা নাই বলিয়া যখন খাদ্যের প্রাচুর্য থাকে তখন ইহারা সুখী। যে সকল কৃষক একবার দুর্ভিক্ষ

কাটাইয়া উঠিয়াছে তাহারা খাদ্যাভাবের ভীতিজনক-স্মৃতি কিছুতেই মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে না।

৮. মৃত্যুবরণ করার চেয়ে মানুষ বরং সামান্য অর্থের জন্যও বহুক্ষণ পরিশ্রম করিতে ইচ্ছুক কিন্তু ইতর প্রাণী কোন সাময়িক সুখের মূল্যস্বরূপ মৃত্যুবরণ করিতে হইলেও ক্ষণস্থায়ী সুখই পছন্দ করে। তাই দেখা যায়, অধিকাংশ মানুষই প্রায় নিরানন্দ জীবন যাপন করে; কারণ সুখের আশায় অন্য কোন প্রকারে জীবন যাপন করিতে গেলে জীবনকাল হইত সংক্ষিপ্ত। শিল্পবিপ্লবের দৌলতে বর্তমান যুগে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম **সকল মানুষের** জন্য অন্ততঃ কিছু পরিমাণে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করা সম্ভবপর। আমরা ইচ্ছা করিলে মানুষের দৈহিক দুঃখের কিছুটা লাঘব করিতে পারি। বিজ্ঞানের সাহায্যে এবং সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা দ্বারা পৃথিবীর সকল মানুষের খাদ্য এবং বাসগৃহের বন্দোবস্ত করিয়া, বিলাসিতার মধ্যে না হউক, মোটামুটিভাবে বাঁচিবার ব্যবস্থা করা যায়। রোগ নিবারণ করা এবং স্বাস্থ্যহীনতা দূর করা সম্ভব হইতে পারে; জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সমতা রাখিয়া খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেশী করা চলিতে পারে; মানুষের অবচেতন মন হইতে নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার এবং যুদ্ধের ভীতি দূর করা যাইতে পারে। মানুষের জীবনে এসবের এত প্রয়োজন যে, যে-শিক্ষার দ্বারা ইহা লাভ করা সম্ভবপর তাহার বিরোধিতা করা চলে না। এরূপ শিক্ষায় ফলিত বিজ্ঞান প্রাধান্য লাভ করিবে। পদার্থবিদ্যা, শরীরবিদ্যা এবং মনোবিজ্ঞান ছাড়া আমরা নূতন জগৎ গড়িতে পারি না; বরং ল্যাটিন ও গ্রীক সাহিত্য দান্তে এবং সেক্সপিয়র, ব্যাক এবং মোজার্ট ছাড়া চলিতে পারে। কার্যকরী শিক্ষার স্বপক্ষে ইহাই একটি বড় যুক্তি। বিশেষভাবে অনুভব করি বলিয়াই আমি ইহা জোরের সঙ্গে উল্লেখ করিতেছি। তথাপি এ প্রশ্নের অন্য একটি দিকও আছে। যদি অবসর এবং স্বাস্থ্য ভালভাবে কাজে লাগানোর উপায় জানা না থাকে তবে এগুলি অর্জনের সার্থকতা কোথায়? অন্যান্য ক্ষেত্রে যুদ্ধের মতই মানুষের দুঃখ-কষ্টের বিরুদ্ধে অভিযান এমন কঠোরভাবে চালানো উচিত নয় যাহাতে শান্তির সময় অবসর বিনোদনের শিক্ষা ব্যাহত হয়। জগতের কল্যাণকর সামর্থ্যটুকু যেন সবখানিই কেবল দুঃখকষ্ট জয় করার সংগ্রামে ব্যয়িত না হয়।

৯. আমরা এখন বিতর্কের বিষয়ীভূত তৃতীয় পক্ষে উপনীত হইয়াছি। ইহা কি সত্য যে কেবল অকেজো শিক্ষাই প্রকৃতপক্ষে মূল্যবান? ইহা কি সত্য যে, যে-কোন মূল্যবান শিক্ষাই অকেজো? আমার নিজের কথা বলিতে পারি, আমি যৌবনের অনেকখানি সময় ল্যাটিন ও গ্রীক শিক্ষায় অতিবাহিত করিয়াছি।

এখন মনে হয় সে-সময়ের অপচয় হইয়াছে। পরবর্তী জীবনে আমি যে-সব সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি গ্রীক ও ল্যাটিন শিক্ষা আমাকে তাহা সমাধান করিতে কোন সহায়তা করে নাই। যাহারা প্রাচীন-সাহিত্য পড়ে তাহাদের শতকরা ৯৯ জনের মতই আমিও ঐসব ভাষায় এমন যোগ্যতা অর্জন করি নাই যাহাতে সে-ভাষায় সাহিত্য পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারি।

পক্ষান্তরে গণিত ও বিজ্ঞানের যাহা কিছু আমি শিখিয়াছিলাম তাহা কেবল অশেষ কাজেই লাগে নাই, চিন্তার বিষয়বস্তু এবং এই প্রবঞ্চনাময় সংসারে সত্যের কষ্টিপাথর হিসাবেও তাহাদের মূল্য অপরিসীম। ইহা অবশ্য আমার ব্যক্তিগত খেয়াল হইতে পারে কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে, প্রাচীন সাহিত্য পাঠ দ্বারা উপকৃত হইতে পারেন এরূপ খেয়ালযুক্ত লোকের সংখ্যা আধুনিক-দের মধ্যে খুবই কম। ফ্রান্স ও জার্মানীরও উন্নত সাহিত্য আছে; তাহাদের ভাষা সহজেই শিক্ষা করা যায় এবং অনেক প্রকারে ব্যবহারিক কাজেও লাগে। কাজেই ল্যাটিন ও গ্রীক সাহিত্যের চেয়ে ফরাসী ও জার্মান সাহিত্যের পক্ষে বলিবার অনেক কিছু আছে। যাহা কিছু, সাক্ষাৎভাবে কার্যকরী নয়, এরূপ শিক্ষার গুরুত্ব না কমাইয়াও দাবী করা চলে যে, বিশেষজ্ঞদের ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্যদের বেলায় ব্যাকরণের খুঁটিনাটি ও মারপ্যাঁচ বাদ দিয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত। মানুষের জ্ঞানের পরিমাণ এবং মানবীয় সমস্যার জটিলতা দিন-দিনই বাড়িতেছে। কাজেই নূতনকে গ্রহণ করিতে হইলে প্রত্যেক প্রজন্মেই (generation-এ) শিক্ষাব্যবস্থা ঢালিয়া সাজাইতে হইবে। নূতন এবং পুরা-তনের মধ্যে বোঝাপড়া ও সামঞ্জস্যের সাহায্যে সমতা রক্ষা করিতে হইবে। সাহিত্য সম্বন্ধীয় উপাদান শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে অবশ্যই থাকিবে তবে তাহাদের জটিলতা কমাইয়া এমন করিতে হইবে যেন আধুনিক যুগ সৃষ্টি করিয়াছে যে-বিজ্ঞান তাহা শিক্ষার জন্য যথেষ্ট সময় ও সুযোগ থাকে।

আমার অভিমত ইহা নয় যে, সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা কার্যকরী শিক্ষা অপেক্ষা কম মূল্যবান। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান, বিশ্বের ইতিহাস, সংগীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান কল্পনাশক্তি বাড়াইবার জন্য একান্ত আবশ্যক। কেবল কল্পনাশক্তির সাহায্যেই মানুষ ভবিষ্যতের জগৎ কেমন করিয়া গড়িতে হইবে তাহার পরিকল্পনা করিতে পারে; ইহা বাদ দিলে 'উন্নতি' কেবল যান্ত্রিকভাবে অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। কিন্তু বিজ্ঞানও কল্পনার উদ্রেক করিতে পারে। বাল্যকালে কোনরকম রস উপলব্ধি করিতে না পারিলেও আমাকে বাধ্য হইয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীর অনেক উৎকৃষ্ট সাহিত্য পাঠ করিতে হইয়াছে; কিন্তু ইহার চেয়ে জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূতত্ত্বই

এবিষয়ে আমার খোরাক যোগাইয়াছে। ইহা ব্যক্তিগত ব্যাপার; একজন বালক বালিকা এক বিষয় হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিবে, অন্যে হয়ত অন্য বিষয় হইতে তাহা পাইবে। আমার বক্তব্য এই যে, যাহারা বিশেষজ্ঞ হইতে চায় তাহাদের কথা বাদ দিলে যেখানে কোন বিষয় জানিতে হইলে কঠিন কৌশল আয়ত্ব করিতে হয় সেখানে শিক্ষণীয় বিষয়টি কার্যকরী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। রেনেশাঁসের যুগে আধুনিক ভাষায় খুব কম সাহিত্য ছিল। এখন হইয়াছে অনেক। যাহারা গ্রীক্ ভাষা জানে না তাহাদের নিকটও গ্রীক ঐতিহ্য পৌঁছাইয়া দেওয়া যায়। লাটিন ঐতিহ্যের মূল্য খুব বেশী নয়। কাজেই বালক-বালিকার সাহিত্যের প্রতি বিশেষ ঝোঁক না থাকিলে সেক্ষেত্রে তাহাদের সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা সংক্ষিপ্ত আকারে সহজভাবে দেওয়াই আমার ইচ্ছা; পরবর্তী বয়সে শিক্ষার কঠিন অংশ-টুকু আমি গণিত ও বিজ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে চাই। তবে কাহারো অন্য বিষয়ের প্রতি প্রবল আগ্রহ দেখা গেলে তাহার পক্ষে ঐ অবস্থার ব্যতিক্রম করা হইবে। সর্বোপরি, ছাঁচে-ঢালা নিয়ম-কানুন ও ব্যবস্থা বর্জন করিতে হইবে।

কি ধরণের জ্ঞানদান করিতে হইবে এতক্ষণ আমরা এই আলোচনা করিতেছি। নৈতিক শিক্ষা এবং চরিত্রের শিক্ষা সম্পর্কিত সমস্যা লইয়া এখন আলোচনা শুরু করিব। এক্ষেত্রে রাজনীতির সঙ্গে আমাদের কোন সংস্রব নাই, মনোবিদ্যা এবং নীতিতত্ত্বই আমাদের বিবেচ্য। অল্প কিছুদিন পূর্বেও মনোবিদ্যা কেবল পুঁথিগত বিদ্যা বলিয়া বিবেচিত হইত। এক্ষেত্রে ইহার কোন প্রয়োগ ছিল না। বর্তমানে এ অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। এখন শিল্প, মনো-বিজ্ঞান, রোগীর মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান আমাদের বিশেষ বাস্তবক্ষেত্রে কাজে লাগিতেছে। আমরা আশা করিতে পারি যে, অদূর ভবিষ্যতে বিদ্যায়তনে মনোবিজ্ঞান যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিবে। ইতিমধ্যেই শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্ততঃ ইহা ব্যাপক এবং সুফল দান করিয়াছে।

প্রথমে 'শৃঙ্খলার' প্রশ্নটি বিবেচনা করা যাক্। শৃঙ্খলা সম্বন্ধে পুরানো ধারণা ছিল সরল ও সহজ। বালক যাহা অপছন্দ করিত তাহা তাহাকে করিতে হুকুম করা হইত কিন্তু সে যাহা ভালবাসিত তাহা হইতে বিরত হইতে আদেশ দেওয়া হইত। আদেশ অমান্য করিলে দৈহিক শাস্তি এবং গুরুতর ক্ষেত্রে কেবল জলরুটি দিয়া নির্জন কুঠরীতে বন্দী করিয়া রাখা হইত। উদাহরণ-স্বরূপ The Fairchild Family পুস্তকে ছোট বালক হেনরীকে কিভাবে ল্যাটিন শিখানো হইয়াছিল তাহার বিবরণ দেখিতে পারেন। তাহাকে বলা হইয়াছিল ল্যাটিন না শিখিলে কিছুতেই ভাল ধর্মযাজক হইতে পারিবে না। কিন্তু কিছুতেই সে তাহার পিতার আগ্রহ অনুযায়ী মনোযোগ দেয় নাই। ফলে

তাহাকে ছোট্ট একটি কুঠরীতে আটক করিয়া রাখা হইল। দেওয়া হইল শুধু জল আর রুটি। তাহার ভগ্নীদিগের সহিত তাহার কথা বলা নিষিদ্ধ হইল। তাহাদিগকে বলা হইল যে, হেনরী ভগবানের নিকট অপরাধী হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও এক ভগ্নী হেনরীকে গোপনে খাবার দিয়াছিল। ধরা পড়িয়া সেও শাস্তি পাইল। কিছুকাল বন্দী থাকার পর নাকি ল্যাটিনের প্রতি হেনরীর অনুরাগ জন্মে এবং ইহার পরেও অধ্যবসায় সহকারে কাজ করিতে থাকে।

• ইহার বিপরীত একটি গল্প শেহর বলিয়াছেন। তাঁহার কাকা একটি বিড়ালের বাচ্চাকে ইঁদুর ধরা শিখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহারই গল্প। যেখানে বিড়ালের বাচ্চাটি ছিল সেখানে একটি ইঁদুর নিয়া আসা হয়। কিন্তু তখনও বিড়ালের শিকার করার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয় নাই, কাজেই সেই ইঁদুরের দিকে মনোযোগ দেয় না। ইহাতে শেহরের কাকা বিড়াল-বাচ্চাটিকে প্রহার করেন। পরের দিন এই একই প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইল। ক্রমাগত অনেক কয়দিন এইরূপ চলিতে লাগিল। অবশেষে অধ্যাপক মনে করিলেন বিড়ালটি অত্যন্ত বোকা এবং শিক্ষাদানের সম্পূর্ণ অযোগ্য। পরবর্তীকালে বিড়াল অন্যান্য বিষয়ে স্বাভাবিক হইলেও ইঁদুর দেখিলে ভয়ে কাঁপিতে থাকিত এবং ছুটিয়া পলাইত। শেহর বলিয়াছেন—"বিড়াল-বাচ্চাটির মতই আমারও কাকার নিকট হইতে ল্যাটিন শিখিবার ভাগ্য হইয়াছিল।" এই দুইটি গল্প হইতে শাসনের প্রাচীন পদ্ধতি এবং ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিদ্ শৃঙ্খলা বর্জ্জন করেন না; নূতন প্রণালীর সাহায্যে তিনি ইহা প্রবর্ত্তন করেন। এ সম্বন্ধে যাঁহারা নূতন প্রণালীর বিষয় পড়েন নাই তাঁহারা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতে পারেন। পূর্বে আমার ধারণা ছিল মাদাম মন্তেসরী শৃঙ্খলার বালাই তুলিয়া দিয়াছেন। কিভাবে তিনি ঘরভরা ছেলেমেয়ে লইয়া কাজ করেন ভাবিয়া আমি বিস্মিত হইতাম। তাঁহার নিজের লেখা পুস্তক পড়িয়া আমি বুঝিতে পারি শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা তিনি বিসর্জ্জন দেন নাই, ইহা বরং তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর একটি বিশিষ্ট অংশ। আমার তিন বৎসর বয়স্ক ছেলেকে সকাল বেলা করিয়া মন্তেসরি স্কুলে পাঠাইয়া বুঝিতে পারিলাম সে অল্প সময়ের মধ্যেই নিয়মানুবর্তী হইয়া পড়িয়াছে, স্কুলের নিয়মকানুন সে হৃষ্টচিত্তেই মানিয়া চলিতেছে। ইহার জন্য কোনরূপ বাহিরের তাগিদ বা তাড়না ছিল না; নিয়ম কানুনগুলি খেলার নিয়মের; শিশুরা আনন্দের সংগে উহা মানিয়া চলে। প্রাচীন ধারণা ছিল যে, শিশুরা নিজেরা ইচ্ছা করিয়া কিছু শিখিতে চাহে না, ভয় দেখাইয়া জোর করিয়া তাহাদের শিখাইতে হয়। প্রমাণিত হইয়াছে যে শিক্ষাদান ব্যাপারে কৌশলের অভাবই

ইহার কারণ। শিক্ষণীয় বিষয়টিকে -যেমন পড়া ও লেখা—কয়েকটি সুবিধা-জনক পর্যায়ে ভাগ করিয়া লইয়া প্রত্যেকটি পর্যায় শিশুর নিকট আকর্ষণীয় করা যায়। শিশুরা যখন নিজেদের পছন্দমত কাজ করিতে সুযোগ পায়, তখন বাহির হইতে শৃঙ্খলা চাপাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কয়েকটি সরল নিয়ম সকলেই বুঝিতে পারে এবং ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করিয়া মানিয়া চলে — ইহা হইল—কোন শিশু অন্যের খেলায় বা কাজে বাধা দিবে না, কোন শিশুই এক সঙ্গে এক প্রস্থের বেশী খেলার সরঞ্জাম রাখিবে না। শিশু এইভাবে সদভ্যাসে অভ্যস্ত হয় এবং বুঝিতে পারে যে কোন ভাল ফল লাভ করিতে হইলে অনেক সময়ে প্রবৃত্তিকে দমন করা আবশ্যক। এইভাবে শিশু আত্ম-সংযম বা আত্ম-শৃঙ্খলা অর্জন করে।

সকলেই জানেন যে, খেলার ভিতর দিয়া এইরূপ শৃঙ্খলা আয়ত্ত করা সহজ কিন্তু কেহ অনুমান করিতে পারেন নাই যে, জ্ঞান অর্জন ব্যাপারটিকেই এমন আনন্দপ্রদ করা যায় যে ইহার মধ্যেও সেভাব সঞ্চারিত হয়। আমরা জানি যে, ইহা সম্ভব এবং কেবল শিশুর শিক্ষার বেলায় সম্ভব নয়, সকল স্তরের শিক্ষাতেই সম্ভব। আমি বলিতে চাই না যে কাজটি সহজ। নূতন প্রণালীর উদ্ভাবন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন হইয়াছে কিন্তু সাধারণ শিক্ষকগণই ইহার প্রয়োগ করিতে পারে। ইহার জন্য প্রয়োজন সহানুভূতি, ধৈর্য এবং শিক্ষাদানের জন্য যথোপযুক্ত ট্রেনিং। মূলগত ভাবটি সরল: বাহির হইতে তাড়না বা জবরদস্তি করিয়া প্রকৃত শৃঙ্খলা গড়িয়া তোলা যায় না। প্রকৃত শৃঙ্খলা হইল মনের এমন একটি অভ্যাস যাহা স্বভাবতই অবাঞ্ছনীয় কার্যকলাপের দিকে না ঝুঁকিয়া বাঞ্ছনীয় কাজ ও আচরণের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শিক্ষাদান ব্যাপারে এই নীতির বাস্তব প্রয়োগ সত্যই বিস্ময়কর। ইহার জন্য সবখানি প্রশংসা মাদাম মন্তেসরির প্রাপ্য।

মূল পাপ (original sin) সম্বন্ধে বিশ্বাস লোপ পাওয়ার ফলে শিক্ষা প্রণালীর নীতি বহুলাংশে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। পুরাতন ধারণা ছিল শিশু-মাত্রই পাপ হইতে উদ্ভূত। এবং স্বভাবতই দুষ্ট; তাহার ভিতর সদগুণের সঞ্চার করিতে হইলে ঘন ঘন শাস্তি বিধান করিতে হইবে। আমাদের পূর্বপুরুষের শিক্ষা এই ধারণা দ্বারা কিরূপ প্রভাবিত হইয়াছিল তাহা অধিকাংশ আধুনিকগণ বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। ডীন স্ট্যানলি (Dean Stanley) লিখিত Dr. Arnold-এর জীবনী হইতে উদ্ধৃত দুইটি অংশ তাহাদের ভ্রম দেখাইয়া দিবে।

ডীন স্ট্যানলি ডক্টর আর্নল্ডের প্রিয় ছাত্র ছিলেন Tom Brown's School Days পুস্তকের তিনি সুবোধ বালক আর্থার। তিনি বর্তমান লেখকের

খুল্লতাত ভ্রাতা ; বাল্যকালে তিনি লেখককে Westminister Abbey ঘুরিয়া দেখাইয়াছিলেন। ডক্টর আর্নল্ড ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলগুলির একজন বড় সংস্কারক। এই স্কুলগুলি ইংলণ্ডের গৌরব এবং এখনও পর্যন্ত তাঁহার নীতি অনুসারেই পরিচালিত হইতেছে। কাজেই ডক্টর আর্নল্ডের আলোচনা করিতে গিয়া বহু অতীতের কোন প্রণালী বর্ণনা করিতেছি না, বর্তমানে উচ্চশ্রেণীর ইংরাজদের গড়িয়া তুলিতেছে যে শিক্ষাপ্রণালী তাহারই আলোচনা করিতেছি। ডক্টর আর্নল্ড বেত মারার প্রথা হ্রাস করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনীকারের কথায় "মিথ্যা কথা বলা, পানদোষ এবং স্বভাবতঃ কুড়েমির" জন্য অল্পবয়স্ক ছেলেদের মধ্যে বেত্রাঘাত প্রথা সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। কোন উদারনৈতিক পত্রিকা যখন মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, বেত্রাঘাত অবনতিকর শাস্তি এবং ইহা একেবারে বন্ধ করা উচিত, তখন ডক্টর আর্নল্ড অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি লিখিতভাবে উত্তর দিয়াছিলেন :

> ইহা কোন্ ভাবের পরিচায়ক তাহা আমি জানি ; ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের গর্ববোধ হইতে ইহা উদ্ভূত, ইহা যুক্তিসঙ্গত নয়, কোন খৃষ্টানের পক্ষে উপযুক্ত নয়, ইহা একান্তই বর্বর। শিভালির যুগের অভিসম্পাত সহ ইহা ইউরোপে এক সময় সংক্রামিত হইয়াছিল ; এখন জ্যাকোবিনিজিমের অভিসম্পাত স্বরূপ ইহা আমাদের দেশে উপস্থিত হইয়াছে।
>
> ...যে বয়সে দোষ বা অপরাধের দরুণ অপমান বোধ করিবার পুরুষোচিত অনুভূতির সন্ধান পাওয়া প্রায় অসম্ভব, তখন ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টাকে শিশুর আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর এইরূপ অযৌক্তিক ও হাস্যকর ধারণাকে উৎসাহ দিয়া বাড়াইয়া তোলার মধ্যে জ্ঞানের পরিচয় কোথায়? যুবকের পক্ষে যাহা অলঙ্কার স্বরূপ এবং মনুষ্যত্ব গঠনের সম্ভাবনায় যাহা পূর্ণ সরলতা, সংযম এবং মানসিক নম্রতার পক্ষে ইহার চেয়ে আর কি বেশী অপরাধী এবং প্রতিকূল হইতে পারে?

ভারতের অধিবাসীরা যদি এই 'মানসিক নম্রতা' দেখাইতে না পারে তবে যে ডক্টর আর্নল্ডের শিষ্যের ছাত্ররা তাহাদিগকে ঠেঙ্গাইতে উৎসাহী হইবে তাহতে অস্বাভাবিকতা নাই।

মিঃ ষ্ট্রাচি Eminent Victorians পুস্তকে আরো একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেটি উল্লেখ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। ডক্টর আর্নল্ড কোনো হ্রদের তীরে ছুটি যাপন করিতে গিয়াছিলেন। সেখানকার সৌন্দর্য দেখিয়া তাঁহার মনের আনন্দ কি ভাবের উদ্রেক করিয়াছিল সে সম্বন্ধে তিনি পত্নীকে বলিয়াছিলেন :

আমার চতুর্দিকে মনোরম প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া এবং নৈতিক অপরাধের কথা চিন্তা করিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। মনে হয় স্বর্গ এবং নরক যেন পরস্পর হইতে বহু দূরে নয়, যেন পাশাপাশি আমাদেরই চারিদিকে আসিয়া মিশিয়াছে। সৌন্দর্য দেখিয়া মনে যেমন উল্লাস জাগিয়াছে; নৈতিক অপরাধ সম্বন্ধেও তেমনি তীব্র ভাব যদি মনে জাগিত! কেননা অন্য সব কিছুর চেয়ে নৈতিক অপরাধ সম্বন্ধেও তীব্র মনোভাবেই পাতকী উদ্ধারকারী ঐশ্বরিক জ্ঞান বিরাজ করে। নৈতিক সদ্‌কার্যের প্রশংসা করাই বড় কথা নয়; কিন্তু ঐরূপ কাজ না করিয়াও আমরা প্রশংসা করিতে পারি। আমরা যদি পাপীকে নয় পাপকে ঘৃণা করি, বিশেষ করিয়া আমাদের অন্তরস্থিত পাপকে ঘৃণা করি তবেই যীশু এবং ঈশ্বরের অনুভূতি লাভ করিতে পারি—ইহাই ঈশ্বরলাভের পন্থা। হায়, ইহা দেখা এবং বলা কত সহজ এবং কাজে পালন করা এবং অনুভব করা কত কঠিন। ইহার যোগ্য কে? যে নিজের অপূর্ণতা সম্বন্ধে সচেতন এবং ইহার জন্য দুঃখ করে সে ছাড়া আর কেহ নয়। ঈশ্বর তোমাকে এবং আমাদের প্রিয় সন্তানদিগকে আশীর্বাদ করুন।

এই সহানুভূতিশীল ভদ্রলোককে আত্মশোচনার কষাঘাতে জর্জরিত হইতে দেখিয়া সত্যই দুঃখ হয়। প্রেমধর্মের নীতি অনুসারেই কাজ করিতেছেন এই ধারণার বশে তিনি নির্বিকার চিত্তে শিশুদের উপর বেত্রচালনা করিয়াছেন। এই ভ্রান্তব্যক্তির কথা চিন্তা করিলে মনে ব্যথা অনুভব করিতে হয়। কিন্তু নৈতিক অপরাধের প্রতি ঘৃণা জাগাইয়া তুলিয়া তিনি যে কত নিদয় লোক তৈয়ার করিয়াছিলেন তাহা চিন্তা করিলে মর্মাহত হইতে হয়; মনে রাখিতে হইবে শিশুদের স্বভাবগত আলস্যও তাঁহার মতে নৈতিক অপরাধের অন্তর্গত। নৈতিক অন্যায়ের শাস্তিবিধানের সদিচ্ছার বশবর্তী হইয়া কত সৎ প্রকৃতির লোক যে যুদ্ধ এবং অত্যাচারের অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন তাহা চিন্তা করিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। সৌভাগ্যের কথা এই যে শিক্ষাবিদ্‌গণ এখন আর শিশুকে শয়তানের অংশ বলিয়া মনে করেন না। বয়স্ক ব্যক্তি সম্বন্ধে বিশেষতঃ অপরাধীর শাস্তিদানকালে এই ধারণার প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু শিশু-নিকেতন এবং বিদ্যালয় হইতে ইহা প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

ডক্টর আর্নল্ড যে ভুল করিয়াছিলেন তাহার বিপরীত একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। ইহা কম হানিকর হইলেও বৈজ্ঞানিক দিক হইতে বিচার করিলে ভুল বটেই। ইহা হইল এই ধারণা যে শিশুরা স্বভাবতঃ নিষ্পাপ, তাহারা কেবল তাহাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের পাপাচারণ দেখিয়া দূষিত হয়। রুশোর

নামের সঙ্গে এই অভিমত জড়িত। হয়ত তিনি ইহা সূত্রাকারে প্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার এমিল (Emile) পাঠ করিলে জানা যায় যে অনেক রকমে নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার পর ছাত্রটি আদর্শ শিক্ষা পদ্ধতির অভিপ্রেত সর্বগুণে ভূষিত হয়। প্রকৃত কথা হইল যে, শিশু স্বভাবতই ভাল বা মন্দ নয়। তাহারা কতকগুলি প্রতিবর্তী (reflex) এবং প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। পরিবেশের ফলে ইহা হইতেই স্বভাব গঠিত হয়। স্বভাব (habit) সুস্থও হইতে পারে, অসুস্থও হইতে পারে। কিরূপ স্বভাব হইবে তাহা প্রধানতঃ নির্ভর করে জননী অথবা ধাত্রীর জ্ঞানের উপর, কারণ শিশুর স্বভাব প্রথম অবস্থায় অত্যন্ত নমনীয় থাকে। অধিকাংশ শিশুর মধ্যেই সৎ নাগরিকের উপাদান থাকে, আবার অপরাধীর উপাদানও থাকে। বৈজ্ঞানিক মনোবিদ্যা প্রমাণ করে যে সপ্তাহের মধ্যে ছয়দিন চাবুক এবং রবিবারে ধর্মোপদেশ প্রয়োগ করা সদ্‌গুণ বিকাশের আদর্শ প্রক্রিয়া নয়। কিন্তু ইহা অনুমান করা ঠিক হইবে না যে, গুণ বিকাশের কোন উপায় বা প্রণালী নাই। পূর্ববর্তী শিক্ষাবিদ্‌গণ শিশুদিগের উপর অত্যাচার করিয়া আনন্দ পাইতেন। সামুয়েল বাটলারের এই অভিমত উড়াইয়া দেওয়া যায় না। অন্যথায় তাঁহাদের অনুষ্ঠিত এইরূপ নিরর্থক অত্যাচারের সার্থকতা দেখা যায় না। একটি সুস্থ শিশুকে সুখী করা কঠিন নয়। দেহ এবং মনের যত্ন লইলে বেশীর ভাগ শিশুই সুস্থ হইবে। উন্নত ধরণের মানুষ গড়িয়া তুলিতে হইলে বাল্যকালে শিশুর সুখ-স্বাচ্ছন্দ একান্ত আবশ্যক। শিশুর যে স্বভাবগত আলস্যকে ডক্টর আর্নল্ড নৈতিক অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতেন তাহা মোটেই থাকিবে না যদি শিশু বুঝিতে পারে যে যাহা তাহাকে শিখানো হইতেছে তাহা সত্যই জানার যোগ্য। ছাত্রকে যাহা শিখানো হইবে তাহা যদি হয় মূল্যহীন এবং যাহারা শিক্ষা দিবেন তাঁহারা যদি হন নিষ্ঠুর অত্যাচারী তবে শিশু স্বভাবতই শহরের বিড়ালছানার মত আচরণ করিবে। সুস্থ শিশুর হাঁটিবার এবং কথা বলিবার প্রয়াস হইতে বোঝা যায় তাহার শেখার জন্য একটা স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে। এই ইচ্ছাটাকে শিক্ষার কাজে লাগাইতে হইবে। চাবুকের স্থলে শিশুর এই স্বাভাবিক ইচ্ছার প্রবর্তন বর্তমান যুগের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির পরিচায়ক।

এই পুস্তকে যে আধুনিক ভাবধারার আলোচনা করিতে চাই তাহার শেষ প্রশ্নে উপনীত হইয়াছি—অধুনা বাল্যকালের উপর অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হইতেছে আমি তাহারই উল্লেখ করিতেছি। চরিত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের ধারণার পরিবর্তনের সঙ্গে ইহার নিবিড় যোগ আছে। প্রাচীন ধারণা ছিল—ইচ্ছার উপর গুণ নির্ভর করে; মনে করা হইত যে শিশুর মন কু-ইচ্ছা দ্বারা

পূর্ণ, কেবল ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে সে ইহাদিগকে দমন করিয়া রাখে। সকল কু-ইচ্ছা সমূলে দূর করা অসম্ভব বলিয়া মনে করা হইত; শিশু কেবল ইহাদিগকে সংযত রাখিতে পারে মাত্র। এই অবস্থাকে ঠিক অপরাধী ও পুলিশের অবস্থার সংগে তুলনা করা চলে। ভাবী অপরাধী ছাড়া যে-সমাজ চলিতে পারে তাহা কেহ অনুমান করিতে পারিত না; অধিকাংশ লোক যাহাতে শাস্তির ভয়ে অপরাধ না করে এবং অপরাধীরা ধরা পড়ে এবং শাস্তি পায় এমন গোছের তৎপর পুলিশ দল রাখিতে পারিলেই যথেষ্ট মনে করিত। বর্তমানের মনস্তাত্ত্বিক অপরাধবিজ্ঞানী কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট নন। তিনি মনে করেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষা দ্বারা অপরাধ করার প্রবণতা দূর করা সম্ভবপর। সমাজের পক্ষে যাহা প্রযোজ্য, ব্যক্তির কাছেও তাহা প্রযোজ্য। শিশুরা বিশেষ করিয়া তাহাদের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সঙ্গীদের প্রশংসা পাইতে ইচ্ছুক হয়; তাহারা যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বাড়িয়া উঠে সেই পরিবেশ অনুসারে তাহাদের প্রবৃত্তিগুলিকে ভাল বা মন্দ দিকে চালিত করা যায়। অধিকন্তু তাহাদের বয়সে অভ্যাস-গঠন করা সহজ এবং সদভ্যাস দ্বারা অনেক গুণ স্বভাবে পরিণত হইতে পারে। পক্ষান্তরে, মনের শক্তি দ্বারা কু-ইচ্ছা (অসৎ বাসনা) দমন করিয়া অসৎ আচরণ কমাইবার যে প্রক্রিয়া পূর্বে প্রচলিত ছিল তাহা মোটেই সন্তোষজনক নয়। বাঁধ দেওয়া নদীর জলের মত অসৎ বাসনা ইচ্ছা শক্তির অজ্ঞাতসারে কোন প্রকারে আত্মপ্রকাশ করে। যৌবনে যে যুবক পিতাকে হত্যা করার বাসনা মনে পোষণ করিত, পুত্রকে নৈতিক অন্যায়ের শাস্তি দিতেছে মনে করিয়া সে তাহাকে বেত্রাঘাত করিয়া তৃপ্তি অনুভব করে। যে সকল মতবাদ নিষ্ঠুরতা সমর্থন করে তাহাদের মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, কোন বাসনা ইচ্ছা শক্তি দ্বারা নিপীড়িত হইয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল কিন্তু অবশেষে ইহাই পাপের প্রতি ঘৃণা কিম্বা এমনই কোন ভদ্র-রূপ ধারণ করিয়া সম্পূর্ণভাবে অচেনারূপে বাহির হইয়াছে। কাজেই ক্ষেত্রবিশেষে ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পাপ-ইচ্ছার দমন প্রয়োজনীয় হইলেও গুণবিকাশের প্রণালী হিসাবে ইহা কার্যকরী নয়।

এই প্রসঙ্গ আমাদিগকে মনঃসমীক্ষার ক্ষেত্রে লইয়া আসে। মনঃসমীক্ষার মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যাহা অযৌক্তিক এবং প্রমাণসহ নয়। কিন্তু ইহার সাধারণ প্রণালী আমার নিকট বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে হয়। নৈতিক শিক্ষার সঠিক পদ্ধতি রচনায় ইহা একান্ত আবশ্যক। অনেক মনঃসমীক্ষক শৈশবের প্রথম অবস্থার উপর যতখানি গুরুত্ব আরোপ করেন তাহা আমার নিকট অতিরিক্ত বলিয়া মনে হয়; তাঁহারা অনেক সময়ে বলেন শিশুর বয়স তিন বৎসর হইতে হইতেই তাহার চরিত্র কেমন হইবে তাহা পাকাপাকিভাবে স্থির

হইয়া যায়। আমার বিশ্বাস এরূপ কখনো হইতে পারে না। তবে মনঃ-
সমীক্ষকের অভিমতের এই যে মাত্রাধিক্য তাহা ভুল হইলেও যাহা সত্য তাহার
দিকেই। অতীতে মনোবিজ্ঞান উপেক্ষিত হইয়াছিল, কার্যতঃ বুদ্ধিবৃত্তি-
প্রধান (intellectualist) যে প্রণালী তৎকালে প্রচলিত ছিল তাহার কল্যাণে
ইহার প্রসার সম্ভবও ছিল না। ঘুমের কথাটি ধরা যাক। সকল মাতাই চান
তাঁহাদের শিশুরা ঘুমাইয়া থাকুক কারণ ইহা তাহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী
এবং মেয়েদের পক্ষেও সুবিধাজনক। ইহার জন্য তাঁহারা এক প্রক্রিয়া উদ্ভাবন
করিয়াছিলেন—দোলনায় দোল দেওয়া এবং ঘুমপাড়ানি গান গাওয়া। পুরুষেরা
বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন যে, এই প্রণালী আদর্শের
দিক দিয়া অপকারী, কারণ কোন একদিন ইহার ফল পাওয়া গেলেও ইহা খারাপ
অভ্যাস গঠন করে। প্রত্যেক শিশুই চায় তাহাকে সবাই খুব সমাদর করুক,
কারণ ইহা দ্বারা তাহার অহমিকার ভাব তৃপ্ত হয়। যদি সে বুঝিতে পারে যে,
না ঘুমাইলেই সে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তখন সে এই পন্থাই অবলম্বন
করিবে। ইহার ফল তাহার স্বাস্থ্য ও চরিত্রের পক্ষে হানিকর হইবে। এখানে
প্রধান বিষয় হইল অভ্যাস গঠন—বিছানার সংগে ঘুমের সংযোগ (associa-
tion) স্থাপন। এই সংযোগ সঠিকভাবে স্থাপিত হইলে রুগ্ন কিম্বা যন্ত্রণা-
বোধ করিতে না থাকিলে শিশু জাগিয়া থাকিবে না। কিন্তু এই সংযোগ
স্থাপন করিতে হইলে কিছু শৃঙ্খলাবিধানের প্রয়োজন, কেবল আদর আহ্লাদ
দিয়া ইহা গড়িয়া তোলা যাইবে না, কেন না তাহা জাগিয়া থাকিতেই উৎসাহ
দেয়। অন্য ভাল এবং মন্দ অভ্যাস গঠনের ব্যাপারেও এই বিষয় বিবেচনা
করিতে হইবে। মনোবিজ্ঞানের এই দিকটির এখনো শৈশব অবস্থা কিন্তু ইহার
গুরুত্ব ইতিমধ্যে যথেষ্ট বাড়িয়াছে এবং আরো বৃদ্ধির নিশ্চিত সম্ভাবনা
রহিয়াছে। ইহা স্পষ্ট যে, চরিত্রের শিক্ষা জন্মের সংগে সংগেই আরম্ভ হইবে,
ধাত্রী এবং অজ্ঞ জননীদের অনেক কার্যকলাপ এবং অভ্যাসের পরিবর্তন
আবশ্যক। ইহাও স্পষ্ট যে, পূর্বে যে-সময়ে শিক্ষাদানের উপযুক্ত কাল বিবে-
চিত হইত। তাহা অপেক্ষা আগেই শিক্ষা আরম্ভ করা চলে কারণ এই শিক্ষা
আনন্দপ্রদ হইলে শিশুকে মনোযোগ-শক্তির উপর জুলুম করিতে হইবে না।
এই বিষয়ে আধুনিক যুগে শিক্ষাতত্ত্বে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে,
ইহার যে সুফল পাওয়া গিয়াছে তাহা দিন-দিন বাড়িয়াই চলিবে। কাজেই পরের
অধ্যায়ে শিশুর পরবর্তীকালীন শিক্ষা কিরূপ হইবে তাহা আলোচনা করার পূর্বে
বাল্যকালে শিশুর চরিত্র গঠনের শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষার লক্ষ্য

কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে বরং শিক্ষা হইতে কিরূপ ফল আশা করি সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। ডক্টর আর্নল্ড চাহিয়াছিলেন 'মনের নম্রতা', অ্যারিস্টটলের মহানুভব মানবের (magnanimous man) মধ্যে কিন্তু এ গুণ দেখা যায় না। নীটসের আদর্শ আর খৃষ্টধর্মের আদর্শ এক নয়, ক্যাণ্টের আদর্শের সঙ্গেও ইহার মিল নাই, যীশুখৃষ্ট প্রেমধর্মের উপর জোর দিয়াছেন, ক্যাণ্ট বলেন, যে-কাজের মূল উৎস প্রেম তাহা কখনই সাধু কাজ হইতে পারে না। ভাল চরিত্রগঠনে কি কি উপাদান প্রয়োজন সে বিষয়ে একমত হইলেও কোন উপাদান কি পরিমাণে থাকা দরকার সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। একজন হয়ত সাহসকে প্রাধান্য দিবেন, অন্য একজন জ্ঞানার্জনের উপর জোর দিবেন, অপর কেহ দয়া এবং কেহ বা সত্যবাদিতাকেই প্রধান মনে করিবেন। প্রথম ব্রুটাসের মত কেহ হয়ত পারিবারিক স্নেহ-প্রীতি অপেক্ষা দেশের প্রতি কর্তব্যকেই সর্বপ্রধান কাম্য বলিয়া মনে করিবেন, আবার কেহ হয়ত কনফুসিয়াসের (Confucius) মত পরিবারের প্রতি স্নেহপ্রীতিকেই সকলের উপরে স্থান দিবেন। এই সব পার্থক্যের দরুণ শিক্ষার মধ্যেও পার্থক্য ঘটিবে। কোন ধরণের শিক্ষা সর্বোৎকৃষ্ট তাহা স্থির করিবার পূর্বে শিক্ষাদীক্ষা দিয়া আমরা কি রকম মানুষ প্রস্তুত করিতে চাই সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা থাকা একান্ত আবশ্যক।

অবশ্য শিক্ষাবিদ যেরূপ লোক প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করেন সব সময়েই যে সেরূপ পাবেন তাহা নয়। কখন কখন আদর্শের বিপরীত লোক প্রস্তুত হয়, যেমন চ্যারিটি স্কুলে (Charity School) বিনা শিক্ষার ফলে Uriah Heep এর মত লোক তৈরি হইয়াছিল। কিন্তু মোটের উপর সক্ষম শিক্ষাবিদগণ তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনে বহুল পরিমাণে কৃতকার্য হইয়াছেন, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—চীনের শিক্ষাবিদগণ, আধুনিক জাপানের শিক্ষাব্রতী-বৃন্দ, জেসুইটগণ, ডক্টর আর্নল্ড এবং মার্কিন শিক্ষার পরিচালকগণ। ইহারা সকলেই ইহাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ইহাদের কাম্য লক্ষ্য অপরের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল, তবু ফললাভ করিয়াছেন সকলেই। শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য কি হওয়া উচিত তাহা স্থির করিবার পূর্বে এই বিভিন্ন শিক্ষাপ্রণালী আলোচনা করিলে আমরা লাভবান হইতে পারিব।

চীনের চিরাচরিত শিক্ষাপদ্ধতি কোন কোন বিষয়ে এথেন্সের গৌরবময় যুগের শিক্ষাব্যবস্থার সম্পূর্ণ অনুরূপ। এথেন্সবাসী বালকদিগকে হোমারের রচনা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ করিতে হইত। চীনা বালকদিগকেও কনফুসিয়াস সাহিত্য অনুরূপভাবে মুখস্থ করিতে হইত। এথেনীয়গণ দেবদেবীকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিত। এই শ্রদ্ধা প্রদর্শন কতকগুলি আচার অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত, তাহাদের বুদ্ধিমূলক উচ্চ চিন্তায় কোন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিত না। ঠিক এমনিভাবে চীনারা তাহাদের পূর্বপুরুষের পূজা (ancestor-worship) সংক্রান্ত কতকগুলি রীতিনীতি শিক্ষা করিত, কিন্তু এগুলি বিশ্বাস করিতেই হইবে এমন কোন বাঁধাবাঁধি ছিল না। কোন শিক্ষিত ব্যক্তি যাহা বিশ্বাস করিবে এরূপ আশা করা হইত না; যে কোন বিষয় আলোচনা করা চলিতে পারে কিন্তু কোন স্থির নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া শান্ত রাজনীতি বিবেচনা করা হইত। অভিমত বা মতবাদ এমন হওয়া চাই যেন তা লইয়া ভোজের আসরে মনোজ্ঞ আলোচনা করা চলে, যেরূপ মত লইয়া তাহার জন্য মানুষ যুদ্ধ করিতে উত্তেজিত হইবে সেরূপ হওয়ার দরকার নাই। কার্লাইল (Carlyle) প্লেটোকে বলিয়াছেন তিনি যেন আরামে বিরামে আসীন একজন সম্ভ্রান্ত এথেনীয়ান ভদ্রলোক। এই আরাম এবং বিরামের মধ্যে আসীন থাকার বৈশিষ্ট্য চীন ঋষিদের মধ্যেও বিদ্যমান কিন্তু খৃষ্টান জ্ঞানীদের মধ্যে এইভাব দেখা যায় না। অবশ্য গেটের মত গ্রীক সভ্যতা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত লোকদের মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। এথেন্সবাসী এবং চীনাদেশবাসী উভয়েই জীবনকে উপভোগ করিতে চাহিয়াছিল, তাহাদের জীবনে উপভোগের ধারণা শোভন সৌন্দর্যবোধ দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছিল।

এই দুইটি সভ্যতার মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল। তাহার প্রধান কারণ—গ্রীকরা উদ্যমশীল এবং সকল কাজে উৎসাহী আর চীনারা অলস। গ্রীকরা তাহাদের শক্তি, শিল্প, বিজ্ঞান এবং আত্মধ্বংসী কলহে নিয়োজিত করিয়াছিল এ সকল ক্ষেত্রেই তাহারা অপূর্ব সাফল্য লাভ করিয়াছিল। রাজনীতি ও স্বদেশপ্রেম অবলম্বন করিয়া গ্রীকদের শৌর্য আত্মপ্রকাশ করিত: স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইলে রাজনৈতিক নেতারা নির্বাসিত লোকদের লইয়া দল গঠন করিয়া নিজের দেশ আক্রমণ করিত। চীনা কর্মচারী কর্মচ্যুত হইলে পাহাড় অঞ্চলে নির্জনবাস করিতে যাইত এবং পল্লীর সুখসৌন্দর্য সম্বন্ধে কবিতা লিখিত। এইভাবে গ্রীক সভ্যতা আত্মঘাতী হইয়াছিল, কিন্তু চীনা সভ্যতা কেবল বাহিরের শত্রুকর্তৃকই ধ্বংস হইতে পারে। অবশ্য এই পার্থক্যের জন্য, কেবল শিক্ষাকেই

দায়ী করা চলে না, কেননা কনফ্যুসিয়াসের মতবাদ জাপানে প্রবর্তিত হইলেও সেখানে শুধু কিয়াটোদের অভিজাত সম্প্রদায় ছাড়া অন্যদের মধ্যে চীনাদের মত শিক্ষিত, সভ্য এবং অলস তার্কিকদল সৃষ্টি করে নাই।

চীনা শিক্ষার ফল হইয়াছে পারিবর্তনবিমুখতা (stability) এবং শিল্পের প্রসার। ইহা প্রগতি কিম্বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সুফল প্রদান করে নাই। অলস তার্কিকতা যেখানে প্রাধান্য লাভ করে সেখানে ফলাফল বোধ হয় এইরূপই হইয়া থাকে। দৃঢ় জীবন্ত বিশ্বাস উন্নতির পথে লইয়া যায়, আর না হয় বিপদ টানিয়া আনে, অচলায়তনের মধ্যে জাতিকে বদ্ধ রাখে না। মানুষের বিশ্বাস যেখানে শিথিল সেখানে বিজ্ঞান প্রসার লাভ করিতে পারে না, কারণ বিজ্ঞান প্রচলিত কুসংস্কারের মূলে আঘাত করে বটে কিন্তু ইহার উপরও তো দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস রাখা চাই। আধুনিক বিজ্ঞান পৃথিবীর দেশগুলিকে পরস্পরের সংস্পর্শে আনিয়াছে, যুদ্ধসংকুল বিশ্বে জাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য শক্তি ও শৌর্যের প্রয়োজন আছে, এবং বিজ্ঞান ছাড়া গণতন্ত্র অসম্ভব। চীন সভ্যতা অল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রীক সভ্যতা দাসত্ব প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইজন্য, চীনদেশের চিরাচরিত শিক্ষা বর্তমান যুগের উপযোগী নয় বলিয়া চীনগণ বর্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই একই কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর চীন সংস্কারবাদী অভিজাতগণও অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছেন।

বিশ্বের সকল বৃহৎ শক্তির মধ্যে যে ভাবের প্রাধান্য দেখা যায় আধুনিক জাপানে তাহার সুস্পষ্ট উদাহরণ মিলিবে। স্বভাব হইল জাতীয় উন্নতিকে শিক্ষার সর্বপ্রধান লক্ষ্য বলিয়া গণ্য করা। জাপানী শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল অধিবাসীদের প্রবৃত্তিগুলিকে যথাযথভাবে ট্রেনিং দিয়া রাষ্ট্রের প্রতি অনুরক্ত নাগরিক তৈরি করা এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে লাগে এমন জ্ঞান দান করা। যেরূপ কৌশলে এই দুইটি উদ্দেশ্যসাধনের চেষ্টা হইয়াছে তাহার প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। কমোডোর পেরী যখন যুদ্ধজাহাজ লইয়া জাপানের উপকূলে উপনীত হইয়াছিলেন তখন হইতে জাপানের আত্মরক্ষার সমস্যাটি বড় এবং কঠিন হইয়া রহিয়াছে। এ বিষয়ে জাপানীদের সাফল্য তাহাদের শিক্ষাব্যবস্থারই সাফল্য প্রমাণ করে, নতুবা আত্মরক্ষাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতে হয়। জাতি যেখানে আসন্ন বিপদের সম্মুখীন, সেখানেই কেবল এরূপ শিক্ষাব্যবস্থা সমর্থন করা যায়, অন্যত্র ইহা অচল। শিন্টো ধর্ম এমনভাবে রক্ষিত যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের পর্যন্ত ইহার সমালোচনা করার বা প্রশ্ন করার অধিকার নাই, ইহার ইতিহাস বাইবেলের 'জেনেসিস' (Genesis) অধ্যায়ের মতই সংশয়জনক। জাপানে ধর্মের নামে যে অত্যাচার হইয়াছে তাহার পাশে

(Dayton) ডেটনের বিচার ম্লান হইয়া পড়ে। সেখানে নীতিগত অত্যাচারও চলিয়াছে অনুরূপভাবে। জাতীয়তা, সন্তানবাৎসল্য, মিকাডো পূজা প্রভৃতি সম্বন্ধে কাহারো কোনরূপ বিরূপ সমালোচনা করার উপায় নাই। কাজেই নানা বিষয়ে উন্নতির পথও রুদ্ধ। এইরূপ লৌহছাঁচে ঢালা ব্যবস্থার বিপদ এই যে, উন্নতির পন্থা হিসাবে ইহা বিপ্লব জাগাইয়া তোলে। ইহাই সাম্রাজ্যবাদের বিপদ এবং দ্রুত না হইলেও শিক্ষাব্যবস্থাই ইহা ঘটায়।

এইভাবে দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন চীনে যে ত্রুটি ছিল আধুনিক জাপানে ঠিক তাহার বিপরীত ত্রুটি রহিয়াছে। চীনের শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিরা ছিলেন অবিশ্বাসী এবং অলস, শিক্ষিত জাপানীরা নিজেদের অভিমতকে একেবারে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করে, কাজেও তাহাদের অদম্য উৎসাহ। সব কিছু সম্বন্ধেই অবিশ্বাসের ভাব পোষণ করা কিম্বা সব কিছুতেই নিজের মত অভ্রান্ত বলিয়া মনে করা—ইহার কোনটিই প্রকৃত শিক্ষার ফল হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। শিক্ষাকে এইরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করিতে হইবে যে, কষ্টকর হইলেও কিছু পরিমাণ জ্ঞান অর্জন সম্ভবপর, এক সময় যাহা জ্ঞান বলিয়া মনে করা হয় অন্য সময় তাহা হয়ত কিছুটা ভুল হইতে পারে, কিন্তু ঐ ভুল যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা সংশোধন করা যায়। যেখানে সামান্য একটু ভুলের ফলে বিপদ ঘটিতে পারে সেখানে বিশ্বাসে উপর নির্ভর করিয়াই আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে। মনের এইরূপ অবস্থা-প্রাপ্তি কঠিন ব্যাপার, ইহার জন্য চাই ভাবাবেগ এবং উচ্চস্তরের বুদ্ধির প্রয়োগ। কঠিন হইলেও ইহা অসম্ভব নয়, কার্যতঃ ইহাই বৈজ্ঞানিক স্বভাব বা মেজাজ। অন্যান্য ভাল জিনিসের মতই জ্ঞানলাভ কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। অভ্রান্তবাদীরা ইহা মোটেই কঠিন মনে করে না, অবিশ্বাসীরা ইহার সম্ভাব্যতাই বিশ্বাস করে না। এই দুই পক্ষই ভ্রান্ত, ইহাদের ভুল ব্যাপক হইলেই শুরু হয় সামাজিক বিপৎপাত।

আধুনিক জাপানীদের মত জেসুইটগণও শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের জন্য নিয়োজিত করিয়া ভুল করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই প্রতিষ্ঠান ছিল ক্যাথোলিক ধর্মসংঘ। তাঁহারা কোন ছাত্রের ব্যক্তিগত কল্যাণ কামনা করিতেন না, ধর্মসংঘের প্রয়োজনে লাগে এমনভাবে তাহাকে গড়িয়া তোলাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। আমরা যদি তাঁহাদের মতবাদ গ্রহণ করি তবে তাঁহাদিগকে দোষ দিতে পারি না। তাঁহাদের ধর্মনীতি হইল—নরক হইতে একটি আত্মাকে উদ্ধার করা যে কোন জাগতিক কাজ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং এই কাজ কেবল ক্যাথোলিক ধর্মসংঘই করিতে পারে।' যাহারা জেসুইটদের এই মতবাদ মানেন না, তাহারা ফলাফল দেখিয়া জেসুইট-শিক্ষার বিচার করিবেন। এই

শিক্ষার ফলে অনেক সময় Uriah Heep-এর মত অবাঞ্ছিত ব্যক্তি তৈয়ারি হইয়াছে। ভল্টেয়ারও জেস্যুইট শিক্ষার ফলস্বরূপ। মোটের উপর অনেক কাল ধরিয়া জেস্যুইট শিক্ষার ফল পাওয়া গিয়াছিল। বিরুদ্ধ সংস্কার আন্দোলন (Counter-Reformation) এবং ফ্রান্সে প্রোটেস্ট্যাণ্ট আন্দোলনের বিলোপ জেস্যুইটদের শিক্ষার ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা শিল্পকে করিয়াছিলেন ভাবপ্রবণ, চিন্তাধারাকে করিয়াছিলেন ভাসা-ভাসা, অগভীর এবং নীতিবোধকে করিয়াছিলেন শিথিল। অবশেষে তাঁহাদের এই কুফলের আবর্জনা ভাসাইয়া লইবার জন্য ফরাসী বিপ্লবের প্রয়োজন হইয়াছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহাদের অপরাধ ছিল এই যে, ছাত্রের প্রতি ভালবাসা দ্বারা নয়, নিজেদের স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা তাঁহারা পরিচালিত হইতেন।

ডক্টর আর্নল্ডের শিক্ষাপ্রণালী অদ্যাবধি ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলসমূহে প্রচলিত রহিয়াছে; ইহার একটা দোষ হইল যে ইহা আভিজাত্য-গর্বে গর্বিত। এ-শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল, কি স্বদেশের, কি সুদূর ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের এক অংশে যাহারা উচ্চপদ ও ক্ষমতায় অধিকারী হইবেন এমন লোক তৈয়ার করা। অভিজাত সম্প্রদায়কে টিঁকিয়া থাকিতে হইলে কতকগুলি গুনের বিকাশ ঘটাইতে হয়; এইগুলি স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হইত। ফলে গড়িয়া উঠিল উদ্যমশীল, দৈহিক এবং নৈতিক শক্তিতে শক্তিমান, ধৈর্যশীল এক অভিজাত সম্প্রদায়। তাহাদের মনে এমন এক ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, তাহারা যাহা জানে তাহাই সত্য, তাহার কোন পরিবর্তন হইতে পারে না এবং তাহারা বিশ্বে কোন মহৎ কার্য সম্পাদন করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বিস্ময়করভাবে এই ফল ফলিয়াছিল। ইহার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিকে বিসর্জন দিতে হইয়াছিল, কেনন বুদ্ধি কোন কোন ক্ষেত্রে সন্দেহের সৃষ্টি করিতে পারে; তথাকথিত 'নিকৃষ্ট' শ্রেণীর বা জাতির লোকদের উপর শাসন করিতে গেলে সহানুভূতি প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে পারে। কাজেই সহানুভূতি বিসর্জন দেওয়া হইল, ভদ্র আচরণের পরিবর্তে দৃঢ়তার উপর জোর দেওয়া হইল। ইহাই হইল এ অভিজাত শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য। জগৎ যদি পরিবর্তনশীল না হইত তবে বৃটিশ অভিজাত সম্প্রদায় স্পার্টানদের দোষগুণের অধিকারী হইয়া স্থায়ীত্ব লাভ করিত। কিন্তু অভিজাত্যের দিন চলিয়া গিয়াছে, কোন শাসিত জাতিই বিজ্ঞ এবং গুণশালী শাসককেও আর মানিতে চাহিবে না। ইহার ফলে শাসকগণ অত্যাচারী হইয়া উঠেন; অত্যাচার বিদ্রোহের পথই সুগম করিয়া দেয়। বর্তমান বিশ্বের জটিল সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য ক্রমেই বেশী পরিমাণে বুদ্ধির প্রয়োজন। কিন্তু ডক্টর আর্নল্ড বুদ্ধিবৃত্তি বিসর্জন দিয়া তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে কতকগুলি গুণের বিকাশ

ঘটাইয়াছিলেন। ইটনের খেলার মাঠে যুদ্ধ জয় সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হারানোর সূচনাও হইয়াছিল ঐখানেই। বর্তমান জগৎ অন্য ধরণের লোক চায়, এখন দরকার উদার কল্পনা ও সহানুভূতি, দরকার বুদ্ধিশক্তির নমনীয়তা, বুলডগের মত একগুঁয়ে সাহসের পরিবর্তে যন্ত্র বিজ্ঞানের উপর বেশী আস্থার প্রয়োজন। ভবিষ্যতের রাষ্ট্রপরিচালককে স্বাধীন নাগরিকের সেবক হইতে হইবে, প্রশংসমান প্রজাবৃন্দের শাসক হইলে চলিবে না। ব্রিটিশ উচ্চ শিক্ষার মধ্যে যে আভিজাত্যের ধারা বদ্ধমূল রহিয়াছে তাহাই হইয়াছে ইহার ধ্বংসের কারণ। শনত এই ঐতিহ্য ক্রমে ক্রমে দূর করা সম্ভব, হয়ত বা প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বর্তমানের প্রয়োজনের সঙ্গে নিজদিগকে খাপ খাওয়াইতে পারিবে না। এ সম্বন্ধে আমি কোন অভিমত দিতে চাই না।

আমেরিকার পাবলিক স্কুল সাফল্যের সঙ্গে যে কাজ সম্পন্ন করিয়াছে তাহা পূর্বে কোথাও বিরাট আকারে করার চেষ্টা করা হয় নাই। ইহা বিভিন্ন জাতির কতক মানবগোষ্ঠিকে এক মহান জাতিতে পরিণত করা। আমেরিকা আবিষ্কারের পর ইউরোপের নানা জাতির লোক এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিতে আসে। নানা ভাষা, নানা জাতি, নানারূপ জাতীয় বৈশিষ্ট্য ইহা সত্ত্বেও এই সকল লোকগোষ্ঠিকে এমন সুষ্ঠুভাবে এক জাতিতে পরিণত করা হইয়াছে যে, যাঁহারা ইহা করিয়াছেন তাঁহাদের কৃতিত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে হয়। বস্তুত জাপানের মত আমেরিকার অবস্থাও স্বতন্ত্র, কাজেই অস্বাভাবিক অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করার ফলে কোন নীতি কার্যকরী হইয়াছে বলিয়াই তাহা যে সর্বত্র সুফলপ্রদ এবং উপযোগী হইবে এমন কোন কথা নাই। আমেরিকার কতকগুলি সুবিধা আছে, অসুবিধাও আছে। সুবিধাগুলি হইল: অর্থের প্রাচুর্য, যুদ্ধে পরাজয়ের আশঙ্কা না থাকা, মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের হাত হইতে অব্যাহতি। বিভিন্ন দেশ হইতে উপনিবেশ স্থাপন করিতে যাহারা আসিয়াছিল তাহারা মার্কিন মুলুকে জনসাধারণের মধ্যে গণতন্ত্রের অনুকূল মনোভাব এবং যান্ত্রিক সভ্যতার অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থা দেখিতে পায়, এই দুইটিই মনে হয় প্রধান কারণ যে জন্য প্রায় সকলেই নিজেদের জন্মভূমি অপেক্ষা আমেরিকার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু নবাগতদের স্বদেশপ্রেম হইয়াছিল দ্বিমুখী, ইউরোপে যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে তাহারা নিজেদের আসল জন্মভূমির সমর্থক হইয়া পড়িত। পক্ষান্তরে তাহাদের সন্তানসন্ততির তাহাদের পূর্বপুরুষের মাতৃভূমির প্রতি কোন দরদ নাই, তাহারা আমেরিকার অধিবাসী-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের পিতামাতার যে মনোভাব তাহা মার্কিন মুলুকের সাধারণ গুণের ফলেই সম্ভব হইয়াছে, সন্তানসন্ততিবর্গের মনোভাব

গড়িয়া তুলিয়াছে শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষার ফলে কি হইয়াছে তাহাই আমাদের বিবেচনার বিষয়।

x মার্কিন দেশের যে সব গুণ আছে তাহা শিক্ষার ভিতর দিয়া নাগরিকদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে স্বদেশ ও প্রেমকে কোন ভ্রান্ত আদর্শের সঙ্গে জড়িত করিয়া শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু যেখানে প্রাচীন মহাদেশ ইউরোপ নূতন মহাদেশ আমেরিকা হইতে শ্রেষ্ঠ, সেখানে প্রকৃত ভাল জিনিসের প্রতিও অবজ্ঞার ভাব ছাত্রদের মনে গড়িয়া তোলা হয়। পশ্চিম ইউরোপে জ্ঞান ও শিক্ষার মান এবং পূর্ব ইউরোপের শিল্পের মান মোটের উপর আমেরিকার মান অপেক্ষা উচ্চ। স্পেন ও পর্টুগাল ছাড়া সমগ্র পশ্চীম ইউরোপে ধর্ম সম্বন্ধীয় কুসংস্কার মার্কিন দেশ অপেক্ষা অনেক কম। ইউরোপের প্রায় সকলদেশেই ব্যক্তির উপর গোষ্ঠির প্রভাব যেমন, মার্কিন দেশে তেমন বেশী নয়: এমন কি যেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতা কম সেখানেওতাহারআভ্যন্তরীন স্বাধীনতা অনেক বেশী। এই বিষয়ে মার্কিন পাবলিক স্কুলগুলি বিশেষ ক্ষতি সাধন করে। অন্য সব কিছু বাদ দিয়া কেবল মার্কিনী স্বদেশপ্রেম শিক্ষা দেওয়াতেই ইহার উদ্ভব। জাপানী এবং জেস্থইটদের মতই এই অপকারের আসল কারণ হইল ছাত্রদের মঙ্গলের জন্মই তাহাদের শিক্ষা না দিয়া কোন উদ্দেশ্যসাধনের উপায়স্বরূপ তাহাদিগকে গড়িয়া তোলা। শিক্ষক তাঁহার রাষ্ট্র কিংবা ধর্মপ্রতিষ্ঠানের চেয়ে ছাত্রকে বেশী ভালবাসিবেন; তাহা না হইলে তিনি আদর্শ শিক্ষকই নন।

আমরা যদি বলি ছাত্র অর্থাৎ ছাত্রের কল্যাণই শিক্ষার চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত, ছাত্রকে অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপায়রূপে ব্যবহার শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত নয় তবে কেহ প্রত্যুত্তরে বলিতে পারেন কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্মই প্রত্যেকের প্রয়োজন, নতুবা তাহার সার্থকতা কি? একজন মানুষই যদি লক্ষ্য হয়, তবে তাহার মৃত্যুর সঙ্গেই সব লোপ পাইল কিন্তু উপায়স্বরূপ হইয়া সে যাহা কিছু উৎপন্ন করে তাহাতো টিঁকিয়া থাকে। এ তর্ক আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। উদ্দেশ্যসাধনের উপায় হিসাবে একজন মানুষ ভাল কাজে বা মন্দ কাজে লাগিতে পারে। মানুষের কাজের বহুদূরপ্রসারী শেষফল এত অনিশ্চিত যে, বিজ্ঞ লোকমাত্রই তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতে চাহিবেন না। মোটামুটি বলিতে গেলে ভাললোকের কাজ ভাল, খারাপ লোকের কাজ খারাপ, তবে ইহাও অপরিবর্ত্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম নহে। এক-জন খারাপ লোক একজন অত্যাচারীকে হত্যা করিতে পারে; কারণ সে হয়ত এমন অপরাধ করিয়াছে যেজন্ম অত্যাচারী শাসক তাহাকে শাস্তি দিতে চায়।

যদিও সে নিজে এবং তাহার কাজ ভাল নয় তথাপি তাহার কাজের ফল ভাল হইতেও পারে। কিন্তু সাধারণ নিয়মে ইহাই দেখা যায় যে, যেখানে জনসাধারণ অজ্ঞ এবং অপকারী সেখানকার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নরনারী সমন্বয়ে গঠিত মানব-সমাজে সুফল বেশী। ইহা ছাড়া কাহারা ছাত্রদের মঙ্গল কামনা করে, কাহারাই বা তাহাদিগকে কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপায় বা কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে তাহা শিশু, কিশোর ও যুবকগণ সহজেই বুঝিতে পারে। শিক্ষক যদি ছাত্রের প্রতি মমতাহীন হন, তবে ছাত্রের বুদ্ধিবৃত্তি বা চরিত্র কোনটিই সম্যক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে না; একমাত্র শিশুর মঙ্গলকামনার মধ্যেই এরূপ মমতা নিহিত থাকে। আমাদের সকলেরই নিজের সম্বন্ধে এরূপ মমতা আছে; আমরা নিজের জন্য ভাল জিনিস কামনা করি কিন্তু ইহার দ্বারা যে কোন মহৎ কাজ সম্পন্ন হইবে এরূপ কোন প্রমাণও আগে দেখিতে চাই না। প্রত্যেক স্নেহশীল জনক বা জননী তাঁহার সন্তানের জন্য এরূপই ভাবেন। তাঁহারা নিজেরা যেমন নিজেদের মঙ্গল কামনা করেন, তেমনি চান তাঁহাদের সন্তান সবল এবং স্বাস্থ্যবান হইয়া গড়িয়া উঠুক, স্কুলে পড়াশুনায় ভাল করুক্ ইত্যাদি; কাম্য অবস্থা বা জিনিস শেষ পর্যন্ত ভাল কি মন্দ ফল দিবে, ইহার দ্বারা ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষিত হইবে কিনা কেহ এসব চুলচেরা বিচার করিয়া দেখে না। জনক-জননীর হৃদয়ে যে সন্তানের জন্য স্বাভাবিক মঙ্গল কামনা রহিয়াছে তাহা সর্বদা কেবল নিজের সন্তানের জন্যই সীমাবদ্ধ থাকে না। শিশুদের শিক্ষক যিনি হইবেন তাঁহার অন্তরে এই কামনা থাকা চাই। শিশুদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা কতকটা শিথিল হইয়া আসে। কিন্তু যাঁহারা শিশুদের প্রতি মমতা এবং তাহাদের কল্যাণচিন্তা পোষণ করেন কেবল তাঁহারাই শিক্ষাপ্রণালী রচনার অধিকারী হইতে পারেন। যাঁহারা মনে করেন যুদ্ধ করিতে এবং যুদ্ধে প্রাণ দিতে ইচ্ছুক ও সক্ষম পুরুষ তৈয়ার করাই বালকদের শিক্ষার উদ্দেশ্য তাঁহাদের মনে পিতৃহৃদয়ের মমতা নাই; তথাপি এইরূপ লোকই ডেনমার্ক এবং চীনদেশ ছাড়া সর্বত্র শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন।

শিক্ষাবিদ্‌গণ যে ছাত্রকে ভালবাসিবেন ইহাই যথেষ্ট নয়; কি কি গুণে ভূষিত হইলে মানুষের উৎকর্ষতা বাড়ে সে সম্বন্ধেও তাঁহাদের সঠিক ধারণা থাকা চাই। বিড়াল তাহার ছানার সঙ্গে খেলা করে এবং ইঁদুর ধরা শিখায়; যুদ্ধবাদীগণ (militarists) অনুরূপভাবে মানব শিশুকে শিক্ষা দেন। বিড়াল তাহার নিজের ছানাকে ভালবাসে কিন্তু ইঁদুর ছানাকে ভালবাসে না; যুদ্ধবাদী সন্তানদিগকে ভালবাসে না। যাঁহারা সমগ্র মানবজাতিকে ভালবাসেন তাঁহারাও উৎকৃষ্ট জীবনের উপাদান কি সে সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণ করার ফলে ভুল-

পথে চলিতে পারেন। কাজেই কোন নির্দিষ্ট শিক্ষাবস্থার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কিম্বা কোন গুণ অধিগত করা (ইহা আদৌ) সম্ভবপর কিনা তাহা চিন্তা না করিয়া, মানবজীবনের চরম উৎকর্ষলাভের জন্য কিসের প্রয়োজন তাহাই প্রথমে আলোচনা করিব। পরে, যখন আমরা শিক্ষার বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব, তখন ইহা কাজে লাগিবে; তখন বুঝিতে পারিব কোন্ লক্ষ্য অভিমুখে আমরা চলিতে চাই।

আমরা প্রথমেই একটা পার্থক্যের কথা স্বীকার করিয়া লই :—এমন কিছু গুণ আছে যাহা সকলের মধ্যে না হোক কিছুসংখ্যক লোকের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়, আবার কতকগুলি গুণ সর্বজনীন হওয়া উচিত। আমরা শিল্পী চাই কিন্তু বৈজ্ঞানিকও আমরা চাই। আমরা রাষ্ট্র পরিচালক ও শাসক চাই, আবার কৃষক, মজুর ব্যবসায়ীওতো চাই। যে গুণাবলী একজন লোকের জীবনে বিরাট প্রতিভারূপে প্রকাশ পায় তাহাই সর্বসাধরেণের মধ্যে বিকশিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। শেলী একজন কবির দিনের কাজের বর্ণনা দিয়াছেন এইরূপ :—

> প্রভাত সময় হতে প্রদোষ অবধি
> দেখিবে সে হ্রদতীরে বসি'
> রৌদ্রকরে উল্লসিত মৌমাছির মেলা
> ফুলে ফুলে। বস্তুপুঞ্জে নাহি আকর্ষণ,
> নিমগন সুন্দরের ধ্যানে।

কবির পক্ষে এই অভ্যাস প্রশংসনীয় কিন্তু ডাকপিওনের পক্ষে নয়। কাজেই সকলের মধ্যেই কবির স্বভাব বা মনোভাব গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে আমরা কোন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারি না। কিন্তু কতকগুলি গুণ সকলের মধ্যেই বিকশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, কেবল এইগুলিই এখানে বিবেচনা করিব।

এই গুণসমূহের কোন্গুলি পুরুষের পক্ষে প্রযোজ্য, কোন্গুলি স্ত্রী-লোকের পক্ষে প্রযোজ্য সে সম্বন্ধে কোন পার্থক্য করিতে চাই না। যে সকল স্ত্রীলোককে শিশুর যত্নপরিচর্যা করিতে হয়, তাঁহাদের জন্য পেশামূলক কিছু শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা উচিত; একজন কৃষক ও একজন মিলচালক বা মজুরের মধ্যে শিক্ষার যা পার্থক্য এ ক্ষেত্রেও পার্থক্য প্রায় সেইরূপ। এ পার্থক্য মূল-নীতিগত নয় এবং ইহা লইয়া এ পর্যায়ে আলোচনারও প্রয়োজন নাই।

যে চারিটি বৈশিষ্ট্য একত্র মিলিত হইয়া আদর্শ চরিত্র গঠন করিতে পারে প্রথমে তাহারই উল্লেখ করা হইতেছে :—উৎসাহ-উদ্দীপনা (উদ্যম), সাহস, অনুভূতিশীলতা এবং বুদ্ধি। মানব চরিত্রে গুণাবলীর পক্ষে এই তালিকাই যে

সম্পূর্ণ, তাহা বলি না কিন্তু ইহার মধ্যে অনেকগুলি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে যথোপযুক্তভাবে দেহমনের যত্ন লইলে এইগুলি প্রায় সকলের মধ্যেই বিকশিত করা যায়। একে একে ইহাদের আলোচনা করা যাক।

উদ্যম ঃ

উদ্যমকে মানসিক বৈশিষ্ট্য না বলিয়া বরং দৈহিক বৈশিষ্ট্য বলা যায়। যেখানেই ভাল স্বাস্থ্য সেখানেই উদ্যম বিদ্যমান, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহা কমিতে থাকে এবং বার্ধক্যে শেষ হইয়া যায়। স্বাস্থ্যবান শিশুদের বেলায় তাহাদের স্কুলে যাওয়ার বয়স হওয়ার আগেই ইহা পূর্ণমাত্রায় বিকাশ লাভ করে, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে কমিতে থাকে। দেহের সবল সুস্থভাব বাঁচিয়া থাকার আনন্দ বাড়াইয়া দেয়, কষ্টবোধ হ্রাস করে। উদ্যমশীল শিশু যাহা দেখে সবকিছুতে কৌতূহল বোধ করে এবং নানা জিনিসের সঙ্গে পরিচিত হয়। বহির্জগতের নানা বিষয়ের সংস্পর্শে আসিয়াই শিশু তাহার বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দেয়। মানুষ তাহার চতুর্দিকে যাহা কিছু দেখে বা শোনে তাহাতে যদি কোন প্রকার আনন্দ না পায়, তবে স্বভাবতই সে নিজের ভিতরেই ইহার সন্ধানে ডুবিয়া যায়। আত্মস্থ হইয়া পড়ে। ইহা দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়া পড়ে কেননা বহির্জগতের আনন্দ উপভোগে অসমর্থ, নিরানন্দ লোকের জীবনে প্রথমে আসে অবসাদ, ইহাই ক্রমে বিষণ্ণতা ও মানসিক রোগে পরিণত হয়। অতি অল্প ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল ক্ষেত্রেই মানসিক বিষণ্ণতা জীবনকে অকেজো করিয়া ফেলে। উদ্যম বহির্জগতের প্রতি মানুষের মনকে আকৃষ্ট করে, ইহা কাজের ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে। উদ্যম মানুষের জীবনকে আনন্দময় করে, ইহা ঈর্ষার বড় প্রতিষেধক। মানুষের মনঃকষ্টের একটি বড় কারণ পরশ্রীকাতরতা। এই পরশ্রীকাতরতা উদ্যমশীল লোকের আনন্দময় জীবনে ঘেঁসিতে পারে না। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহের উদ্যমের সঙ্গে অনেক দোষ যুক্ত থাকিতে পারে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একটি সবল সুস্থ বাঘের কথা। আবার উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের অভাব থাকিলেও লোকের অনেক গুণ থাকিতে পারে। উদাহরণ দেওয়া যায়—নিউটন (Newton) এবং Locke উভয়েরই স্বাস্থ্য ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। এ দুজনেই ছিলেন খটখিটে মেজাজসম্পন্ন এবং ঈর্ষাপরায়ণ, ইহারা স্বাস্থ্যবান হইলে হয়ত দোষ হইতে মুক্ত থাকিতে পারিতেন। নিউটন যদি স্বাস্থ্যবান হইতেন এবং জীবনের সাধারণ সুখ উপভোগ করিতে পারিতেন, তবে হয়ত লিবনিজের (Leibiniz) সঙ্গে তাহার যে বাকবিতণ্ডার ফলে

ইংলণ্ডের গণিতবিদ্যা একশত বৎসরের জন্য ধ্বংস হইয়াছিল তাহা সংঘটিতই হইত না। দৈহিক পূর্ণস্বাস্থ্যের কিছু কিছু দোষ থাকা সত্ত্বেও উদ্যমকে আমি মানুষের পক্ষে একান্ত কাম্যগুণ বলিয়া মনে করি।

সাহস ঃ

সাহসের কয়েকটি প্রকার আছে এবং সব কয়টিই জটিল। ভয়শূন্যতা এক জিনিস এবং ভয় দমন করিবার ক্ষমতা অন্য জিনিস। বাস্তব এবং যুক্তিসঙ্গত ভয় হইতে মুক্ত থাকা এক কথা, অবাস্তব বা অযৌক্তিক ভয় হইতে মুক্ত থাকা অন্য কথা। অবাস্তব ভয় না থাকা খুবই ভাল, ভয়কে দমন করার শক্তিও প্রশংসনীয়। কিন্তু ভয় যেখানে যুক্তিসঙ্গত সেখানেও যদি ভয়শূন্যতা থাকে তবে তাহা কিসের দ্যোতক, তাহার ফলাফলই বা কি হইতে পারে সে সম্বন্ধে তর্ক চলিতে পারে। যাহা হউক, আপাততঃ এ তর্ক স্থগিত রাখিয়া সাহসের অন্য স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

বেশীরভাগ লোকের ভাব জীবনে (emotional life) অবাস্তব ভীতি একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। অকারণ উৎপীড়নের আশংকা, বিনা কারণে অমূলক উৎকণ্ঠা বোধ করা প্রভৃতি উৎকট মানসিক রোগের প্রকৃতি নির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য উন্মাদরোগীর চিকিৎসকের প্রয়োজন। এগুলি যাহাদের মধ্যে তীব্র আকারে প্রকাশ পায় তাহারা উন্মাদের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু মৃদু আকারে এরূপ ভাব অনেক সুস্থ ব্যক্তির মধ্যেও দেখা যায়। কাহারো এরূপ বোধ হইতে পারে যে, তাহার চারিদিকে বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে, হঠাৎ কোন কিছু ঘটিতে পারে, ইহাকেই বলা চলে উৎকণ্ঠা, কাহারো বা হয়ত কোন কিছু ভয়ের ভাব বদ্ধমূল হইয়াছে, অথচ প্রকৃতই তাহাতে ভয়ের কিছু নাই, যেমন ইঁদুর বা মাকড়সা দেখিয়া ভয় পাওয়া। আগে মনে করা হইত যে, ভয় মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তি অর্থাৎ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কতকগুলি প্রবৃত্তির মত ভয়ও সে লাভ করে কিন্তু বর্তমান গবেষকগণের অধিকাংশই এখন ইহা মানেন না। বাস্তবতঃ জন্মগত কয়েকটি ভয় আছে, যেমন উচ্চ শব্দ শুনিয়া ভয়, কিন্তু বেশীরভাগ ভয়ের উৎপত্তি হয় অভিজ্ঞতা হইতে আর না হয় অন্যের সংস্পর্শ হইতে। অন্ধকার দেখিয়া ভীত হওয়া সম্পূর্ণরূপে অন্যের কাছে পাওয়া। এরূপ মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে, মেরুদণ্ডী প্রাণীদের স্বভাব শত্রু সম্বন্ধে তাহাদের কোন ভীতিবোধ থাকে না. ইহা তাহারা তাহাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের নিকট হইতে লাভ করে। মানুষ যখন ইহাদিগকে হাতে করিয়া লালন পালন করে তখন ইহাদের গোষ্ঠির অন্যান্যদের

মধ্যে যে ভয় স্বাভাবিক তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহা অত্যন্ত সংক্রামক। শিশুরা তাহাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের নিকট হইতে ইহা পায়, এমন কি বয়োজ্যেষ্ঠরা হয়ত জানিতেই পারিলেন না কখন কি ভাবে তাহারা ভীতির ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। জননী বা ধাত্রীর ভীরুতা শিশু অতি শীঘ্র অনুকরণ করে। এতদিন পুরুষেরা মনে করিয়াছেন যে অবাস্তব ভয়ে ভীত থাকিলে স্ত্রীলোকের আকর্ষণ বাড়ে কেননা ইহার ফলে তাহারা প্রকৃত কোন বিপদের সম্মুখীন না হইয়াও বিপন্ন মহিলাদের রক্ষক সাজিবার সুযোগ পাইতেন, কিন্তু ইহাদের পুত্রগণ তাহাদের জননীর নিকট হইতে ভয় অর্জন করিয়াছে। অথচ পুরুষগণ যদি স্ত্রীলোকদিগকে এভাবে অশ্রদ্ধা না করিত তবে তাহাদের সন্তানগণ ভীত হইয়া গড়িয়া উঠিত না। [শিক্ষার ভিতর দিয়া তাহাদের ভয় দূর করিয়া সাহসী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হয়।] স্ত্রীলোকদিগকে অধীন করিয়া রাখা অপরিসীম ক্ষতির কারণ হইয়াছে, সন্তানের মনে ভয়সঞ্চার ইহার কেবল একটি উদাহরণ মাত্র।

কি উপায়ে ভয় এবং উৎকণ্ঠা কমান যায় এখন তাহার আলোচনা করিতেছি, পরে এ বিষয়ে আলোচনা হইবে। এখানে একটি প্রশ্ন উঠে: ভয় চাপিয়া রাখিয়াই কি আমরা সন্তুষ্ট থাকিব, না ইহার কারণেরই মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে? ঐতিহ্য এইভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে যে, অভিজাত সম্প্রদায় কোনপ্রকার ভয়ে ভীত হইবে না, পরাধীন জাতির লোকজন, সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষ এবং স্ত্রীলোকদিগকে ভীরু হইয়া থাকিতে উৎসাহিত করা হইয়াছে। বাহিরের আচরণ দ্বারা এর সাহসের প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে—সাহসী ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইবে না, পুরুষোচিত খেলাধূলায় সে পারদর্শী হইবে, অগ্নিকাণ্ড, জাহাজডুবি, ভূমিকম্প প্রভৃতির সময় সে আত্মসংযম হারাইয়া ফেলিবে না। সাহসের পরিচয় দিতে গিয়া যখন যাহা করা দরকার সে শুধু তাহাই করিবে না, ভয়ের কোনরূপ চিহ্ন যেন যাহাতে তাহার আচরণে বা দেহে প্রকাশ না পায়—যেমন বিবর্ণ হইয়া যাওয়া, কাঁপিতে থাকা, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলা প্রভৃতি—তাহাই করিতে হইবে। এ সমস্ত খুবই প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান, পৃথিবীর সকল জাতির, সকল শ্রেণীর পুরুষ ও নারী সকলের মধ্যেই সাহসের উদ্বোধন ঘটুক ইহাই আমি দেখিতে চাই। কিন্তু যখন ভয় দমন করিয়া বা চাপিয়া রাখিয়া সাহসের ভাব দেখান হয় তখন দমন করার দরুন কুফলের হাত এড়ান যায় না। লজ্জা ও অপমান সর্বদা সাহস উৎপাদনের প্রধান উপায় হইয়া আছে। কার্যতঃ কিন্তু ইহা দুইটি ভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব মাত্র—ভয় এবং ভয়ে ভীত হইলে অন্যের নিকট হইতে লজ্জা পাওয়ার ভয়, এই দুই ভয়ের দ্বন্দ্বে সাধারণের

নিকট অপমানিত হওয়ার ভয়ই প্রবল হয়। এবং অপমানের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে সাহস প্রদর্শন করে। বাল্যকালে আমাকে শিখানো হইত—যখন তোমাকে কোন কিছু ভয় দেখায় তখন ছাড়া অন্য সব সময় সত্য কথা বলিবে। সময় সময় যে সত্যকথার ব্যতিক্রম করা উচিত তাহা আমি মানি না। ভয়কে জয় করিতে হইবে, শুধু কাজে নয় চিন্তাতেও; কেবল সজ্ঞান চিন্তাতে নয়, নিজ্ঞান (Unconscious) চিন্তাতেও। [ভয়ের সম্মুখীন হইয়াও অনেক সময় মানুষ লোকলজ্জার ভয়ে সাহসের পরিচয় দেয়। এক্ষেত্রে লোকভয় তাহার প্রাথমিক ভয়কে জয় করিয়াছে; সাহসীর মত আচরণের মধ্যে এই জয়ের অভিব্যক্তি দেখা দেয়।] অভিজাতের রীতি অনুযায়ী ভয়কে বাহ্যতঃ জয় করা হইল বটে কিন্তু আসল ভাবটির মনের গহনে প্রবেশ এমন নূতন আকারে আত্মপ্রকাশ করে যে, সেটি যে ভয় হইতেই সঞ্জাত তাহা বুঝিবার উপায় থাকে না। কামানের 'গোলার ভীতির' কথা বলিতেছি না; সেক্ষেত্রে ভয় সুস্পষ্ট। প্রতিপত্তিশালী জাতি-সমূহ যে অত্যাচার এবং নিষ্ঠুরতার সাহায্যে—তাহাদের প্রাধান্য বজায় রাখে আমি তাহার কথাই চিন্তা করিতেছি। কিছুদিন আগে একজন বৃটিশ কর্মচারী সাংহাইতে একদল নিরস্ত্র চীনা ছাত্রকে সতর্ক করিয়া না দিয়া পিঠের দিক হইতে গুলি করিয়া মারিবার নির্দেশ দিয়াছিল। যেরূপ ভীত হইলে একজন সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে, তখন সেই কর্মচারীটিও নিশ্চয়ই ঠিক তেমনি ভীত হইয়াছিল। কিন্তু যোদ্ধা অভিজাত সম্প্রদায়ের এতখানি বুদ্ধি নাই যে, এইরূপ ঘটনার মনস্তাত্ত্বিক কারণ নির্ণয় করিতে পারে; তাহারা বরং ইহাকে দৃঢ় এবং উপযুক্ত মনোভাব প্রদর্শন বলিয়াই মনে করে।

মনস্তত্ত্ব ও শারীরবিজ্ঞানের দিক দিয়া ভয় এবং ক্রোধ একই জাতীয় প্রক্ষোভ (emotion); ক্রুদ্ধ ব্যক্তি উন্নত ধরনের সাহস প্রদর্শন করিতে পারে না। নিগ্রো-বিদ্রোহ দমনে, কমিউনিস্ট বিপ্লবে দমনে এবং আভিজাত্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল রকম আন্দোলন দমন করিতে যে নিষ্ঠুরতা দেখান হইয়াছে তাহা কাপুরুষতা হইতেই উৎপন্ন। কাপুরুষতার স্থূল প্রকাশ যেরূপ ঘৃণার যোগ্য, এ আচরণ তেমনি নিন্দনীয়। আমি বিশ্বাস করি যে, সাধারণ স্ত্রী-পুরুষকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় যাহাতে তাহারা ভয়শূন্য হইয়া জীবন যাপন করিতে পারে। এ পর্যন্ত কেবল বড় বড় ঋষিরাই এরূপ জীবন যাপন করিয়াছেন; কিন্তু উপায় দেখাইয়া দিলে সাধারণ লোকেও নির্ভীকতা লাভ করিতে পারে।

যে সাহসের অর্থ কেবল দমন করা নয়, সেরূপ প্রকৃত সাহস অর্জন করিতে হইলে কতকগুলি বিষয় দরকার। প্রথমেই বলা যায় স্বাস্থ্য এবং

উদ্যম। এ-দুইটি সম্পূর্ণ অপরিহার্য না হইলেও বিশেষ সহায়ক। বিপদ জনক অবস্থা হইতে উদ্ধার হওয়ার অভ্যাস এবং কৌশলও বিশেষ বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমরা যখন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে প্রদর্শিত সাহস নয়, সাধারণ সাহসের কথা বিবেচনা করি,—তখন আরো মৌলিক (fundamental) কতকগুলি গুণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ইহা হইল আত্মসম্মান এবং জীবনের প্রতি নৈর্ব্যক্তিক (Impersonal) দৃষ্টিভঙ্গীর সংমিশ্রণ। প্রথমে আত্মসম্মানের কথা আলোচনা করি:—কতকলোক নিজেদের অন্তরের মধ্যে বাস করেন অর্থাৎ নিজেদের বিচার বুদ্ধি এবং বিবেক দ্বারা পরিচালিত হন, অপর কতকলোক তাঁহাদের প্রতিবেশী বা বন্ধুবান্ধবের দর্পণস্বরূপ, অপরের অনুভূতি এবং অভিমত দ্বারা পরিচালিত হন। এরূপ লোকের সত্যকারের সাহস থাকিতে পারে না, ইহারা প্রশংসার কাঙাল, প্রশংসা নষ্ট হবে এই ভয়ে ইঁহারা ভীত। বিনয়, নম্রতা, শিক্ষার সময় বাঞ্ছনীয় মনে করা হইত, ইহার কুফল ফলিয়াছে। নম্রতা অর্জন করিতে ইচ্ছুক লোকদিগকে আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে হইয়াছে কিন্তু তাহারা অপরের নিকট হইতে শ্রদ্ধা পাইবার বাসনা ত্যাগ করে নাই। নম্র হওয়া, আত্মসম্মান বিকাইয়া দেওয়া ইহারা লোকের বাহবা পাওয়ার উপায় বলিয়া মনে করিয়াছে। এইভাবে মিথ্যাচার এবং ভণ্ডামি প্রশ্রয় পাইয়াছে। শিশুদিগকে যুক্তি দিয়া বুঝাইয়াই আদেশ মানিয়া লইতে শিখানো হইত না, তাহাদের বয়স বেশী হইলে তাহারাও অন্যের নিকট হইতে এইরূপ নীতি স্বীকার দাবী করিত, বলা হইত যে, যাহারা আদেশ মান্য করিতে জানে, কেবল তাহারাই আদেশ করিতেও জানে। আমি বলি আদেশ মান্য করার শিক্ষার প্রয়োজন নাই, কাহাকেও আদেশ দান করারও প্রয়োজন নাই। অবশ্য আমি একথা বলি না যে, সহযোগিতামূলক সমবায় পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত কোন কাজে কোন নেতা থাকিবে না। ফুটবল দলের অধিনায়কের নির্দেশ যেমন সকলে স্বেচ্ছায় মানিয়া চলে, তেমনি একই উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাপারে সকলে নেতার আদেশ সানন্দে এবং স্বেচ্ছায় মানিয়া চলিবে। এই উদ্দেশ্য যেন আমাদের সকলেরই উদ্দেশ্য হয়, বাহির হইতে কেহ যেন আমাদের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দিয়া তাহা সাধন করিতে হুকুম না করে। কাহারো আদেশ করার দরকার নাই, কাহারো আদেশ পালন করারও প্রয়োজন নাই একথা বলিতে আমি ইহাই বুঝাইতে চাই।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহস প্রদর্শনের জন্য আরো একটি জিনিসের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইল জীবনের প্রতি নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি। যে ব্যক্তি অতিমাত্রায় আত্ম-সর্ব্বস্ব, যাহার আশা, ভয় সমস্ত কিছুই কেবল নিজেকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হয়, সে প্রশান্ত চিত্তে মৃত্যু বরণ করিতে পারে না, কেন না মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই

তাহার ভাব ও আশা-আকাঙ্ক্ষার জগতের পরিসমাপ্তি ঘটে। এখানেও আমরা আত্মদমনের একটা সহজ পন্থা প্রচলিত দেখি; সাধুব্যক্তিকে আত্মবর্জন করিতে হইবে, দেহের কষ্ট বরণ করিতে হইবে, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগত আনন্দ উপভোগ পরিত্যাগ করিতে হইবে। এরূপ করা যায়, কিন্তু ইহার ফল হয় খারাপ। নিজের সুখ বর্জন করিয়া ত্যাগী সন্ন্যাসী ব্যক্তি অপরের পক্ষেও ইহা বর্জনীয় মনে করে। এইরূপ মনে করা সহজ। আত্মনিপীড়নকারী ব্যক্তি বুঝিতে পারে না কিন্তু সংসারের ভোগীদের প্রতি ঈর্ষা তাঁহার মনের গভীরে ফল্গুর স্রোতের মত বহিতে থাকে; তিনি মনে করেন শারীরিক দুঃখকষ্ট সহ্য করা মহনীয় কাজ, কাজেই ন্যায়সঙ্গত ভাবেই ইহা অন্যের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া যায়। এইভাবে জীবনের মূল্য সম্বন্ধেই এক সম্পূর্ণ ভুল এবং বিপরীত ধারণার সৃষ্টি হয়। যাহা ভাল তাহাকে মনে হয় মন্দ এবং যাহা মন্দ তাহাকেই মনে হয় ভাল। এইসব ক্ষতির মূল কারণ হইল স্বাভাবিক বাসনা ও প্রবৃত্তিগুলির বৃদ্ধি এবং বিকাশ না ঘটাইয়া নীতিমূলক আদর্শের সাহায্যে মহৎ জীবন গঠনের চেষ্টা। মানুষের স্বভাবে এমন কতকগুলি জিনিস আছে যাহা বিনা চেষ্টাতেই আমাদিগকে আমাদের সত্তার ঊর্ধ্বে লইয়া যাইতে পারে। ইহাদের প্রধান হইল প্রীতি, বিশেষ করিয়া জনক-জননীর বাৎসল্য। কোন কোন লোকের মধ্যে এই প্রীতি এমন ব্যাপক যে সমগ্র মানবজাতিকে তাঁহারা প্রীতি-পাশে আবদ্ধ করিতে পারেন। অন্য বিষয়টি হইল জ্ঞান। গ্যালিলিও যে বিশ্বের কল্যাণকামী ঋষি-প্রকৃতির লোক ছিলেন এমন অনুমান করিবার কোন কারণ নাই, তথাপি জ্ঞানের সাধনায় তিনি যাহা সত্য বলিয়া স্থির বিশ্বাস করিয়াছিলেন তাহার জন্য জীবন দিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। অপর বিষয় হইল শিল্প। প্রকৃতপক্ষে মানুষে নিজের দেহ ছাড়া বাহিরের জিনিসের দিকে যে পরিমাণ আকৃষ্ট হইবে ততই তাহার জীবনের প্রতি নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গীও সেই পরিমাণে বাড়িবে। এইজন্য, শুনিতে স্বয়ংবিরোধী মনে হইলেও, ইহা সত্য যে, যে-ব্যক্তি বহির্জগতের নানা বিষয়ে দীপ্ত উৎসাহ দেখাইয়া থাকে সে যত সহজে জীবনের মায়া কাটাইতে পারে একজন হতভাগ্য, সর্বদা অমূলক রোগের ভয়ে শংকিত, মনোবিকারগ্রস্থ রোগী তত সহজে প্রাণের মায়া কাটাইতে পারে না। এমন মানুষের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়, যিনি নিজের সত্তাকে বিশ্বের একটি অংশ বলিয়া অনুভব করেন—নিজেকে হেয় করিয়া নয়, নিজের জীবন ছাড়া অন্য কোন জিনিসকে জীবনের চেয়ে মহত্তর বলিয়া মনে করিয়া।

প্রকৃতি মুক্ত এবং বুদ্ধি সক্রিয় না থাকিলে এরূপ ঘটিতে পারে না। এই দুইটির মিলনের ফলে দৃষ্টিভঙ্গীর এমন উদারতা এবং ব্যাপকতা জন্মে যে, তাহা

ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং সংযমী ঋষি উভয়েরই কাছে অজ্ঞাত ; এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর নিকট ব্যক্তিগত মৃত্যু অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। এই সাহস অস্থি-মূলক (Positive) এবং প্রবৃত্তি সঞ্জাত, নেতিমূলক (negative) ও দমনমূলক নয়।

অনুভূতিশীলতা

এক হিসাবে অনুভূতিশীলতাকে সাহসের সংশোধক বলা যায়। যে ব্যক্তি বিপদ সম্বন্ধে ধারণা বা অনুভব করিতে পারে না তাহার পক্ষে সাহসীর ন্যায় আচরণ করা সহজ ; এরূপ সাহস প্রায়ই মূর্খতার সামিল। অজ্ঞতা বা বিস্মৃতির ফলে যে কাজ অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে কখনই সন্তোষজনক বলা যায় না। কোন কাজের মূলে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ জ্ঞান এবং তাহার সম্বন্ধে ধারণা বিদ্যমান থাকা বাঞ্ছনীয়। কোন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে গেলে বুদ্ধির কথা উঠে ; আমি এখানে অনুভূতিশীলতাকে মনের ভাব বা প্রক্ষোভের পর্যায়ে ফেলিয়াছি। ইহার সহজ ব্যাখ্যা এইভাবে করা যায় : যখন অনেকগুলি ঘটনা কোন ব্যক্তির মনে নানা প্রক্ষোভের (emotions) সৃষ্টি করিয়া নানা ভাব জাগাইয়া তোলে তখন বলা যায় যে, সে অনুভূতিশীল হইয়া উঠিয়াছে ; ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে এই মানসিক অবস্থা সর্বদা কল্যাণকর নাও হইতে পারে। ভাল হইতে হইলে মনের উপর এই অনুভূতির প্রতিক্রিয়া যথাযথ হওয়া দরকার ; শুধু প্রতিক্রিয়ার তীব্রতার প্রয়োজন নাই। বাহিরের সুখদুঃখ আনন্দ-বেদনাময় ঘটনায় মনে অনুরূপ অনুভূতি জাগরিত হোক ইহাই আমার কাম্য। আনন্দময় ঘটনা মনে আনন্দের অনুভূতি জাগাইবে, দুঃখময় ঘটনা মনে বেদনার অনুভূতি জাগাইবে—ইহাকেই বলা চলে যথাযথ প্রতিক্রিয়া।

সঠিক বিষয় কি তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব। শিশুর বয়স যখন পাঁচ মাসের মত তখন খাদ্য এবং কোমল উষ্ণতায় সে যে আনন্দ অনুভব করে তাহা ছাড়াইয়া আরো একটি নূতন আনন্দানুভূতির রাজ্যে উপনীত হয়। ইহা হইল প্রশংসায় পুলকিত হওয়ার আনন্দময় অনুভূতি। এই অনুভূতি খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় : প্রত্যেক শিশুই প্রশংসা ভালবাসে, দোষারোপ অপছন্দ করে। সাধারণতঃ লোকে ভাল বলুক এই ইচ্ছা মানুষের সারা জীবন ধরিয়া প্রবল থাকে। অপরের প্রশংসা লাভ করার বাসনা মানুষকে মনোজ্ঞ আচরণ করিতে উৎসাহিত করে। তাহার লোভের প্রবৃত্তি দমন রাখিতে সাহায্য করে। কোন্ কোন্ গুণ প্রকৃতই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য সে সম্বন্ধে আমরা যদি কিছু বিচক্ষণতার পরিচয় দিতাম, তবে ফল অনেক ভাল হইত। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক মানুষের হত্যাকারীকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া প্রশংসা

করা হইবে, ততদিন শিশুর প্রশংসালাভের বাসনাকেই ভাল জীবনগঠনের একমাত্র উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে না। [দিগ্বিজয়ী বীরের প্রশংসা শুনিয়া বালক নিজেও প্রশংশিত ব্যক্তির গুণাবলী অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে; যাহাকে সে বীর বলিয়া অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে,—তাঁহার গুণগুলি তাহার কাছে মহনীয় মনে হয়। এইভাবে প্রকারান্তরে সে দিগ্বিজয়ী যোদ্ধার নিষ্ঠু-রতাকে গুণ বলিয়া বরণ করিয়া নেয় এবং নিজের জীবনেও অনুকরণ করে।]

অনুভূতিশীলতা বিকাশের দ্বিতীয় সোপান হইল সমবেদনা। এক রকম সমবেদনা আছে যাহা শুধুই দৈহিক—যেমন ছোট শিশু তাহার ভাই বা বোনকে কাঁদিতে দেখিলে নিজেও কাঁদিতে শুরু করে। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া সমবেদনা বিকাশের সুযোগ কাজে লাগান যায়। স্বাভাবিক সহানুভূতি বোধকে দুইদিকে বাড়ানো দরকার—প্রথম, বিপন্ন ব্যক্তি বিশেষস্নেহের পাত্র না হইলেও তাহার দুঃখে সহানুভূতি বোধ করা; দ্বিতীয়, যখন বিপন্ন ব্যক্তি চোখের সামনে নেই, তখন তাহাদের দুঃখদুর্দশার কথা শুনিয়াই সমবেদনা বোধকরা। এই দ্বিতীয় উপায়ে সমবেদনা বোধ করা প্রধানতঃ বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। ভাল উপন্যাসে দুঃখ-দুর্দশার জীবন্ত বর্ণনা পাঠ করিয়া পাঠক সমবেদনা বোধ করিতে পারে; আবার ইহা (বুদ্ধি) এমন উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে যাহার ফলে পরিসংখ্যান (statistics) দেখিয়াই কেহ সহানুভূতিতে বিগলিত হইতে পারেন। নিজের প্রিয়জনের কর্কটরোগ (Cancer) হইলে প্রায় সকলেই সমবেদনায় উদ্বেল হইয়া উঠেন। বেশীরভাগ লোক হাসপাতালে অপরিচিত রোগীর যন্ত্রণা দেখিয়া বিচলিত হয়। অথচ যখন তাহারা পড়ে যে, কর্কটরোগে মৃত্যুর হার বাড়িয়াছে তখন তাহারা তাহাদের নিজেদের ঐ রোগ হইতে পারে, কিম্বা তাহাদের প্রিয়জনের হইতে পারে এই আশংকায় সাময়িকভাবে বিচলিত হয় মাত্র। যুদ্ধ সম্বন্ধে একথা খাটে। যাহাদের ছেলে বা ভাই যুদ্ধে বিকলাঙ্গ হয় তাহারা যুদ্ধকে ভয়ঙ্কর মনে করে, আরো লক্ষ লোক যে বিকলাঙ্গ হইতে পারে তাহা ভাবিয়া তাহারা যুদ্ধকে লক্ষগুণ ভয়ংকর মনে করে না। যিনি ব্যক্তিগত আচরণে সহৃদয়তার পরিচয় দেন তিনিও যুদ্ধে উত্তেজনা দান ব্যাপার হইতে কিম্বা 'অনুন্নত' দেশে শিশুদের উপর অত্যাচার চালনা হইতে অর্থো-পার্জন করেন। এই সকল পরিচিত ঘটনার কারণ হইল এই যে, বস্তু-নিরপেক্ষ (abstract) কোন তথ্য বেশীরভাগ লোকের মনে সহানুভূতি জাগাইতে পারে না। জাগাইতে পারিলে বর্তমান জগতের অনেক অন্যায়ের অবসান ঘটান সম্ভব হইত। আধুনিক বিজ্ঞান আমাদিগকে দূরবর্তী দেশের মানবগোষ্ঠির উপরও প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম করিয়াছে কিন্তু তাহাদের জন্য সহানুভূতি

বোধ বৃদ্ধি করে নাই। মনে করুন, আপনি সাংহাইতে তুলা উৎপাদন ব্যবসাতে লিপ্ত কোন কোম্পানীর অংশীদার। আপনি হয়ত কর্মব্যস্ত লোক, ব্যবসায়ী উপদেষ্টার পরামর্শক্রমেই আপনি টাকা খাটাইতেছেন, সাংহাই বা তুলা-ব্যবসা কোনটি সম্বন্ধেই আপনার কৌতূহল নাই, আপনি কেবল চান লাভের টাকা। তবু নিরীহ লোকদের হত্যার ব্যাপারে আপনি অংশ গ্রহণ করিতেছেন, এবং ছোট ছোট বালকবালিকাকে অস্বাভাবিক ও বিপজ্জনক কাজে না খাটাইলে আপনার লাভের অঙ্কে শূন্য পড়িবে। আপনার মনে কোন ভাবান্তর হয় না, কেননা আপনি সেখানকার বালক-বালিকাদিগকে দেখেন নাই এবং শুধু তথ্য আপনাকে বিচলিত করিতে পারে না। বৃহদাকারের যন্ত্রশিল্প যে এত নির্মম কেন এবং পরাধীন জাতির অধিবাসীদের উপর অত্যাচার যে বিজয়ী জাতির লোকে সহ্য করে কেন তাহার মূল কারণ ইহাই। যদি এমন শিক্ষা দেওয়া যায় যাহার সাহায্যে বস্তু নিরপেক্ষ তথ্য দ্বারাও অনুভূতি জাগানো সম্ভব, তাহা হইলে সেই শিক্ষাই এরূপ অবিচার ও অত্যাচারের বিলোপ ঘটাইবে।

জ্ঞানোত্থিত অনুভূতি অর্থাৎ জ্ঞান হইতে যে অনুভূতি উদ্ভূত হয় সেরূপ ভাবাবেগও প্রয়োজন। ইহাকে অন্য কথায় পর্যবেক্ষণের অভ্যাসও বলা যায়। বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সৌন্দর্যবোধের সাথে কতকগুলি সমস্যা জড়িত আছে, সেগুলি বর্তমানে আলোচনা করিতে চাই না। কাজেই উন্নত চরিত্রের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য 'বুদ্ধি' সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বুদ্ধি

প্রচলিত নীতি জ্ঞানের একটি দোষ এই যে ইহা বুদ্ধির উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করে নাই। গ্রীকগণ ভুল করেন নাই কিন্তু খৃষ্টধর্ম প্রচারকগণ লোকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছেন যে, কতকগুলি গুণ ছাড়া অন্য কোন বৈশিষ্ট্যের মূল্য নাই। গুণ বলিতে কি বোঝায়? কতকগুলি কাজকে তাঁহারা নিজেদের খেয়াল খুশীমত 'পাপ' আখ্যা দিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। একাজ-গুলি হইতে বিরত থাকাই তাহাদের গুণের পরিচায়ক, যতদিন এই ধারণা প্রচলিত থাকিবে ততদিন এই তথাকথিত 'গুণ' অপেক্ষা যে বুদ্ধি অনেক বেশী কাজে লাগে তাহা লোককে বুঝান যাইবে না। বুদ্ধি বলিতে অর্জিত জ্ঞান এবং জ্ঞান গ্রহণের ক্ষমতা, এ দুইটিই বুঝাইতেছি। বস্তুতঃ এই দুইটি পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। মূর্খ বয়স্ক ব্যক্তিগণ জ্ঞান গ্রহণ করিতে অক্ষম; উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, স্বাস্থ্যনীতি বা খাদ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞান যাহা বলে তাহা তাহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না। একজন লোক যত বেশী জানে, তাহাকে তত

বেশী শিখানো সহজ, অবশ্য সে যদি কোন প্রকার কুশিক্ষার ফলে মানসিক সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামিতে অভ্যস্ত না হইয়া উঠিয়া থাকে। অজ্ঞ লোকের এমন অপরিবর্তনশীল, আড়ষ্ট মানসিক অভ্যাস গঠন করিয়া থাকে যে, তাহারা কিছুতেই তাহা বদলাইতে পারে না। যেখানে বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ না করিয়া সহজে কিছু বিশ্বাস করা উচিত নয়, সেখানে অজ্ঞব্যক্তিরা অতি সহজেই বিশ্বাস করে, শুধু তাহাই নয়, যেখানে জ্ঞান গ্রহণ করা উচিত সেখানে তাহারা হয় অবিশ্বাসী। 'বুদ্ধি' কথাটির যথাযথ অর্থ হইল অর্জিত জ্ঞান নয়, জ্ঞান অর্জনের প্রবণতা বা মানসিক শক্তি। পিয়ানোবাদক বা দৈহিক কসরৎ প্রদর্শনকারী যেমন পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের ফলে কৌশল আয়ত্ত করেন, জ্ঞান অর্জনের প্রবণতা বা শক্তিও তেমনি চেষ্টা করিয়া আয়ত্ত করিতে হয়। বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন না করিয়াই অবশ্য শিক্ষাদান করা সম্ভবপর, শুধু সম্ভবপর নয়, এরূপ করা সহজ এবং প্রায়শই করা হইয়া থাকে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে, জ্ঞানদান ব্যতিরেকে বুদ্ধির অনুশীলন সম্ভব। বুদ্ধি ব্যতীত আমাদের বর্তমান জটিল জগৎ চলিতে পারে না, উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়াতো অসম্ভব। এজন্য বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশকে আমি শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। মনে হইতে পারে, ইহা তো অতি সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সেরূপ নয়। সত্য বিশ্বাস বলিয়া যাহা প্রচলিত সেগুলি ছাত্রদের মনে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিতে গিয়া শিক্ষাবিদগণ অনেক সময় বুদ্ধির সম্যক শিক্ষণের প্রতি উদাসীন হইয়া পড়েন। এই বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে গেলে 'বুদ্ধি' কথাটি ভালভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার, কেননা ইহা দ্বারাই জানা যাইবে বুদ্ধির অস্তিত্ব ও বিকাশের জন্য কি কি মানসিক অভ্যাসের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে অর্জিত জ্ঞানের কথা বাদ দিয়া জ্ঞান অর্জনের শক্তি সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

বুদ্ধিময় (intellectual) জীবনের ভিত্তি হইল কৌতূহল প্রবৃত্তি। ইহা ইতর প্রাণীর মধ্যে প্রাথমিক আকারে দেখা যায়। বুদ্ধির জন্য চাই সদা-জাগ্রত কৌতূহল। কিন্তু ইহাও কোন বিশেষ ধরণের হওয়া দরকার। পাড়াগাঁয়ে প্রতিবেশীরা সন্ধ্যার অন্ধকারে, পর্দার আড়ালে উঁকিঝুঁকি মারে যে কৌতূহলের বলে, তাহার বিশেষ কোন মূল্য নাই। খোসগল্প করার যে উৎসাহ, তাহাও জ্ঞানার্জনের বাসনা হইতে নয়, ইহা ঈর্ষা হইতে সঞ্জাত, কেহ অপরের গোপন গুণগুলির আলোচনা করিয়া খোসগল্পের আসর জমায় না, অপরের গুপ্ত দোষ সম্বন্ধে সরস বসালাপই হইল উপভোগের বিষয়। কাজেই অধিকাংশ খোসগল্পের মূলেই সত্য নাই, কিন্তু এগুলি সত্য কিনা তাহা যাচাই করিয়া

দেখার চেষ্টাও হয় না। ধর্মের সান্ত্বনার মত আমাদের প্রতিবেশীর দোষগুলি আমাদের কাছে এত মুখরোচক যে, সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখার কোন প্রয়োজন অনুভব করি না। পক্ষান্তরে প্রকৃত কৌতূহল জ্ঞানলাভের বাসনা দ্বারা অনুপ্রাণিত। একটি বিড়াল নূতন অপরিচিত কোন কক্ষে ছাড়িয়া দিলে ইহার আচরণে কৌতূহলের প্রকাশ দেখা যাইবে, ইহা তখন কক্ষের প্রতি কোণ এবং প্রতিটি আসবাব শুঁকিয়া দেখিবে। শিশুদের মধ্যেও ইহা দেখা যাইবে, কোন বন্ধ ড্রয়ার বা কাপবোর্ড তাহাদিগকে দেখাইবার জন্য খুলিলে তাহারা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত দেখিতে ঝুঁকিয়া পড়িবে। জীবজন্তু, কলকব্জা,—বজ্রাবিদ্যুৎ, বিভিন্ন রকম হাতের কাজ শিশুদের কৌতূহল জাগ্রত করে। নূতন জিনিস জানিবার আগ্রহ তাহাদের এত বেশী যে, অধিকাংশ বয়স্ক ব্যক্তিকেই লজ্জায় পড়িতে হয়। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃত্তি ক্রমে কমিয়া আসে, অবশেষে এমন হয় যে, অজ্ঞাত বা অপরিচিত কোন জিনিস দেখিয়া সে সম্বন্ধে কিছুই জানিতে ইচ্ছা হয় না। এমন কি অপরিচিত জিনিস মাত্রই বিরক্তি উৎপাদন করে। এই অবস্থায় পৌঁছিলে লোকে বলে, 'দেশটা জাহান্নামে যাইতেছে, আর বলে 'আমাদের ছোট বয়সে যেমন ছিল দিনকাল আর এখন তেমন নেই। যে জিনিসটি অতীতে যাহা ছিল, এখন তাহা নাই, তাহা হইল বক্তার কৌতূহল। কৌতূহলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, সক্রিয় বুদ্ধিরও মৃত্যু ঘটিয়াছে।

বাল্যকালের পর কৌতূহলের তীব্রতা ও পরিমাণ কমিয়া আসে বটে কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত ইহার উৎকর্ষ বাড়িতে পারে। কোন নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে কৌতূহল অপেক্ষা সাধারণ বিষয় সম্বন্ধে কৌতূহল উচ্চতর স্তরের বুদ্ধির পরিচয় দেয়, মোটামুটিভাবে বলা যায়, কৌতূহল উদ্রেককারী বিষয়বস্তু যত বেশী ব্যাপক হইবে ততই তাহা হইবে উচ্চতর বুদ্ধির পরিচায়ক। (তবে সকল ক্ষেত্রে এই সূত্রটিকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করিয়া বুদ্ধির স্তর নির্ণয় করা হইবে না।) যাহার সঙ্গে ব্যক্তিগত সুবিধা, যেমন খাবার সংগ্রহ করা, জড়িত নাই এমন বিষয়ের প্রতি কৌতূহল এই প্রবৃত্তিটির উৎকর্ষের নিদর্শন। যে-বিড়ালটি নূতন কক্ষের কোণে কোণে ঘ্রাণ লইয়া বেড়ায় তাহাকে নিছক বৈজ্ঞানিক গবেষক মনে করিলে চলিবে না, সে হয়ত ইঁদুরের সন্ধান পাওয়া যাইবে কিনা তাহারই খোঁজ করিতেছে,—স্বার্থসম্পর্কবিহীন হইলেই যে কৌতূহল সর্বশ্রেষ্ঠ হইল তাহা বলা ঠিক হইবে না, বরং যখন অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ সাক্ষাৎ বা সুস্পষ্ট নয় কিন্তু বুদ্ধিপ্রয়োগ করিয়া অধিকার

করা যায় তখন সে কৌতূহলকে অতি উচ্চস্তরের বলা যায়। যাহা হউক, এ বিষয় নির্ধারণ করা এখন আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

কৌতূহল ফলপ্রদ হইতে হইলে জ্ঞান অর্জনের কতকগুলি কৌশল ইহার সহিত সংযুক্ত হওয়া উচিত। পর্যবেক্ষণের অভ্যাস, জ্ঞানের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাস, ধৈর্য এবং পরিশ্রম একান্ত আবশ্যক। যদি আসল জিনিস অর্থাৎ কৌতূহল থাকে এবং তাহার সঙ্গে থাকে উপযুক্ত জ্ঞানাত্মক শিক্ষা তবে এ অভ্যাসগুলি আপনা আপনি বিকাশ লাভ করিবে। কিন্তু সারাদিনমান আমরা যে কাজকর্মে লিপ্ত থাকি, জ্ঞানাত্মক কাজ তাহার একটি অংশ মাত্র এবং নানা প্রবৃত্তির সঙ্গে কৌতূহলের অবিরত সংঘর্ষ হইতেছে; সেজন্য বুদ্ধিকে সজাগ রাখিয়া ঠিক পথে চালিত করার জন্য কতকগুলি জ্ঞানমূলক গুণের প্রয়োজন যেমন খোলা-মন সবকিছুকেই নিরপেক্ষভাবে যুক্তিদ্বারা যাচাই করিয়া দেখিবার অভ্যাস। আমাদের অভ্যাস এবং মনোবাসনা নূতন সত্যকে গ্রহণ করিতে স্বভাবতই নারাজ হয়। যাহা অনেক বছর ধরিয়া আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি—যাহা আমাদের আত্মসম্মান বা অন্য প্রধান প্রবৃত্তিগুলির পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া আসিতেছে তাহা অবিশ্বাস করা কঠিন সন্দেহ নাই। কাজেই খোলা সতেজ মন গঠন করা শিক্ষার একটি কাম্য গুণ হওয়া উচিত।

বুদ্ধির সততা এবং দৈহিক শৌর্য প্রদর্শনের জন্য সাহসের একান্ত প্রয়োজন। এই বাস্তব জগতের যতখানি আমরা জানি বলিয়া মনে করি প্রকৃতপক্ষে জানি তাহার চেয়ে অনেক কম, জীবনের প্রথমদিন হইতে আমরা নানারূপ বাস্তব অবাস্তব সিদ্ধান্ত এবং অনুমান প্রয়োগ করিতে থাকি এবং প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে আমাদের মানসিক অভ্যাসগুলিকে তাল পাকাইয়া ফেলি। নানারকম বুদ্ধি পরিচালিত প্রতিষ্ঠান, যেমন খৃষ্টধর্ম, সাম্যবাদ, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি, অনাথ আশ্রমের মত সকলকে দাসত্বের বিনিময়ে নিরাপত্তা দিতে প্রস্তুত। কোন নীতিকে আশ্রয় করিলে জীবন নিরাপদ এবং আরামদায়ক হইতে পারে; কিন্তু স্বাধীনমনা ব্যক্তি. যিনি দলে বা গোষ্ঠীতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মিশাইয়া দেন নাই, এরূপ আরামের জীবন লাভ করিতে পারেন না; বাহিরে যখন শীতের প্রবল ঝটিকা গর্জন করিয়া ফেরে কোন একটি নীতিই কেবল মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় দান করিতে পারে।

এই প্রসঙ্গে একটি কঠিন প্রশ্ন উঠে; ভাল জীবনকে এইরূপে নীতি বা দল হইতে কতখানি মুক্ত করা উচিত? আমি দলপ্রবৃত্তি বা যূথপ্রবৃত্তি (herd instinct) কথাটি প্রয়োগ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছি, কেননা ইহার সত্যতা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ অভিমত আছে,—কিন্তু যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হউক, এই

প্রবৃত্তির স্বরূপ যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার সহিত সকলেই পরিচিত। যে দলের সহিত আমরা সহযোগিতা করিতে চাই, তাহার সঙ্গে মিলিত হইতে আমরা পছন্দ করি—যেমন—আমাদের পরিবার পরিজন, আমাদের প্রতিবেশী আমাদের সহকর্মী, আমাদের রাজনৈতিক দল, কিম্বা আমাদের জাতি। এরূপ মিলনের বাসনা স্বাভাবিক, কেননা সহযোগিতা ভিন্ন আমরা জীবনের কোন আনন্দই উপভোগ করিতে পারি না। অধিকন্তু প্রক্ষোভ (emotion) বা মানসিক ভাবাবেগ ছোঁয়াচে, বিশেষ করিয়া অনেক লোক একত্র হইয়া যখন ইহা অনুভব করে। একটি উত্তেজনাপূর্ণ জনসভায় উপস্থিত থাকিয়া খুব কম লোকই উত্তেজিত না হইয়া থাকিতে পারে। তাহারা যদি বিরুদ্ধদলীয় হয়, তাহাদের বিরোধের ভাব প্রবল হইয়া উঠে।

বেশীরভাগ লোকের পক্ষে এরূপ বিরোধিতা কেবল তখনই সম্ভবপর যখন তাহারা বুঝিতে পারে যে, অন্যত্র ভিন্ন জনতার মধ্যেও তাহারা তাহাদের কাজের জন্য প্রশংসালাভ করিবে। এই জন্যই ঋষিদের মিলন (Communion of Saints) অত্যাচারিতদের মনে সান্ত্বনা দিতে পারিয়াছে। আমরা কি জনতার সঙ্গে সহযোগিতার বাসনা মানিয়া লইব, না আমাদের শিক্ষা ইহা শিথিল করিতে চেষ্টা করিবে? ইহার দুই পক্ষেই যুক্তি আছে, কোন এক পক্ষের সম্পূর্ণ অনুকূলে অভিমত না দিয়া ইহার সঠিক উত্তর হইবে দুই পক্ষের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত পরিমাণ নির্ণয়ে, কোন এক পক্ষের সম্পূর্ণ অনুকূলে যে অভিমত তাহার মধ্যে নয়।

আমার নিজের মনে হয় সকলেরই অন্যকে খুশী করার ও অন্যের সঙ্গে সহযোগিতা করার বাসনা প্রবল এবং স্বাভাবিক কিন্তু এমন হওয়া চাই যেন কোন বিশেষ জরুরী ক্ষেত্রে অন্য বাসনা দ্বারা ইহাকে দমন করা যায়। অনুভূতিশীলতা আলোচনার সময় আমরা অন্যকে খুশী করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। ইহা না থাকিতে দিলে আমরা সকলেই হইতাম অসভ্য বর্বর এবং পরিবার হইতে উপরের দিকে কোন সামাজিক দল গঠনই সম্ভবপর হইত না। শিশুরা যদি তাহাদের পিতামাতার প্রশংসা কামনা না করিত তবে তাহাদিগকে শিক্ষাদান করার অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হইত। প্রক্ষোভ যে একজন হইতে অন্য জনের মধ্যে সংক্রামিত হয় তাহারও উপকারিতা আছে, বিশেষ করিয়া ইহা যখন বিজ্ঞ লোক হইতে অজ্ঞ লোকের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু ভয় বা রাগ যদি ব্যাপকভাবে বহু লোকের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তাহার ফল হয় ঠিক বিপরীত। কাজেই দেখা যায় প্রক্ষোভ সংক্রামনের অর্থাৎ এক ব্যক্তি হইতে অন্যের মধ্যে প্রক্ষোভ বা ভাব সঞ্চারের প্রশ্নটি কোন মতেই সহজ নয়। যেখানে

শুধু বুদ্ধিগত ব্যাপার সেখানেও বিষয়টি সুস্পষ্ট নহে। বড় বড় আবিষ্কারক-দিগকে তাঁহাদের মননশক্তি ও বুদ্ধির স্বাধীনতার জন্য দলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কলম্বসের কথা। স্থির বুদ্ধি ও ও দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি নূতন মহাদেশের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সঙ্গীদের নিজেদের বুদ্ধি ও আত্মবিশ্বাসের উপর বিশেষ আস্থা ছিল না। নিজেদের প্রাণের ভয়ে তাহারা কলম্বসের অভিযানে বাধা সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

সাধারণ মানুষ যদি অন্যের মতামত গ্রহণ না করিয়া সর্বদা কেবল নিজের অভিমতই প্রকাশ করিত তবে তাহার দরুণ সে অজ্ঞতার পরিচয় দিত; বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্ততঃ তাহারা যে বৈজ্ঞানিকদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তাহা কল্যাণকর হইয়াছে।

আমার মনে হয়, অতি অসাধারণ লোকের কথা বাদ দিলে সাধারণ মানুষের জীবনের দুইটি ক্ষেত্র আছে, একটি বড় ক্ষেত্র, সেখানে যূথপ্রবৃত্তি বা দলের সঙ্গে মিশিয়া, সহযোগিতা করিয়া দলের ভারগ্রহণ করিয়া চলিবার বাসনা প্রবল; অন্যটি ছোট ক্ষেত্র, যেখানে যূথপ্রবৃত্তি প্রবেশ করে না। এই ছোট ক্ষেত্রটি তাহার নিজের বিচারবুদ্ধির স্থান। যে ব্যক্তি আর অন্যান্য সকলে প্রশংসা না করা পর্যন্ত কোন স্ত্রীলোককে প্রশংসা করিতে পারে না তাহার ব্যক্তিগত অভিমত সম্বন্ধে কেহই উচ্চ ধারণা পোষণ করে না। আমরা মনে করি পত্নী নির্বাচনের ব্যাপারে যে-কোন লোকের পক্ষে সমাজের আর সকলে কি বলিবে সে চিন্তা না করিয়া নিজের স্বাধীন অনুভূতি ও বিচারবুদ্ধি দ্বারা চালিত হওয়া উচিত। তাহার প্রতিবেশীদের অভিমতের সঙ্গে তাহার মতের মিল হইবে কিনা সেটা কর্তব্যের মধ্যে নয়; সে যদি কোন মেয়েকে ভালবাসে তবে তাহার পথে নিজের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও ভালবাসার অনুভূতি দ্বারা পরিচালিত হওয়াই উচিত।

ইহার বিপরীত দিকেও অনুরূপ কথা বলা চলে। চাষী যে জমি চাষ করে তাহার গুণাগুণ ও উৎপাদন ক্ষমতা সম্বন্ধে সে নিজের অভিমত অনুযায়ী কাজ করিবে, যদিও চাষ-আবাদের বৈজ্ঞানিক প্রণালী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়ার পরেই সে নিজের অভিমত গঠন করিতে পারিবে। অর্থনীতিক প্রচলিত মুদ্রা সংক্রান্ত প্রশ্নে নিজের স্বাধীন অভিমত গঠন করিবেন, কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে ঐরূপ জটিল ব্যাপারের মধ্যে মাথা না ঘামাইয়া বিশেষজ্ঞের অভিমত মানিয়া চলাই কর্তব্য। যেখানেই বিশেষ জ্ঞান, গবেষণা ও বিচার-বুদ্ধি প্রযোজিত হয় সেখানেই অভিমতের স্বাধীনতা মানিয়া চলা উচিত।

কিন্তু তাই বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অত্যুগ্র মতের কণ্টকে নিজেদের আবৃত' রাখিয়া জনসাধারণকে দূরে সরাইয়া রাখিলে বিশেষ কোন উপকার হইবে না। আমাদের বেশীরভাগ কাজই সহযোগিতামূলক হওয়া উচিত এবং প্রবৃত্তির উপর ভিত্তি করিয়াই সহযোগিতা গড়িয়া তোলা কর্তব্য। তবু যে-সব বিষয় আমাদের ভাল রকম আছে সে সম্বন্ধে নিজেদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা থাকা চাই এবং প্রয়োজন হইলে অন্যের পক্ষে অপ্রিয় হইলেও স্বাধীন অভিমত প্রকাশ করবার সৎসাহস থাকা বাঞ্ছনীয়। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এই সাধারণ নীতি প্রয়োগ করিতে হয়তো অসুবিধা হইতে পারে। কিন্তু আমরা যে-সব গুণের কথা আলোচনা করিতেছি তাহা যখন বেশীরভাগ লোকের মধ্যে দেখা যাইবে তখন ইহা প্রয়োগ করিতে এত বেশী কঠিন হইবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, এই রকম জগতে সাধু ব্যক্তির উপর অত্যাচার চলিবে না; প্রকৃত সৎলোকে আত্মাভিমানে গর্বিত হইয়া বিশ্বজন হইতে পৃথক থাকিবেন না; ভাবের আবেগ দ্বারা চালিত সৎস্বভাব সুখের কারণ হইয়া উঠিবে। তাঁহার প্রতিবেশীরা তাঁহাকে ঘৃণা করিবে না কারণ তাহারা তাঁহাকে ভয় করিবে না। অগ্রগামী ব্যক্তিগণ (Pioneers) অপরের ভয় উৎপাদন করেন বলিয়াই তাহাদের ঘৃণার পাত্র হইয়া থাকেন; কিন্তু যাহারা সাহসী হইতে শিখিয়াছে তাহাদের মধ্যে এরূপ ভয় থাকিবে না। ভয়ে অভিভূত হইয়া লোকে কু ক্লাক্স ক্লান (Ku Klux Klan) কিম্বা ফ্যাসিস্তি (Fascisti) দলে যোগদান করে। সাহসী লোকপূর্ণ জগতে এরূপ অত্যাচারী সংঘের অস্তিত্বই থাকিবে না, এবং সে-যুগের সৎ-লোকেরা প্রবৃত্তিগুলিকে এ যুগের মত এমনভাবে বাধাও দিবে না। কেবল নির্ভীক লোকেরাই এরূপ সুখের জগত সৃষ্টি করিতে এবং চালু রাখিতে পারে; তবে যতই তাহারা এ কাজে সফল হইবে ততই তাহাদের সাহস প্রয়োগের প্রয়োজন কমিয়া আসিবে।

শিক্ষার ফলে যদি উদ্যম, সাহস, অনুভূতিশীলতা এবং বুদ্ধি নরনারীর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয় তবে এমন এক সমাজ গড়িয়া উঠিবে যেরূপ মানবগোষ্ঠী কোনকালে ছিল না। খুব কম লোকই তখন অসুখী হইবে। বর্তমানে সুখী না হইবার প্রধান কারণ হইল: স্বাস্থ্যহীনতা, দারিদ্র্য এবং অসন্তোষজনক যৌনজীবন। এ সকলই তখন হইবে অত্যন্ত বিরল। প্রায় সকলেই তখন পূর্ণ স্বাস্থ্যের অধিকারী হইবে। এমন কি বার্ধক্যও বিলম্বে আসিবে। শিল্প-বিপ্লবের পর হইতেই দারিদ্র্যের একমাত্র কারণ হইয়াছে বহু লোকের সমবেত মূর্খতা। অনুভূতিশীল লোকের মধ্যে ইহা বিলোপ করার বাসনা জাগাইয়া তুলিবে, 'বুদ্ধি' দেখাইবে কি উপায়ে ইহা সম্ভব এবং

'সাহস' সে উপায় গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করিবে। (ভীরু ব্যক্তি অস্বাভাবিক কিছু করার পরিবর্তে বরং দুঃখদুর্দশার মধ্যেই থাকিতে পছন্দ করিবে।) বর্তমানে অধিকাংশ লোকের যৌনজীবন কমবেশী রকমের অসন্তোষজনক। ইহার জন্য অংশত দায়ী কুশিক্ষা, অংশত দায়ী ভব্যতার বাঁধাধরা সংস্কার এবং কর্তৃপক্ষের অত্যাচার। অবাস্তব যৌনভীতি হইতে মুক্ত এক জনি (Generation) স্ত্রীলোক এই অবস্থার অবসান ঘটাইবে। ভয় স্ত্রীলোকের পক্ষে গুণ বলিয়া ধরা হইয়াছে এবং চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে দেহে-মনে ভীরু করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে। যে সব স্ত্রীলোকের প্রেম স্বাভাবিকভাবে আত্মপ্রকাশের পথ পায় না, তাহারা তাহাদের স্বামীদের নিষ্ঠুরতা ও ভণ্ডামিতে উৎসাহ দেয় এবং তাহাদের সন্তানসন্ততির প্রবৃত্তিগুলি বিকৃত করিয়া তোলে। একজনি নির্ভীক স্ত্রীলোক নির্ভীক, সবল, উদার, স্নেহশীল এবং স্বাধীন সন্তানের জন্ম দিয়া বিশ্বের রূপই বদলাইয়া দিতে পারে। আমরা অলস, ভীরু হৃদয়হীন এবং মূর্খ বলিয়া যে-সব নিষ্ঠুরতা এবং দুঃখ সহ্য করি, তাহাদের অন্তরের অনুরাগ ও উদ্যম সেগুলি নির্মূল করিয়া দূর করিয়া দিবে। শিক্ষা হইতে আমরা এই দোষগুলি পাই, আবার একমাত্র শিক্ষাই ইহার বিপরীত গুণগুলির বিকাশ ঘটাইতে পারে। শিক্ষাই নূতন জগতের চাবিকাঠি।

সাধারণ-নীতির আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া যে-উপায়ে আমাদের আদর্শগুলি বাস্তব রূপ গ্রহণ করিতে পারে তাহার বস্তুনিষ্ঠ এবং বিস্তারিত আলোচনা আরম্ভ করা যাক।

তৃতীয় অধ্যায়

চরিত্রের শিক্ষা

প্রথম বৎসর

পূর্বে শিশুর জীবনের প্রথম বৎসরকে শিক্ষার আওতার বাহিরে ধরা হইত। যতদিন শিশু কথা বলিতে না শেখে ততদিন তাহাকে জননীর বা ধাত্রীর সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে রাখা হইত, মনে করা হইত শিশুর পক্ষে কি মঙ্গলজনক তাহা ইঁহারা নিজেদের প্রবৃত্তি হইতেই জানেন। প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা কিছুই জানিতেন না। জীবনের প্রথম বৎসরেই বহু শিশু মারা যাইত, যাহারা বাঁচিয়া থাকিত তাহাদের মধ্যেও অনেকে স্বাস্থ্যহীন হইয়া উঠিত, লালন-পালনের দোষে বহু খারাপ অভ্যাস গঠিত হইত। সম্প্রতি এ সকল বিষয় জানা গিয়াছে। শিশু পালনাগারে যদি বিজ্ঞান প্রবেশ করে তবে অনেকে রুষ্ট হন। কেননা তাঁহাদের ধারণা শিশুর মঙ্গলের সম্পূর্ণ ভার মায়ের হাতে, শিশুর জীবনে মায়ের কথঞ্চিৎ স্থান যে বিজ্ঞান গ্রহণ করিবে তাহা তাঁহারা বরদাস্ত করিতে চান না। কিন্তু ভাবপ্রবণতা এবং বাৎসল্যপ্রীতি এক সঙ্গে থাকিতে পারে না। যে জনক বা জননী নিজ সন্তানকে ভালবাসেন তিনি চান যে তাঁহার সন্তান বাঁচিয়া থাকুক, দরকার হইলে এজন্য বুদ্ধি প্রয়োগ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত নন। কাজেই নিঃসন্তান লোকের মধ্যে এবং রুশোর মত যাঁহারা নিজেদের সন্তান-দিগকে অনাথ আশ্রমে প্রতিপালনের পক্ষপাতী তাহাদের মধ্যেই এই ভাব-প্রবণতা প্রবল হইতে দেখা যায়। শিশুর পালন ব্যাপারে বিজ্ঞান কি বলে বেশীরভাগ শিক্ষিত জনক জননী তাহা জানিতে ইচ্ছুক; অশিক্ষিত পিতা-মাতাও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র হইতে ইহা জানিয়া লয়। ইহাতে যে সুফল ফলিয়াছে তাহা শিশু মৃত্যুর সংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পাওয়া হইতেই বোঝা যায়। ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, যথোপযুক্ত যত্ন ও নিপুণতা প্রয়োগ করিলে অতি অল্প শিশুই আঁতুরে মারা যাইবে। কেবল খুব অল্পই যে মরিবে তাহা নহে, যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে তাহারা দেহে এবং মনে অধিকতর স্বাস্থ্যের অধিকারী হইবে।

শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্যের প্রশ্ন (সমস্যা) এ পুস্তকের আলোচ্য নয়; ইহা চিকিৎসকদের হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। যেখানে ইহা মনোবিজ্ঞানের সহিত জড়িত সেখানেই কেবল ইহার উল্লেখ করিব। কিন্তু জীবনের প্রথম

বছরে কোনটি মানসিক, কোনটি দৈহিক সমস্যা তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। অধিকন্তু শিশুর দেহের দিকে কোন লক্ষ্য না রাখিলে কয়েক বছর পরে শিশুর দৈহিক সমস্যা শিক্ষকের প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব মনোবিকাশ প্রসঙ্গ হইলেও মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে শিশুর দৈহিক প্রশ্ন লইয়াও আলোচনা করিতে হইবে।

সদ্যঃপ্রসূত শিশু কতকগুলি প্রতিবর্তী (reflex) স্বভাব এবং প্রবৃত্তি লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, প্রথমে ইহার অভ্যাস বলিয়া কিছু থাকে না। মাতৃগর্ভে থাকিবার সময় সে যাহা অভ্যাস করিয়াছিল তাহা নূতন পরিবেশে কোনই কাজে আসে না। এমন কি শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়াও অনেক সময় শিখাইতে হয় এবং কতক শিশু এই অভ্যাস তাড়াতাড়ি শিখিতে পারেনা বলিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় একটি প্রবৃত্তি বেশ পুষ্ট (developed) দেখা যায়, তাহা হইল চুষিবার প্রবৃত্তি। শিশু যখন কিছু চুষিতে শুরু করে তখন এই নূতন পরিবেশেও অস্বস্তি বোধ করে না। কিন্তু জাগ্রত অবস্থার অল্প সময়টুকু তাহার কাছে ফাঁকা, বিস্ময়কর মনে হয়, চব্বিশ ঘণ্টার অধিকাংশ সময় ঘুমাইয়া কাটাইলে সে এই অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় আরামবোধ করে। এক পক্ষ পরে কিন্তু এই স্বভাব পরিবর্তন ঘটে। এই সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট ভাবে বারবার অভিজ্ঞতা লাভের পর কিছু পাওয়ার বাসনা তাহার মনে দানা বাঁধিয়া উঠে। শিশু অভ্যাসে রক্ষণশীল, কোন নূতনত্ব সে পছন্দ করে না। সে যদি কথা বলিতে পারিত তবে সে বলিত: 'তুমি কি মনে কর, আমার জীবনকালের অভ্যাস আমি ছাড়িয়া দিব?' যেরূপ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শিশু অভ্যাস আয়ত্ত করে তা বিস্ময়কর। প্রত্যেকটি কু-অভ্যাস পরবর্তীকালে সদভ্যাসগুলির প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়, এ জন্যই অতিশৈশবে প্রথম অভ্যাস গঠনের গুরুত্ব এত বেশী। প্রথম অভ্যাসগুলি যদি ভাল হয় তবে পরে অশেষ ঝামেলার হাত হইতে রেহাই পাওয়া যায়। অধিকন্তু শৈশবে কোন অভ্যাস আয়ত্ত হইলে তাহাকে পরে প্রবৃত্তি বলিয়া মনে হয় এবং প্রবৃত্তির মতই ইহা স্থায়ী ও দৃঢ়মূল হইয়া উঠে। পরবর্তীকালে ইহার বিপরীত অভ্যাস গঠিত হইলে তাহা প্রথম গঠিত অভ্যাসের মত দৃঢ় হয় না। এজন্যও প্রথম অভ্যাস গঠনের উপর খুবই গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

শৈশবে অভ্যাস গঠনের বিষয় আলোচনা করিবার সময় দুইটি বিষয়ের কথা উঠে: প্রথম এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় হইল স্বাস্থ্য, দ্বিতীয়, চরিত্র। আমরা চাই শিশু যেন সকলের প্রিয় হয় এবং জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে সমর্থ হয়। সৌভাগ্যক্রমে স্বাস্থ্য এবং চরিত্র এ উভয়েরই লক্ষ্য ইহাই, একটির পক্ষে যাহা

শুভংকর অন্যটির পক্ষেও তাহা কল্যাণকর। এই পুস্তকে আমরা চরিত্র সম্বন্ধেই বিশেষভাবে বিবেচনা করব, কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্যও অনুরূপ অভ্যাস এবং প্রক্রিয়া দরকার। কাজেই আমাদিগকে স্বাস্থ্যবান শয়তান ও রুগ্ন ঋষির মধ্যে একজনকে বাছিয়া লইবার কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে না।

শিশু যখন চিৎকার করে তখনই না খাওয়াইয়া নিয়মিত সময় অন্তর খাওয়ানর উপকারিতা আজকাল প্রত্যেক শিক্ষিতা মাতাই জানেন। এ রীতি প্রচলিত হইয়াছে এইজন্য যে, ইহা শিশুর হজম ক্রিয়ার পক্ষে উপকারী, এ কারণই নিয়মিত খাবার দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু নৈতিক শিক্ষার পক্ষেও ইহা বাঞ্ছনীয়। বয়স্ক বা গুরুরা যতখানি মনে করেন শিশুরা তাহার চেয়ে অনেক বেশী চতুর, যদি তাহারা দেখে যে, চিৎকার করিলেই আরামদায়ক কিছু পাওয়া যায় তবে তাহারা চিৎকার করিবেই। পরবর্তীকালে সবকিছু লইয়াই খুঁত খুঁত করার বা আব্দার করার অভ্যাসের ফলে যখন তাহারা অপরের নিকট অপ্রিয় হয় এবং নিজেদের ঈপ্সিত জিনিস পায় না, তখন তাহারা রুষ্ট ও বিস্মিত হয়, জগত তাহাদের নিকট উদাসীন এবং সহানুভূতিহীন বলিয়া মনে হয়। তাহারা আদর পাইবে এবং ইহার ফলে শৈশবে যে কুশিক্ষা পাইয়াছিল তাহাই দৃঢ়তর হইবে। ধনীলোকের বেলাতেও ইহা সত্য। শৈশবে যদি উপযুক্ত শিক্ষা না পায় তবে পরবর্তীকালে তাহারা (নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী) মনোবাসনা পূর্ণ না হওয়ায় হয় অসন্তুষ্ট হইবে, আর না হয় হইবে স্বার্থপর অত্যাচারী। যে মুহূর্তে শিশুর জন্ম হয় তখনি নৈতিক শিক্ষাদান আরম্ভ করার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় কেননা তখন তাহার কোন বাসনা গঠিত হয় নাই, কাজেই তখন এ শিক্ষা দিতে গিয়া তাহার কোন বাসনাকে খর্ব করিতেও হইবে না। পরবর্তীকালে এ শিক্ষা দিতে গেলেই কতকগুলি অভ্যাসের বিরুদ্ধে ইহা প্রয়োগ করিতে হইবে এবং স্বভাবতই ইহা শিশুর ক্রোধের উদ্রেক করে।

শিশুর সঙ্গে ব্যবহারে অবহেলা ও আদর এই দুইটির মধ্যে সমতা রাখা দরকার। তাহার স্বাস্থ্যের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা অবশ্যই করিতে হইবে, ঠাণ্ডা বাতাসে থাকিলে তাহাকে তুলিয়া শুকনা গরম জায়গায় রাখিতে হইবে। কিন্তু কাঁদিবার পক্ষে যথেষ্ট কোন দৈহিক কারণ না থাকা সত্ত্বেও যদি সে কাঁদিতে থাকে, তাহাকে কাঁদিতেই দিতে হইবে, তাহা না হইলে অল্পদিনের মধ্যেই সে স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিবে। তাহাকে পরিচর্য্যা করিবার সময় অযথা হৈ-চৈ বা অত্যধিক আদর ও প্রীতি দেখাইবার কোন প্রয়োজন নাই। কোন বয়সেই শিশুকে অতিরিক্ত মাত্রায় আদর আপ্যায়ন দেখানো উচিত নয়। প্রথম হইতেই তাহাকে একজন ভাবী বয়স্ক ব্যক্তিরূপে দেখিতে হইবে। বয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে যে অভ্যাস

অসহনীয় মনে হয়, শিশুর মধ্যেই তাহাই প্রীতিকর বোধ হইতে পারে। অবশ্য শিশু যথার্থ বয়স্ক ব্যক্তির অভ্যাস গঠন করিতে পারে না, তবে এরূপ অভ্যাস গঠনে যাহা যাহা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে পারে তাহা এড়াইয়া যাওয়াই উচিত। সর্বোপরি কখনই শিশুর মনে আত্ম-প্রাধান্যের ভাব জন্মিতে দেওয়া ঠিক হইবে না, কেননা এই ভাব গড়িয়া উঠিলে পরবর্তী বয়সে সে যখন অন্য সকলের নিকট হইতে বিশেষ আপ্যায়ন পাইবে না, তখন তাহার মনে আঘাত লাগিবে।

শিশুকে শিক্ষা দিবার সময় পিতামাতার পক্ষে সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার হইল আদর ও অনাদরের মধ্যে সূক্ষ্ম সমতা রাখিয়া আচরণ করা। শিশুর যাহাতে কোনপ্রকার স্বাস্থ্যহানি না ঘটে সেজন্য সদাজাগ্রত সতর্কতা এবং যত্ন দরকার। সন্তানের প্রতি মমতা অত্যধিক না হইলে এগুলি প্রায়ই দেখা যায় না। কিন্তু যেখানে এইরূপ সতর্কতা ও যত্ন পরিচর্যা আছে সেখানে হয়ত বিশেষ বিজ্ঞতার সঙ্গে এগুলি প্রয়োগ করা হয় না। স্নেহশীল পিতামাতার কাছে সন্তান একটি মহাসামগ্রী। পিতামাতা যদি সন্তানের প্রতি আচরণে বিশেষ সংযত না হন তবে শিশু ইহা বুঝিতে পারে এবং নিজেকে মহামূল্যবান মনে করিয়া নিজের সম্বন্ধে কাল্পনিক উচ্চ ধারণা গড়িয়া তোলে। পরবর্তীকালে সামজিক পরিবেশে সে তো পিতামাতার কাছে যেরূপ পাইয়াছে সেরূপ আদর যত্ন পাইবে না; পিতামাতার অহেতুক স্নেহের আতিশয্য তাহার মনে যে ধারণা সৃষ্টি করিয়াছিল যে সে সকলের আদরের মধ্যমণি তাহা অবশেষে তাহাকে নিরাশ করিবে। কাজেই পিতামাতার কর্তব্য হইল শুধু শিশুর প্রথম বৎসর নয়, পরেও সন্তানের কোন অসুখ বিসুক হইলে উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করিয়া স্বাভাবিক-ভাবে প্রফুল্লতার সঙ্গেই তাহা গ্রহণ করা উচিত। আগের দিনে শিশুর অসুখ হইলেই তাহাকে অন্য সকলের কাছ হইতে পৃথক করিয়া, জামাকাপড় দিয়া আষ্টেপিষ্ঠে জড়াইয়া বিছানায় শোওয়াইয়া রাখা হইত, কিংবা কোলে করিয়া অথবা দোলনায় রাখিয়া দোলানো হইত। তাহার স্বতঃস্ফূর্ত আচরণে বাধা পড়িত। সন্তান মানুষ করার এই পন্থা ছিল আগাগোড়া ভুলে ভরা। ইহা শিশুকে অসহায়, পরজীবী আদুরে গোপালে পরিণত করিত। যথার্থ নিয়ম হইল: শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত কাজে উৎসাহ দিন, কিন্তু অন্যের উপর দাবী করিলে তখন তাহাকে থামান। আপনি শিশুর জন্য কতখানি করেন বা কি পরিমাণ কষ্ট করেন তাহা শিশুকে দেখিতে দিবেন না। যেখানে সম্ভব সেখানে শিশু বয়স্ক ব্যক্তির উপর জুলুম করিয়া নয়, নিজের চেষ্টাতেই সাফল্য লাভ করুক; ইহাতে সে আত্মতৃপ্তি লাভ করিবে। আধুনিক শিক্ষায় আমাদের উদ্দেশ্য হইল—বাহিরের শাসন ও শৃঙ্খলা যথাসম্ভব কমাইয়া দেওয়া। ইহার

জন্য ভিতর হইতে আত্মশৃঙ্খলা জাগানো দরকার। এই আত্মশৃঙ্খলা শিশুর প্রথম বছরে আয়ত্ত করানো যেমন সহজ তেমন কোন সময়ে নয়। উদাহরণ দিয়া বলি শিশুকে যখন ঘুম পাড়াইতে চান তখন ইহাকে দোলনায় রাখিয়া দোলান বা কোলে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবার দরকার নাই, এমন কি আপনি যেখানে থাকিলে সে শুইয়া থাকিয়া আপনাকে দেখিতে পাইবে এমন জায়গাতেও থাকিবেন না। কিন্তু আপনি যদি সোহাগ দেখাইয়া কোলে করিয়া ঘোরেন কিংবা আরামদায়ক দোল দেন, তবে পরে ঘুম পাড়াইতে চাহিলেও আপনাকে আবার ঐরূপ করিতে হইবে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে বুঝিবেন শিশুকে ঘুম পাড়ানো কি ঝকমারী কাজ। আপনি বরং উহাকে শুকনা জামা পরাইয়া, শুকনা বিছানায় শোওয়াইয়া দিন, তারপর শান্তস্বরে কয়েকটি মন্তব্য করিয়া চলিয়া আসুন। কয়েক মিনিট সে কাঁদিতে পারে কিন্তু যদি কোনরূপ অসুখ না থাকে তবে সে খানিক পরেই থামিবে। তখন যদি দেখিতে যান, দেখিতে পাইবেন শিশু গভীর ঘুমে মগ্ন রহিয়াছে। কোলে করিয়া ঘোরা বা আদর করিয়া চাপড়ানোর চেয়ে এই প্রক্রিয়ায় শিশু অনেক বেশী ঘুমাইবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে সদ্যঃপ্রসূত শিশুর কোন অভ্যাস থাকে না, থাকে কেবল কতকগুলি প্রতিবর্তী এবং প্রবৃত্তি। ইহা অনুমান করা যায় যে, তাহার জগৎ কোনরূপ 'বস্তু' দ্বারা গঠিত নয়। কোন জিনিস চিনিতে হইলে বারংবার একই প্রকার অভিজ্ঞতা দরকার, কোন জিনিষ সম্বন্ধে ধারণা জন্মিবার পূর্বে তাহা নিশ্চয়ই চিনিতে হইবে। শিশুর কাছে তাহার খাটের স্পর্শ, তাহার মায়ের স্তন বা দুধের বোতলের গন্ধ ও স্পর্শ এবং তাহার মায়ের কিংবা ধাত্রীর কণ্ঠস্বর অল্প সময়ের মধ্যে পরিচিত হইয়া ওঠে। তাহার মায়ের চেহারা বা খাটের আকৃতি সম্বন্ধে ধারণা পরে আসে, কেননা সদ্যোজাত শিশু কোন জিনিশ ভাল করিয়া দেখিবার মত চোখের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে না। ক্রমে সংস্পর্শের ফলে অভ্যাস গঠনের ভিতর দিয়া স্পর্শ, দৃষ্টি, ঘ্রাণ এবং শ্রবণ একত্র মিলিয়া কোন বিষয় সম্বন্ধে শিশুর ধারণা জন্মায় 'অর্থাৎ' স্পর্শ করিয়া, চোখ দিয়া দেখিয়া ঘ্রাণ লইয়া এবং শব্দ শুনিয়া শিশু কোন বস্তু সম্বন্ধে ধারণা গঠন করে, একটি চিনিলে আর একটি চিনিতে আগ্রহ জন্মে। তখনও কিছু সময়ের জন্য শিশুর কোন পদার্থ বা মানুষের মধ্যে পার্থক্য বোধ জন্মে না। যে শিশু কখনও মায়ের দুধ পান করে, কখনো বা বোতলভরা দুধ পান করে সে কিছুদিন পর্যন্ত তাহার মা এবং বোতলের প্রতি একই রকম ভাব পোষণ করিবে। এই সময়ে কেবল নিছক দৈহিক উপায়েই শিক্ষা দিতে হইবে। এ সময় শিশুর আনন্দ এবং কষ্ট সবই দৈহিক। খাবার পাইলে এবং কোমল

উষ্ণতা বোধ করিলে সে আনন্দিত হয়, দেহের ব্যথাতেই কষ্ট পায়। আনন্দের সহিত যাহা সংযুক্ত তাহা পাওয়ার জন্য আচরণের অভ্যাস এবং কষ্টের সঙ্গে যাহা সংযুক্ত তাহা পরিহার করার জন্য আচরণের অভ্যাস এই সময় গড়িয়া উঠে। শিশুর ক্রন্দন আংশিকভাবে প্রতিবর্তী মাত্র, দৈহিক কষ্ট পাইলেই স্বভাবতই সে কাঁদিয়া উঠে, আনন্দ পাওয়ার উপায় হিসাবেও কখনো কখনো শিশু কাঁদিয়া থাকে। প্রথম প্রথম অবশ্য কেবল কষ্ট অনুভব করিয়াই কাঁদে। শিশু যখন কষ্ট বা ব্যথা পাইয়া কাঁদিতে থাকে তখন কষ্টের কারণ দূর করিলেই সে আনন্দ পায়। এইভাবে কাঁদার সঙ্গে আনন্দের অনুভূতির যোগ সাধিত হয়। ইহার পরে শিশু দৈহিক কোনরকম ব্যথা বোধ না করিলেও আনন্দ কামনা করিয়া কাঁদিতে শুরু করে, ইহা তাহার বুদ্ধির জয়ের একটি প্রথম পরিচয়। কিন্তু যতই চেষ্টা করুক, প্রকৃত বেদনা বা কষ্ট বোধ করিলে যেভাবে চিৎকার দেয় সেরূপ চিৎকার কিন্তু তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় না। মায়ের কানে এ পার্থক্য ধরা পড়ে এবং তিনি যদি বুদ্ধিমতী হন তবে যে কান্না দৈহিক কষ্টের দ্যোতক নয় তাহা উপেক্ষাই করিবেন। শিশুকে কোলে করিয়া নাচাইয়া কিংবা ইহার কানের কাছে মিষ্টি স্বরে গান করিয়া আনন্দ দেওয়া সহজ এবং শিশুর কাছে তাহা আরামদায়ক। এরূপ পাইলে শিশু শীঘ্রই আরো বেশী বেশী আরাম দাবী করিবে এবং ইহা না হইলে ঘুমাইবে না, কিন্তু কেবল খাবার সময় ছাড়া সারা দিনমান শিশুর ঘুমাইয়া কাটান উচিত। এ উপদেশ কঠোর মনে হইতে পারে কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, ইহা শিশুর স্বাস্থ্য ও আনন্দের কারণই হইয়া থাকে।

বয়স্ক ব্যক্তিরা শিশুদিগকে আদর আহ্লাদ দিতে গিয়া যেন বাড়াবাড়ি না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, শিশুরা নিজেদেরই চেষ্টায় যে আনন্দ লাভ করিতে পারে তাহাতে বরং উৎসাহ দিতে হইবে। প্রথম হইতেই যাহাতে ইহারা হাত-পা ছুড়িয়া মাংসপেশীর সঞ্চালন করিতে পারে তাহার সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ এতদিন পর্যন্ত কেমন করিয়া শিশু-দিগকে গরম কাপড় দিয়া জড়াইয়া রাখিতেন ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহা দেখিয়া মনে হয় সন্তান-স্নেহ আলস্যকে জয় করিতে পারে নাই, কেননা হাত-পা মুক্ত থাকিলে শিশুর প্রতি বেশী সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। যখন শিশু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে তখন হইতেই সে চলমান জিনিস দেখিতে আনন্দ পায়, বিশেষ করিয়া হাওয়ায় কোন কিছু দুলিতে দেখিলে। কিন্তু যতদিন না শিশু যাহা দেখে তাহা ধরিতে পারে ততদিন ইহার আনন্দদানের জিনিস খুব বেশী থাকে না। তারপর অকস্মাৎ একটি নূতন আনন্দের সন্ধান

পায়—ইহা হইল কোন জিনিস ধরিবার আনন্দ। কিছুদিন শিশু জাগ্রত অবস্থার অনেকটা সময় কিছু ধরিয়া বা ধরিবার চেষ্টা করার আনন্দে অতিবাহিত করে। এই সময়ে সে ঝুমঝুমি হইতে আনন্দ পায়। ইহার কিছু আগে সে হাত পায়ের আঙুল জয় করিয়াছে। প্রথমে শিশুর পায়ের আঙুলগুলির যে সঞ্চালন তাহা সম্পূর্ণ প্রতিবর্তী, অর্থাৎ শিশু নিজে ইচ্ছা করিয়া চালায় না। আপনা-আপনি সঞ্চালিত হয়, পরে সে বুঝিতে পারে যে, ইহার সঞ্চালন তাহার আয়ত্তে। একজন সাম্রাজ্যবাদী কোন বিদেশ জয় করিলে যেরূপ আনন্দিত হন, হাত পায়ের উপর অধিকার লাভ করিয়া শিশুও সেইরূপ আনন্দ অনুভব করে। এগুলি তখন তাহার কাছে আর বাহিরের অঙ্গ নয়। তাহার নিজের অধিকারে, নিজদেহেরই অংশ। শিশুর পক্ষে উপযুক্ত জিনিস তাহার হাতের কাছে থাকিলে এই সময় হইতে সে অনেক প্রকারে আনন্দ লাভ করিতে পারে। এই ধরণের আনন্দ শিশুর শিক্ষার পক্ষে উপযোগী, অবশ্য দেখিতে হইবে সে যেন উল্টাইয়া না পড়ে, পিন গিলিয়া না ফেলে কিংবা অন্য প্রকারে আঘাত না পায়।

কেবল খাইবার সময় যে আনন্দ পায় তাহা ছাড়া শিশুর প্রথম তিন মাস মোটের উপর বড়ই নিরানন্দময়। আরাম বোধ করিলেই সে ঘুমাইবে। জাগিলেই কিছুটা অস্বস্তি। মনের শক্তির উপর মানুষের সুখ নির্ভর করে কিন্তু তিন মাসের কম বয়সের শিশুর মধ্যে ইহা দেখা দেয় না, তখন তাহার অভিজ্ঞতা হয় নাই, পেশীও ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। ইতর প্রাণীর বাচ্চাগুলি অল্প বয়স হইতেই জীবন উপভোগ করিতে শুরু করে কারণ তাহাদের অধিকাংশ আচরণই প্রকৃতি কর্তৃক চালিত, অভিজ্ঞতার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মানবশিশু প্রবৃত্তি চালিত হইয়া আনন্দদায়ক কাজ খুব কমই করিতে পারে। মোটের উপর শিশুর প্রথম তিন মাস কালকে অবসাদের কাল বলা যায়; কিন্তু অধিক সময় ঘুমাইবার জন্য এরূপ অবসাদেরই প্রয়োজন। শিশুকে বেশী আমোদ আহ্লাদ দিতে গেলে তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিবারই সম্ভাবনা।

শিশুর বয়স যখন দুই হইতে তিন মাস তখন সে হাসিতে শেখে এবং মানুষ ও জড়পদার্থের মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে পারে। এই সময় হইতে মায়ের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ গাড়িয়া উঠিতে থাকে, মাকে দেখিলে সে আনন্দ প্রকাশ করে এবং সাড়া দেয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহার মনে প্রশংসা ও অনুমোদন পাওয়ার বাসনা জাগিয়া উঠে। আমার নিজের ছেলের বয়স যখন পাঁচ মাস তখন এ বাসনার স্পষ্ট প্রকাশ দেখা গিয়াছে, কয়েকবার চেষ্টার পর সে টেবিলের উপর হইতে একটা ভারী ঘণ্টা তুলিয়া লইল এবং বাজাইবার সময়ে গর্বের হাসি হাসিয়া সকলের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। এই সময় হইতে

শিক্ষকের হাতে একটি নূতন অস্ত্র আসিল—ইহা হইল প্রশংসা ও নিন্দা। শৈশবে এই অস্ত্রের শক্তি খুব বেশী কিন্তু বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে ইহা প্রয়োগ করিতে হইবে। শিশুর প্রথম বছরে তাহাকে কখনই নিন্দা করা ঠিক হইবে না। পরেও ইহা খুব কম প্রয়োগ করিতে হইবে। প্রশংসা বরং কম ক্ষতিকর। কিন্তু ইহা অতি অল্পতেই যখন তখন প্রয়োগ করিলে ইহার মূল্য কমিয়া যায়, শিশুকে অতিরিক্ত মাত্রায় উৎসাহিত করার জন্যও ইহা প্রয়োগ করা উচিত নয়। শিশু যখন প্রথম হাঁটে এবং বোধগম্য কথা বলে তখন খুব কম পিতামাতাই প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন। তাহা ছাড়া শিশু যখন চেষ্টা করিয়া কোন কঠিন বিষয়ে কৃতকার্য হয় তখন পুরস্কার হিসাবে প্রশংসা তাহার সত্যই প্রাপ্য। অধিকন্তু শিশুকে ইহা বুঝিতে দেওয়া ভাল যে, আপনি তাহার শিক্ষার বাসনায় সহানুভূতি দেখাইতেছেন।

শিশুর শিখিবার বাসনা এত বেশী যে, পিতামাতা কেবল ইহার সুযোগ করিয়া দিলেই যথেষ্ট। শিশুকে আত্মবিকাশের সুযোগ দিন, সে নিজের চেষ্টাতেই অগ্রসর হইবে। শিশুকে হামাগুড়ি দিতে, হাঁটিতে অথবা তাহার পেশী নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত অন্য কোন কিছু শিখাইতে হইবে না। আমরা অবশ্য কথা বলানো শিখাইব কিন্তু ইহাতে কোন উপকার হয় কিনা সন্দেহ। শিশুরা নিজেদের বুদ্ধির সঙ্গে সমতা রাখিয়া শিখিতে থাকে, জোর করিয়া শিখানোর চেষ্টা করা ভুল। চেষ্টা করিয়া প্রাথমিক অসুবিধাগুলি জয় করিয়া কৃতকার্য হওয়ার যে অভিজ্ঞতা তাহাই সারাজীবন ধরিয়া চেষ্টার প্রেরণা যোগায়। এই অসুবিধাগুলি এমন হওয়া উচিত নয় যাহা শিশু জয় করিতে না পারিয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে বা এমন সহজও হওয়া উচিত নয় যাহাতে কোন চেষ্টারই প্রয়োজন হয় না। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ইহাই হইল মৌলিক নীতি। আমরা নিজেরা যাহা কিছু করি কেবল তাহা দ্বারাই শিখিয়া থাকি। বয়স্ক ব্যক্তি এইটুকু করিতে পারেন—শিশু যাহা করিতে চাহিবে এমন কিছু নিজে করিয়া দেখাইলেন যেমন ঝুমঝুমি বাজানো, তারপর কেমন করিয়া ঝুমঝুমি বাজাইতে হয় শিশু নিজে চেষ্টা করিয়া শিখুক। অন্যে যাহা করে তাহা দেখিয়া সে সেইরূপ চেষ্টা করিতে উৎসাহী হয় মাত্র, অন্যের কিছু করা তাই শিশুর শিক্ষা নয়, শিক্ষার প্রেরণা মাত্র।

নিয়মানুবর্তিতা এবং রুটিন মত কাজ শিশুর জীবনে বিশেষ করিয়া প্রথম বছরে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রথম হইতে ঘুম খাওয়া এবং মলমূত্র ত্যাগে নির্দিষ্ট অভ্যাস গঠন করাইতে হইবে। ইহাছাড়া পরিবেশের সঙ্গে পরিচিতি শিশুর মনের দিক দিয়া বিশেষ উপকারী। ইহা তাহাকে জিনিস চিনিতে

সাহায্য করে এবং তাহার মনে নিরাপত্তার ভাব গড়িয়া তোলে। আমার অনেক সময় মনে হইয়াছে যে, প্রকৃতির নিয়ম সর্বদা একইরকম থাকে বলিয়া যে বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস আমাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে নিরাপত্তার বাসনা হইতেই তাহার উৎপত্তি। যাহা ঘটিবে বলিয়া জানা আছে তাহার সঙ্গে আমরা আঁটিয়া উঠিতে পারি কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম যদি অকস্মাৎ পরিবর্তিত হইয়া যাইত তবে আমরা বাঁচিতাম না। প্রথম অবস্থায় শিশু থাকে দুর্বল, তাহাকে আশ্বস্ত করিবার এবং সকল আপদ হইতে রক্ষা করিয়া আরামে রাখিবার প্রয়োজন আছে। শৈশবাবস্থার শেষ দিকে শিশুর নূতনের প্রতি ঝোঁক বাড়ে কিন্তু প্রথম বছরে অস্বাভাবিক জিনিষ মাত্রই তাহার ভীতি উৎপাদন করে। যদি পারেন, শিশুকে ভয় অনুভব করতে দিবেন না। যদি সে অসুস্থ হয় এবং আপনি উদ্বিগ্ন হন, আপনার উদ্বেগ সযত্নে গোপন রাখিবেন যাহাতে শিশু মোটেই বুঝিতে না পারে। এমন কিছুই করিবেন না যাহা উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। শিশু যদি না খায়, না ঘুমায়, কিছুক্ষণ মলমূত্র ত্যাগ না করে তবে উদ্বেগের ভাব দেখাইবেন না। কেননা এরূপ করিলে শিশুর মনে আত্ম প্রাধান্যের ভাব উঠিতে পারে। ইহা কেবল শিশুর প্রথম বছরেই প্রযোজ্য নয়, পরেও মানিয়া চলা উচিত। শিশুকে কখনই বুঝিতে দিবেন না যে, আপনি চান শিশু কোন একটি স্বাভাবিক কাজ করুক যাহা তাহার নিজের পক্ষেও আনন্দদায়ক, যেমন খাওয়া, এবং তাহা করিয়া সে আপনাকে আনন্দ দিক। এরূপ করিলে সে বুঝিবে যে একটি নূতন ক্ষমতা সে হাতে পাইয়াছে, এবং যাহা সে আপনা আপনিই করিত তাহা করাইবার জন্য তাহাকে অগ্রে আদর আপ্যায়ন তোষামোদ করুক ইহাই সে মনে মনে কামনা করিবে। অনুমান করিবেন না যে, শিশুর এইরূপ আচরণ বুঝিবার মত বুদ্ধি নাই। ইহার ক্ষমতা কম, বুদ্ধিও সীমাবদ্ধ কিন্তু যেখানে সে ইহা প্রয়োগ করিতে পারে সেখানে তাহার বুদ্ধি বয়স্ক ব্যক্তির মতই। প্রথম বারো মাসের মধ্যে শিশু যতখানি শেখে পরবর্তীকালে ঐ পরিমাণ সময়ের মধ্যে সে আর ততখানি শিখিতে পারে না, অত্যন্ত সক্রিয় বুদ্ধি না থাকিলে কখনই ইহা সম্ভব হইত না।

আসল কথা হইল: শিশুর মধ্যে ভবিষ্যতের একজন বয়স্ক ব্যক্তির সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে ইহা মনে করিয়া ছোট্ট শিশুর প্রতিও শ্রদ্ধাযুক্ত আচরণ করুন। আপনার বর্তমান সুবিধার নিকট কিংবা শিশুকে অত্যধিক আদর করিয়া যে-আনন্দ পান তাহার নিকট শিশুর ভবিষ্যৎ বলি দিবেন না। এ দুইটিই সমান ক্ষতিকর। অন্যত্র যেমন এখানেও তেমনি শিশুর শিক্ষাদান ব্যাপারে ঠিক পথে চলিতে হইলে স্নেহ ও জ্ঞানের মিলন আবশ্যক।

চতুর্থ অধ্যায়

ভয়

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে দুই হইতে ছয় বৎসর বয়স্ক শিশুর নৈতিক শিক্ষার বিষয় আলোচনা করিব। শিশুর বয়স ছয় বৎসর হইতেই তাহার নৈতিক শিক্ষা প্রায় শেষ হওয়া উচিত, অর্থাৎ পরবর্তীকালে বালক-বালিকার নিকট হইতে যে-গুণের বিকাশ আশা করা হইবে এই সময়ের মধ্যে ভাল অভ্যাস গঠনের ফলে এবং উচ্চাকাঙ্খা জাগারত হওয়ায় তাহার সূত্রপাত হওয়া চাই। যেখানে নৈতিক শিক্ষা উপেক্ষিত হয় কিম্বা খারাপভাবে দেওয়া হয় কেবল সেখানেই পরে এ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে।

ধরিয়া লইলাম যে, পূর্ব্ব অধ্যায়ে চারিত্রিক শৃঙ্খলা বিধানের জন্য যে প্রণালী আলোচিত হইয়াছে তাহা অবলম্বিত হওয়ায় শিশু সুখী ও স্বাস্থ্যবান হইয়া এক বৎসর বয়সের হইয়াছে। অবশ্য পিতামাতার সর্বপ্রকার যত্ন সত্ত্বেও অল্পসংখ্যক শিশুর স্বাস্থ্য খারাপ থাকিবেই। কিন্তু আশা করা যায় যে, কালক্রমে এ সংখ্যাও হ্রাস পাইবে। বর্তমান যুগের জ্ঞান যথাযথভাবে প্রয়োগ করিলে অন্য দিক দিয়া রুগ্ন শিশুর সংখ্যা খুবই তুচ্ছ হইত। যেসব শিশুর শৈশবের শিক্ষা ভাল হয় নাই তাহাদের জন্য কি করা উচিত তাহা আমার আলোচ্য বিষয় নয়, এ সমস্যা শিক্ষকের, পিতামাতার না। এ-বই বিশেষ করিয়া সন্তানের পিতামাতার উদ্দেশ্যেই লিখিত।

শিশুর দ্বিতীয় বৎসর খুবই আনন্দময়। সে হাটিতে এবং কথা বলিতে শিখিয়াছে ; ইহার ভিতর সে স্বাধীনতা ও নূতন শক্তির সন্ধান পাইয়াছে। শিশু দিন দিন বাড়িতে থাকে। (১) তাহার পক্ষে স্বাধীনভাবে খেলা করা সম্ভব হয়, এবং বিশ্বের সব জিনিস দেখিবার বাসনা তাহার এত বেশী হয় যে, একজন ভূপর্যটকের তত হয় না। পাখী, ফুল, নদী, সমুদ্র, মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি, স্টীমার প্রভৃতি তাহার অপরিসীম আনন্দ ও কৌতূহলের উদ্রেক করে। এই সময় তাহার কৌতূহলের শেষ নাই, প্রায়ই তাহার মুখে শোনা যাইবে 'দেখতে চাই'। নিজের শোবার খাট কিম্বা ঠেলাগাড়ি হইতে মুক্ত হইয়া শিশু বাগানের ভিতর, মাঠে অথবা সাগরতীরে ছুটাছুটি করিয়া মুক্তির আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। প্রথম বৎসর অপেক্ষা এখন হজম শক্তি বেশী হইয়াছে, খাদ্যেও বৈচিত্র্য আসিয়াছে, চিবানো এখন একটি নূতন আনন্দ। এইসব কারণে শিশুর

যদি উপযুক্ত যত্ন লওয়া হয় এবং যদি তাহার স্বাস্থ্য ভাল থাকে তবে এই বয়সে শিশুর জীবন তাহার কাছে আনন্দময় এবং রোমাঞ্চকর মনে হয়।

হাঁটা ও দৌড়ানোর মধ্যে শিশু যে নূতন স্বাধীনতার সন্ধান পায় তাহার সঙ্গে একটি নূতন ভয়ও তাহার মনে আসে। শিশুকে সহজেই ভয় দেখানো যায়; ডক্টর এবং শ্রীমতী ওয়াট্‌সন দেখিয়াছেন যে, শিশু উচ্চ শব্দ এবং পড়িয়া যাওয়ার আশংকা হইতে সবচেয়ে বেশী ভয় পায়। শিশুকে এমনভাবে যত্নের সঙ্গে রাখা হয় যে, ইহার বাস্তব ভয়ের কোন কারণই থাকিতে পারে না; সত্যিকারের কোন বিপদ হইলেও শিশু সেখানে অসহায়. কাজেই ভয় শিশুর কোন কাজেই আসিবে না। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বৎসরে শিশুর মনে নূতন ভয় আসে। তর্কের বিষয় হইল এই যে, এই ভয় কি শিশুর প্রবৃত্তিগত অর্থাৎ আপনা আপনি বিকশিত হয়, না অন্যের নিকট হইতে শিশু ইহা ছোঁয়াচে রোগের মত পায়? শিশুর প্রথম বছরে ভয় থাকে না, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা যে প্রবৃত্তি হইতে জাত নয় এমন প্রমাণ করা চলে না; কেননা যে-কোন বয়সে একটি প্রবৃত্তি পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে। উগ্র ফ্রয়েডবাদীও বলিবেন না যে, জন্মের সময়ই শিশুর যৌন প্রবৃত্তি পরিপূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে। স্পষ্টতই দেখা যায় যে শিশু হাঁটিতে পারে না তাহার চেয়ে যে চলাফেরা করিতে পারে তাহারই ভয়ের প্রয়োজন বেশী; কাজেই যখন প্রয়োজন তখন যদি ভয় প্রকাশ পাইতে থাকে তবে বিস্ময়ের কিছু নাই। এ প্রশ্নটির শিক্ষাসম্বন্ধীয় গুরুত্ব অনেক। ভয় যদি অন্যের নিকট হইতে সংক্রামিত হয় তবে সহজ উপায়েই ইহা নিবারণ করা যায়—যেমন শিশুর সম্মুখে ভয় বা বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া। পক্ষান্তরে যদি কতক ভয় প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত হয় তবে ইহা নিবারণের জন্য আরো ব্যাপক কোন পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

ডক্টর চামার্স মিচেল তাঁহার The Childhood of Animals (জীবজন্তুর শৈশব) পুস্তকে পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে, সাধারণতঃ জীবজন্তুর শাবকদের মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ভয় থাকে না। বানর এবং কয়েক প্রকার পাখী ছাড়া অন্য কোন জীবের শাবক তাহাদের প্রজাতির চিরশত্রু যেমন সাপ প্রভৃতিকেও মোটেই ভয় করে না, যদি না তাহাদের জনকজননী তাহাদিগকে ভয় করিতে শিখাইয়া না দেয়। এক বছরের কম বয়সের শিশু কোন প্রাণীকেই ভয় করে না। এইরূপ একটি শিশুকে ডক্টর ওয়াট্‌সন ইঁদুরকে ভয় করিতে শিখাইয়াছিলেন; যখনই ইঁদুরটি ইহার সামনে আসিত তখনই শিশুটির পিছনে খুব জোরে ঘণ্টার আওয়াজ করিতেন; আওয়াজ শুনিয়া সে ভয় পাইত; ক্রমে ইঁদুরের সঙ্গে এই ভয়েই সংযোগ সাধিত হইল অর্থাৎ পরে শব্দ না হইলেও

ইঁদুর দেখিলেই সে ভীত হইত। কিন্তু প্রাণি শাবকদের প্রথম কয়েক মাসে কোন প্রবৃত্তি-জাত ভয় থাকে না। অন্ধকারে ভয়ের কারণ আছে বলিয়া যাহাদিগকে শিখানো হয় নাই এমন ছেলেমেয়েদের অন্ধকার ভীতিপ্রদ নয়। এরূপ ধারণার যথেষ্ট কারণ আছে যে, বেশীর ভাগ ভয় যাহা আমরা এতদিন প্রবৃত্তি-জাত মনে করিতাম অপরের নিকট হইতে সঞ্চারিত হয়; বয়স্ক ব্যক্তিরা সৃষ্টি না করিলে এরূপ ভয় মোটেই দেখা দিত না।

এই বিষয়ে নূতন তথ্য পাইবার আশায় আমি আমার ছেলেমেয়েদিগকে সযত্নে পর্যবেক্ষণ করিয়াছি। কিন্তু ধাত্রী এবং পরিচারিকারা কখন তাহাদিগকে কি বলিয়াছে তাহা সর্বদা জানিতে পারি নাই এইজন্য ঘটনার বিশ্লেষণও কখন কখনও সন্দেহজনক হইয়াছে। যতদূর বিচার করিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে হয় শিশুর প্রথম বছরে ভয় সম্বন্ধে ডক্টর ওয়াট্‌সন যাহা বলিয়াছেন তাহাই ঠিক; আমার ছেলেমেয়েদের বেলায় ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে। দ্বিতীয় বৎসরে তাহারা কোন প্রাণী দেখিয়া ভয় পাইত না, কেবল একজন কিছুকাল ঘোড়া দেখিলেই ভীত হইত। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, একদিন একটি খুব জোরে শব্দ করিয়া তাহার পাশ দিয়া ছুটিয়া গিয়াছিল। এ মেয়েটির বয়স এখন দুই বৎসর; ইহার পরবর্তী বয়সে ভয়ের প্রকাশ কেমন তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য ছেলেকে পর্যবেক্ষণ করিতে হইয়াছে। দুই বৎসর পূর্ণ হওয়ার কাছাকাছি এ ছেলেটির জন্য একজন নূতন ধাত্রী নিযুক্ত করা হয়। এ ধাত্রীটি ছিল ভীতু প্রকৃতির, বিশেষ করিয়া অন্ধকারকে অত্যন্ত ভয় করিত। ছেলেটির মধ্যে অল্পদিনেই এ ভয় সংক্রামিত হইল (প্রথম অবশ্য আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই); সে কুকুর বিড়াল দেখিলে ছুটিয়া পলাইত, কালো কাপ্‌বোর্ড দেখিলে ভয়ে জড়সড় হইত। অন্ধকারে ঘরের প্রত্যেক অংশে আলো চাহিত, এমন কি প্রথমবার তাহার ছোট বোনটিকে দেখিয়া রীতিমত ভয় পাইয়াছিল; হয়তো সে ইহাকে কোন অজানা অদ্ভুত প্রাণী মনে করিয়াছিল। [কলের পুতুল দেখিলে যেরূপ ভয় হয় এমনও হইতে পারে। সে যখন প্রথম দেখে তখন মেয়েটি ঘুমাইতেছিল; সে ইহাকে কলের পুতুল মনে করিয়াছিল; মেয়েটি যখন নড়িয়াছিল অমনি সে চমকিয়া উঠিয়াছিল।]

ছেলেটি হয়তো এই ভয় ভীতু ধাত্রীর নিকট হইতে লাভ করিয়াছিল; বস্তুতঃ ধাত্রী চলিয়া যাওয়ার পর ভয়ও ধীরে ধীরে লোপ পাইয়াছিল। কিন্তু অন্য ধরনের ভয়ও ছিল। এরূপ ভয় ধাত্রী আসিবার পূর্বে প্রকাশ পাইয়াছিল; তাহা ছাড়া কোন বয়স্ক ব্যক্তি এরূপ ভয় বোধ করিবে না। কাজেই অন্যের নিকট হইতে সঞ্চারিত হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। এরূপ

ভয়ের মধ্যে প্রধান হইল—যাহা কিছু অদ্ভুতভাবে চলে তাহার প্রতি ভয়, যেমন ছায়া ও খেলনা কলের পুতুল। ইহা পর্যবেক্ষণ করিয়া আমি বুঝিলাম যে, এই ধরনের ভয় শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক এবং এগুলি প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। উইলিয়াম স্টার্ণ তাঁহার Psychology of Early Childhood (শৈশবের মনস্তত্ত্ব) পুস্তকে রহস্যজনক বস্তুর প্রতি ভয় (Fear of the Mysterious) শীর্ষক নিবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :

> পূর্ববর্তী শিশু-মনোবিজ্ঞানীবিদগণ এই ধরণের ভয়ের কথা, বিশেষ করিয়া অতি শৈশবে এরূপ ভয়ের স্বরূপ কি তাহা আলোচনা করেন নাই। পরে গ্রুস এবং তাঁহার সঙ্গে আমরা ইহার স্বরূপ জানিতে পারিয়াছি। জানা বিপদের ভয় অপেক্ষা অপরিচিত বিষয়ের ভয়ই বেশী স্বভাবগত বলিয়া মনে হয়। শিশু যদি এমন কোন জিনিস দেখিতে পায় যাহা তাহার পরিচিত ধারণার সঙ্গে মেলে না তবে তিন প্রকার প্রতিক্রিয়া হইতে পারে। হয় (১) নূতন জিনিষটি এত অপরিচিত মনে হইবে যে, ইহার প্রতি সে মোটেই আকৃষ্ট হইবে না। (২) কিম্বা দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও তাহার মনে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে পারিবে না। তখন ইহার জাগ্রত হইবে বিস্ময়, জানিবার বাসনা, নানা চিন্তা, বিচার এবং অনুসন্ধানের মনোভাব। (৩) অথবা নূতন জিনিস তাহার পূর্বের ধারণাকে সম্পূর্ণ উল্টাইয়া দিয়া তাহার মনে গভীর অসন্তোষ ও অজানার প্রতি ভয়ের ভাব সৃষ্টি করিবে। গ্রুস বিশেষ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন যে, এই অজানার প্রতি ভীতি প্রবৃত্তি-জাত ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, জীবকুলের আত্মরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়াই ইহা এক প্রজাতি (generation) হইতে অন্য প্রজাতিতে সঞ্চারিত হয়।

স্টার্ণ ভয়ের অনেক উদাহরণ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে ছাতা খুলিলে ভয় পাওয়া এবং কলের পুতুল দেখিয়া ভয় পাওয়ার কথাও আছে। প্রথমোক্তটি গরু ঘোড়ার মধ্যেই বেশী। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি গরু বা ঘোড়ার দলকে একটি ছাতার সাহায্যে উর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত করা যায়। স্টার্ণ যেমন বর্ণনা করিয়াছেন আমার নিজের ছেলের ভয়ও তেমনি ছিল। অস্পষ্ট দ্রুত চলমান ছায়া দেখিলে (যেমন রাস্তায় চলমান গাড়ীর ছায়া যদি ঘরের দেওয়ালে পড়িত) ভয় পাইত। আমি মেঝেতে এবং দেওয়ালে আঙুল দিয়া ছায়া ফেলিতাম এবং তাহাকে দিয়া অনুরূপ করাইতাম, এইভাবে তাহার ছায়া-ভীতি দূর হইয়াছিল। শীঘ্রই সে বুঝিয়াছিল ছায়া জিনিসটি কি এবং ইহাতে সে

আনন্দ অনুভব করিত। কলের পুতুল সম্বন্ধেও এই নীতিই প্রযোজ্য। পুতুলের ভিতরকার কলকব্জাটুকু দেখা হইলে সে আর ভয় পাইত না। কলকব্জা যদি দেখা না যাইত তবে ভয় দূর হইতে কিছু সময় লাগিত। কেহ তাহাকে একটি ছোট বসিবার আসন দিয়াছিল, চাপ দিলেই ইহা হইতে এক রকম করুণ একটানা শব্দ বাহির হইত। অনেকদিন পর্যন্ত সে এটা দেখিয়া ভয় পাইয়াছে। কিন্তু আমরা এই ভয়ের জিনিসটাকে কিছুতেই সরাইয়া ফেলি নাই প্রথমে এটি কিছুটা দূরে রাখা হইয়াছিল যাহাতে সে বেশী ভয় না পায়। পরে অল্প অল্প করিয়া এটি ছেলের কাছে পাবাচত করাইয়া লইলাম এবং তাহার ভয় সম্পূর্ণ দূর না হওয়া পর্যান্ত থামি নাই। আসনের যে রহস্যময় ভাবের জন্য এটি ভীতিপ্রদ হইয়াছিল খোকার ভয় কাটিয়া যাওয়ার পর ইহাই তাহাদের আনন্দ দিয়াছে। আমার মনে হয় অবাস্তব ভয় চাপিয়া রাখা ঠিক উচিত নয়, ক্রমে ক্রমে পরিচয় জন্মাইয়া ইহা সম্পূর্ণ দূর করাই সঙ্গত।

দুইটি ক্ষেত্রে বাস্তব ভয় সম্বন্ধে আমরা ঠিক ইহার বিপরীত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলাম। হয়ত ইহা ভুলই হইয়াছিল। তখন প্রত্যক্ষ ভয়ের কারণ বিদ্যমান ছিল না। বৎসরের অর্ধেকটা আমি কোন পাহাড়ময় সাগরতীরে কাটাই। ছেলেটির উচ্চতা সম্বন্ধে কোনরূপ ভীতি ছিল না এবং না ঠেকাইলে সে খাড়া পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া যাইত। একদিন আমরা একটি খাড়া পাহাড়ের উপর বসিয়াছিলাম, সমুদ্রের জল হইতে ইহা প্রায় একশত ফুটে উচ্চে। ছেলেকে শান্তভাবে এই বৈজ্ঞানিক তথ্য বলিলাম: যদি পাহাড়ের ধারে যাও নীচে পড়ে যাবে, পড়ে গেলে প্লেটের মত ভেঙ্গে যাবে। (সে কয়েকদিন আগে একখানা প্লেট মেঝেতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে দেখিয়াছিল) কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া সে নিজে নিজে উচ্চারণ করিল 'পড়ে যাবে, ভেঙ্গে যাবে।' তারপর সে সেখান হইতে তাহাকে সরাইয়া আনিতে বলে। এ ঘটনা ঘটে তখন তাহার বয়স প্রায় আড়াই বৎসর। ইহার পর হইতে আমরা লক্ষ্য রাখিলে সে খুব উচুতে উঠিত না। কিন্তু কাছে কেহ না থাকিলে বিপদ সম্বন্ধে তাহার কোন হুস থাকিত না। তাহার বয়স যখন তিন বৎসর নয় মাস তখনই নিঃসঙ্কোচে ছয় ফুট উচ্চ হইতে লাফাইত। বারণ না করিলে কুড়ি ফুট উচ্চ স্থান হইতে লাফ দিতেও সে প্রস্তুত ছিল। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ভয় সম্বন্ধে শিক্ষাদান বিশেষ কার্যকরী হয় নাই। ইহার কারণ আমার নিকট এই মনে হয় যে, উচ্চস্থান হইতে পতনের ভয় সম্বন্ধে শুধু শিক্ষাদান করা হইয়াছিল, ভয় সঞ্চার করা হয় নাই। যখন উপদেশ দেওয়া হইতেছিল তখন আমাদের দুইজনের মধ্যে কেহই ভয় অনুভব করি নাই। শিক্ষা ব্যাপারে ইহার গুরুত্ব

খুব বেশী। বাস্তব বিপদ সম্পর্কে আশংকা থাকা দরকার, ভয় থাকার কোন প্রয়োজন নাই। কিছুমাত্রায় ভয়ের সঙ্গে পরিচিত না থাকিলে শিশু বিপদের আশংকা অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু উপদেষ্টা বা শিক্ষকের মধ্যে এই ভয়ের সামান্য প্রকাশ না থাকিলে শিশুর মনে ইহা কোন রেখাপাত করে না। শিশুর তত্ত্বাবধানকারী বয়স্ক ব্যক্তিদের কখনই ভীত হওয়া উচিত নয় এই কারণেই পুরুষের মধ্যে যেমন স্ত্রীলোকদের মধ্যেও তেমনি সাহস বাড়ানো প্রয়োজন।

দ্বিতীয় উদাহরণটি ততটা ইচ্ছাকৃত নয়। খোকার বয়স যখন তিন বছর চার মাস একদিন তাহাকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে গিয়া পথে একটি বিষধর সাপ দেখিতে পাই। খোকা পূর্বে সাপের ছবি দেখিয়াছিল কিন্তু আসল সাপ দেখে নাই। সাপ যে কামড়ায় তাহা সে জানিত না। সাপ দেখিয়া সে খুশী হইয়া উঠিল এবং সেটি চলিয়া গেলে তাহার পিছে পিছে দৌড়াইতে লাগিল। আমি জানিতাম যে সে সাপের কাছে দৌড়াইয়া পৌঁছিতে পারিবে না, কাজেই তাহাকে বারণ করি নাই এবং সাপ যে বিপজ্জনক তাহাও বলি নাই। এই ঘটনার পর হইতে তাহার পরিচারিকা লম্বা ঘাসের মধ্যে সাপ থাকিতে পারে এই ভয়ে তাহাকে দৌড়াদৌড়ি করিতে দিত না। ইহার ফলে খোকার মনে সামান্য ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু তাহা খুব বেশী নয়।

সমুদ্রের ভয় দূর করাই হইয়াছিল সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার। খোকার যখন আড়াই বছর বয়স তখন তাহাকে প্রথমবার সমুদ্রের জলে নামাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। প্রথমে ইহা একেবারেই অসম্ভব ছিল। ঠাণ্ডা জল সে মোটেই পছন্দ করিত না, ঢেউ এর গর্জন শুনিয়া সে ভয়ে জড়সড় হইয়াছিল, তাহার মনে হইতেছিল সমুদ্র কেবলি আসিতেছে, ফিরিয়া যাইতেছে না। ঢেউ বড় থাকিলে সে সমুদ্রের কাছে যাইতেই চাহিত না। এটা ছিল সাধারণভাবে ভয় পাওয়ার কাল জীবজন্তু উচ্চ বিকট শব্দ এবং বিভিন্ন জিনিস তাহার ভয় উৎপাদন করিত। সমুদ্রের ভয় আমরা অল্প অল্প করিয়া দূর করিয়াছিলাম। প্রথমে শিশুকে সমুদ্র হইতে কিছুটা দূরে অগভীর ডোবার মধ্যে বসাইয়া রাখা হইত ও ঠাণ্ডার ভয় এইভাবে কাটিয়া গিয়াছিল। গরম চার মাসের শেষ দিকে সে এই ডোবার মধ্যে হাঁটিয়া আনন্দ পাইত কিন্তু কোমর পর্যন্ত জলে নামাইলে চিৎকার করিতে থাকিত। সমুদ্রের গর্জন শোনা যায় অথচ ঢেউ দেখা যায় না এমন স্থানে প্রত্যহ এক ঘণ্টা করিয়া তাহাকে খেলিতে দেওয়া হইত ভাই-বোনদিগকে সমুদ্রে স্নান করিতে দেখিত। ইহার পর আমরা তাহাকে এমন জায়গায় লইয়া যাইতাম যেখান হইতে সাগর দেখা যাইত, তাহাকে দেখান হইত

যে, ঢেউ আসিয়া আবার চলিয়া যাইতেছে। এইভাবে তাহার সাগর গর্জন ভীতি দূর করা হইল। ইহা ছাড়া সে তাহার পিতামাতা ও অন্যান্য ভাইবোন-দিগকে সমুদ্রে স্নান করিতে দেখিত।

এ সবের ফলে এইমাত্র হইল যে খোকা নির্ভয়ে ঢেউ-এর নিকটে যাইত মাত্র। এ ক্ষেত্রে ইহা নিশ্চিত যে ভয় প্রবৃত্তি হইতে সঞ্জাত, অন্যের নিকট হইতে সঞ্চারিত হইবার কোন কারণ ছিল না। পরের বছর গ্রীষ্মকালে আবার সমুদ্র স্নান শুরু হইল। তখন খোকার বয়স সাড়ে তিন বছর। তখনও ঢেউ-এর মধ্যে যাইতে তাহার রীতিমত ভয় ছিল। মিষ্টি কথায় যখন কোন ফল হইল না, অন্যান্য সকলের স্নান করা দেখিয়াও যখন খোকা জলে নামিতে সাহসী হইল না তখন আমরা পুরানো প্রণালী গ্রহণ করিলাম। তাহাকে বুঝিতে দিলাম যে তাহার ভীরুতা দেখিয়া আমরা লজ্জা বোধ করি এবং তাহার সাহস দেখিলে প্রশংসা করি। প্রায় এক পক্ষকাল ধরিয়া প্রত্যেকদিন তাহার ধ্বস্তাধস্তি এবং চিৎকার সত্ত্বেও তাহাকে গলা পর্যন্ত জলে ডুবাইয়া রাখা হইত। দিন দিন চিৎকার এবং হাত পা ছোড়া কমিয়া আসিতে লাগল। ভয় সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হওয়ার আগেই সে জলে নামিতে চাহিত। এক পক্ষ শেষে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া গিয়াছিল—সে আর সমুদ্র দেখিয়া ভয় পাইত না। সেই সময় হইতে আমরা তাহাকে সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, আবহাওয়া ভাল থাকিলে নিজের খুশীমত সে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে স্নান করিত। প্রথমে ভয় সম্পূর্ণভাবে লোপ পায় নাই, গর্ব ইহাকে আংশিকভাবে চাপিয়া রাখিয়াছিল। পরিচয়ের ফলে ভয় কমিতে কমিতে অবশেষে সম্পূর্ণ লোপ পায়। তাহার কুড়ি মাস বয়স্ক ছোট বোন সমুদ্রকে মোটেই ভয় করে না এবং নিঃসঙ্কোচে দৌড়াইয়া জলে নামিয়া পড়ে।

এই ব্যাপারে এই রকম বয়সে আমার উপর যে প্রণালী প্রয়োগ করা হইয়াছিল তাহা অদ্ভুত। গোড়ালি ধরিয়া উঁচু করিয়া আমার মাথা জলের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া হইত, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইহার ফলে সমুদ্রের জল আমি ভালবাসিতে আরম্ভ করি। তথাপি এ প্রক্রিয়া আমি অন্যের জন্য অনুমোদন করি না।

এ কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইল, কারণ যে বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে আমার বিশেষ আস্থা আছে ইহা কতকাংশে তাহার বিরুদ্ধে গিয়াছে। শিক্ষাক্ষেত্রে জোর প্রয়োগ না করাই ভাল। কিন্তু আমার মনে হয় ভয় জয় করিতে কিছুটা জোর জবরদস্তি সুফল দেয়। কোন অবাস্তব ভয় যদি প্রবল হয় শিশুর নিজের উপর ছাড়িয়া দিলে সে কখনই পরীক্ষা

করিয়া দেখিবে না বাস্তবিক সে-ভয়ের কোন প্রকৃত হেতু আছে কিনা। যাহা পূর্বে বিপজ্জনক মনে হইয়াছিল এরূপ ঘটনা যদি বারে বারে অনুষ্ঠিত হয় অথচ কোন বিপদ না ঘটে তবে ইহার সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘটে। এই পরিচয়ই ভয় নাশ করে। এই ভীতিনাশক অভিজ্ঞতা কেবল একবার দিলেই চলিবে না; বারংবার ঘটাইতে হইবে যেন ইহার সম্বন্ধে কোন ভয়ই আর না থাকে। কোন-প্রকার জোর না করিয়া যদি এরূপ অভিজ্ঞতা দেওয়া যায় তবে ভালই; তাহা যদি সম্ভব না হয় তবে অপরাজিত ভয় পোষণ করা অপেক্ষা জোর করিয়া দূর করাই শ্রেয়।

আরো একটি বিষয় আছে। আমার ছেলের ক্ষেত্রে এবং মনে হয় অন্য সকলের ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে ভয়কে জয় করার আনন্দ অপরিসীম। বালকের গর্ববোধ জাগানো সহজ; সাহস দেখানোর জন্য প্রশংসা পাইলে সারাদিন সে আনন্দে উৎফুল্ল থাকে। পরবর্তী বয়সে ভীরু ছেলেরা অন্য সকলের ঘৃণার পাত্র হইয়া মানসিক কষ্ট বোধ করে কিন্তু তখন তাহাদের পক্ষে নূতন অভ্যাস গঠন করাও কঠিন। এইজন্য আমার মনে হয় অল্প বয়স হইতেই ভয় দমন করার ব্যাপারে আত্ম-সংযম অভ্যাস এবং দৈহিক পটুতা (enterprise) শিক্ষা দেওয়া উচিত। এজন্য যদি কিছু কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় তাহাও বরং বাঞ্ছনীয়।

পিতামাতা তাঁহাদের ভুল হইতে শিক্ষালাভ করেন, ছেলেমেয়েরা যখন বড় হইয়া উঠে তখনি তাঁহারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারেন এবং কিভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল তাহাও উপলব্ধি করিতে পারেন। ছেলেকে অতিরিক্ত আদর দিলে কি কুফল ফলে তাহার একটি উদাহরণ উল্লেখ করিব। আমার ছেলের বয়স আড়াই বছর তখন তাহার একটি কুঠুরিতে একা একা শুইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পরিচারিকার তত্ত্বাবধানে শিশুর শয়ন-ঘর হইতে অন্যত্র শুইতে পাওয়ায় পদোন্নতির গর্বে সে খুবই আনন্দিত হইয়াছিল এবং প্রথম প্রথম সারারাত্রি নির্বিঘ্নে ঘুমাইয়া কাটাইত। এক রাত্রিতে খুব জোরে ঝড় বহিতেছিল, ভীষণ শব্দ করিয়া জানালার একটি খিল খুলিয়া গিয়াছিল। ভয়ে জাগিয়া উঠিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহার কক্ষে গেলাম: সে হয়ত দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়াছিল; সে আমার কণ্ঠলগ্ন হইয়া শুইয়া রহিল; দ্রুততালে তাহার হৃৎস্পন্দন হইতেছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার ভয় দূর হইল কিন্তু আলো না থাকায় অনুযোগ করিতে লাগিল। অথচ ঐ সময় সে সারারাত্রি অন্ধকার ঘরেই ঘুমাইত। তাহাকে রাখিয়া আসার পর আবার সে ভয়ের কথা বলে। কাজেই তাহাকে

একটি আলো দেওয়া হইল। ইহার পর সে প্রায় প্রতিরাত্রিতেই চিৎকার করিয়া উঠিত, পরে বোঝা গেল ইহার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, বয়স্ক ব্যক্তিরা আসিয়া তাহাকে লইয়া কিছুটা হৈ চৈ করুক। কাজেই আমরা তাহাকে শান্তভাবে বুঝাইয়া বলিলাম যে, অন্ধকারে ভয়ের কিছুই নাই এবং ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে সে যেন পাশ ফিরিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়ে। কোন গুরুতর কিছু না ঘটিলে যে আমরা তাহার কাছে রাত্রিতে আর যাইব না তাহাও জানাইয়া দিলাম। সে মনোযোগ দিয়া শুনিল এবং তারপর হইতে বিশেষ কারণ ছাড়া আর রাত্রিতে কাঁদিয়া উঠে নাই। রাত্রিতে ঘরে আলো বাগ অবশ্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আমরা যদি আরো বেশী আদর দেখাইতাম তবে হয়ত কিছুকাল, শুধু কিছুকাল কেন হয়ত বরাবরই তাহার ঘুমের ব্যাঘাত করিতাম।

এই গেল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। আমরা এখন ভয় দূর করার সাধারণ প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

প্রথম কয়েক বছরের পর দৈহিক সাহস শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত শিক্ষক হইল অন্য শিশুরা। যদি শিশুর বড় ভাইবোন থাকে তাহারাই উদাহরণ দেখাইয়া এবং উপদেশ দিয়া উহাকে উৎসাহিত করিবে, তাহারা যাহা করিতে পারে শিশুও তাহা অনুকরণ করিবে। স্কুলে দৈহিক ভীরুতাকে সকলেই অবজ্ঞা করে বয়স্ক শিশুদের এ বিষয়ে আর জোর দেওয়ার প্রয়োজন নাই। বালকদের মধ্যে অন্ততঃ এই ভাবই প্রচলিত। মেয়েদের মধ্যেও এইরূপ হওয়া উচিত, তাহাদেরও ছেলেদের মত সাহস থাকা বাঞ্ছনীয়। সৌভাগ্যক্রমে বালিকাদিগকে এখন আর মেয়েলি শিক্ষা দেওয়া হয় না এবং তাহাদের দৈহিক শক্তি বিকাশের পূর্ণ সুযোগ তাহারা পায়। তথাপি বালক ও বালিকাদের মধ্যে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ পার্থক্য রহিয়াছে। আমার বিশ্বাস এই যে, এরূপ পার্থক্য থাকা উচিত নয়। আমি যখন সাহস বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছি তখন সাহসের আচরণমূলক ব্যাখ্যাই আমার মনে আসিয়াছে। অন্যেরা যে কাজ ভয়ে করিতে পারে না সে কাজ যে করে তাহাকে সাহসী বলা যায়। সে যদি মোটেই ভয় না করে তাহা হইলে সবচেয়ে ভাল, শুধু ভয়কে দমন করাকেই আমি সত্যিকারের সাহস কিম্বা শ্রেষ্ঠ সাহস বলি না। বর্তমান নৈতিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হইল—যাহাতে বালকবালিকা বাঞ্ছনীয় আচরণ করে সেজন্য তাহাদের সদভ্যাস গঠন। ইহাই পূর্বে আত্ম সংযম এবং ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে করান হইত। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা যে সাহস প্রদর্শিত হয় তাহা স্নায়বিক বিকলতা সৃষ্টি করে। যুদ্ধক্ষেত্রে কামানের গোলা-ভীতি (Shell Shock) দ্বারা সৃষ্ট মনোবিকলতার বহু দৃষ্টান্ত আছে। যে ভয় দমিত হইয়াছিল তাহাই পরে এমন নূতনরূপে

আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল যে, মনঃসমীক্ষণ দ্বারা তাহা নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় নাই। আমি একথা বলিতে চাই না যে, আত্মসংযমের কোনই প্রয়োজন নাই; বরং একথা ঠিক যে, আত্ম-সংযম ব্যতীত পূর্বাপর সামঞ্জস্য রাখিয়া জীবন ধারণ করাই অসম্ভব। আমার বক্তব্য এই যে, এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইবার জন্য পূর্ব হইতে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই শুধু সেইরূপ অভাবিত বা অদৃষ্টপূর্ব অবস্থায় উপযুক্ত আচরণের জন্য আত্ম-সংযমের ব্যবহার প্রয়োজন। সকলকে সব রকম বিপদের সম্মুখীন হইবার মত শিক্ষা দেওয়াও সম্ভবপর নয়। রাজ্যের সকল অধিবাসীকে যুদ্ধের সময় কিরূপ সাহস প্রদর্শন করিতে হইবে তাহা শিখাইতে যাওয়া মূর্খতারই সামিল। যুদ্ধের ন্যায় সর্বাত্মক বিপদ স্বল্পকাল স্থায়ী এবং কদাচিৎ ঘটিতে থাকে; কাজেই যুবকদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিখার মধ্যে কিরূপ আচরণ করিতে হইবে তাহা অভ্যাস করাইতে গেলে অন্য সকল রকম শিক্ষা খর্ব করিতে হয়।

যে ধরনের ভয়ের সহিত আমি পরিচিত, স্বর্গত ডক্টর রিভার্স তাঁহার 'প্রকৃতি ও নির্জ্ঞান মন' (Instinct and the Unconscious) পুস্তকে তাঁহার চমৎকার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দিয়াছেন। তিনি বলেন, কোন বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন হইবার একটি উপায় হইল দৈহিক পটুতা এবং যাহারা ইহা উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করিতে পারে তাহারা অন্তত সজ্ঞানে ভয় অনুভব করে না। এইরূপ অভিজ্ঞতার যথেষ্ট মূল্য আছে; ইহা আত্মমর্যাদাবোধ বৃদ্ধি করে এবং ভয়কে জয় করিবার কৌশল আয়ত্ত করিতে উৎসাহ দেয়। সাইকেল চালানো শেখবার মত সহজ কৌশলও বালকের মনে এইরূপ অভিজ্ঞতা সঞ্চার করে। বর্তমান জগতে যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রসারের জন্য এই ধরনের কৌশল আয়ত্ত করার প্রয়োজন দিন দিন বাড়িতেছে।

আমার অভিমত এই যে, অন্য লোকের সহিত দৈহিক কসরতের ভিতর দিয়া সাহস অর্জনের চেয়ে নানা কলকব্জা আয়ত্ত করার মত দৈহিক পটুতা শিক্ষা করানো বেশী প্রয়োজনীয়। পর্বত আরোহণে, উড়োজাহাজ চালনায় কিম্বা ঝড়ের মধ্যে ছোট একটি জাহাজ চালাইতে যে প্রকার সাহস দরকার তাহা আমার নিকট যুদ্ধ করিতে যেরূপ সাহস দরকার তাহার চেয়ে বেশী প্রশংসার যোগ্য মনে হয়। কাজেই আমি স্কুলের ছাত্রদিগকে ফুটবল খেলার দিকে ঝোঁক দিতে না দিয়া কমবেশী রকমের বিপজ্জনক বিষয়ে নিপুণতা শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী। যদি কোন শত্রুকেই অভিভূত করিতে হয়, এ শত্রু মানুষ না হইয়া কোন বস্তু হোক, ইহাই বাঞ্ছনীয়। এ নীতি শুধু কাগজ-কলমে বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ

আলোচনায় সীমাবদ্ধ রাখিলেই চলিবে না, শরীর চর্চ্চা ও ক্রীড়া কৌশলের ক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব বৃদ্ধি করিতে হইবে।

দৈহিক সাহস দেখানোর আরো নিষ্ক্রিয় (passive) উপায়ও আছে। কোন রকম হৈ-চৈ আহা উহু না করিয়া আঘাত সহ্য করা ইহার একটি দৃষ্টান্ত। ছোটখাটো আঘাত পাইলে শিশুদের প্রতি যদি সমবেদনা না দেখান হয়, তবে এই ধরনের সাহস গড়িয়া তোলা যায়। পরবর্তীকালে অত্যধিক সমবেদনা পাওয়ার বাসনা হইতে নানা উত্তেজনাময় স্নায়ুরোগের কারণ ঘটিতে পারে। লোকে একটু আদর আপ্যায়ন, একটু কোমল ব্যবহার পাওয়ার আশায় রোগের ভান করে। সামান্য একটু আঁচড় লাগিলে বা কাটিয়া গেলেই শিশুদিগকে কাঁদিতে উৎসাহ না দিলে এইরূপ মনোভাব প্রতিরোধ করা যায়। এই ব্যাপারে বালকদের প্রতি যেমন অতি মৃদু ও কোমল ব্যবহার সঙ্গত নয়, বালিকাদের প্রতিও তেমনি। স্ত্রীলোকেরা যদি পুরুষের সমকক্ষ হইতে চায় তবে চরিত্রের দৃঢ় গুণগুলির বিষয়েই বা তাহারা পুরুষের চেয়ে হীন হইবে কেন?

যে-সাহস কেবল দৈহিক নয় এখন সেই ধরণের সাহসের আলোচনা করা যাক। এই প্রকার সাহসই বিশেষ প্রয়োজনীয় কিন্তু কোন প্রাথমিক ধরনের সাহসকে ভিত্তি না করিয়া ইহা গড়িয়া তোলা কঠিন। অবাস্তব ভয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে রহস্যজনক জিনিসের প্রতি ভয়ের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। আমার বিশ্বাস এই যে, ভয় প্রবৃত্তি হইতে সমুৎপন্ন এবং ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব খুব বেশী। ইহাই অধিকাংশ কুসংস্কারের কারণ। চন্দ্র ও সূর্য-গ্রহণ, ভূমিকম্প, প্লেগ এবং অনুরূপ ঘটনা অশিক্ষিত লোকের মধ্যে রীতিমত ভয় উদ্রেক করে। ব্যক্তিগতভাবে এবং সামাজিকভাবে এ ভীতি খুবই বিপজ্জনক কাজেই প্রথম জীবনেই ইহা সমূলে উৎপাটন করা বাঞ্ছনীয়। এ-ভীতির প্রধান ঔষধ হইল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। প্রথম দৃষ্টিতে যাহা রহস্যজনক তাহারই যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। কতকগুলি ব্যাখ্যা দিলে শিশু অনুমান করিবে যে অন্য ঘটনারও অনুরূপ কারণ আছে এবং ইহা বলা সম্ভবপর হইবে যে, এখনও ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতেছে না। কোন কিছুর রহস্য যে অজ্ঞতা হইতেই উদ্ভূত এবং ধৈর্য ও মানসিক চেষ্টা দ্বারা যে এই অজ্ঞতা দূর করা যায় এই ধারণা যতশীঘ্র জন্মান যায় ততই মঙ্গল। ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, যে-রহস্য প্রথমে শিশুর ভীতি উৎপাদন করে তাহার কারণ জানা হইয়া গেলে তাহাই আবার শিশুকে আনন্দ দেয়। এইভাবে দেখা যায়, যখনই রহস্য আর কুসংস্কার বৃদ্ধি করে না তখন হইতেই ইহা শিশুর পাঠের অনুপ্রেরণা যোগায়। আমার সাড়ে তিন বছরের ছেলে একাকী তন্ময় হইয়া

বহু ঘণ্টা ধরিয়া বাগানের পিচকারীটি পরীক্ষা করিয়াছে। অবশেষে সে বুঝিতে পারে কিভাবে জল ভিতরে আসে এবং বাতাস বাহির হইয়া যায় এবং কিভাবে ইহার বিপরীত অবস্থা ঘটে অর্থাৎ জল বাহির হইয়া গেলে বাতাস প্রবেশ করে। ছোট ছেলেমেয়েরাও যাহাতে বুঝিতে পারে এমনভাবে চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ বুঝাইয়া বলা যায়। শিশুরা যাহা দেখিয়া ভয় পায় বা আনন্দ পায় তাহা সম্ভবপর হইলে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া উচিত।

এই সংক্রান্ত কতকগুলি সমস্যা বেশ কঠিন। ইহাদের ব্যাখ্যা করিয়া শিশুদিগকে বুঝাইয়া দিতে রীতিমত কৌশলের প্রয়োজন। ইহাদের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন হইল মৃত্যু রহস্য। শিশু দেখে যে, গাছপালা এবং জীবজন্তু মরিয়া যায়। তাহার ছয় বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই হয়ত তাহার পরিচিত ব্যক্তির মৃত্যু হইতে পারে। তাহার মন যদি সক্রিয় হয় তবে তাহার মনে হইতে পারে যে তাহার পিতামাতারও একদিন মৃত্যু হইবে। এমন কি সে নিজেও মরিবে। (নিজের মৃত্যুর সম্ভাবনা চিন্তা করা কঠিন)। এই চিন্তাগুলি তাহার মনে বহু প্রশ্ন তুলিবে, এগুলির উত্তর দেওয়া আবশ্যক। যিনি পরলোক বিশ্বাস করেন তাঁহার পক্ষে এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কথঞ্চিৎ সহজ। কিন্তু যিনি বিশ্বাস করেন না তিনিও যেন নিজের বিশ্বাসের বিপরীত কোন অভিমত না দেন। পিতামাতার পক্ষে শিশুর নিকট মিথ্যা বলিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। ইহা বলাই সবচেয়ে ভাল যে মৃত্যু হইল মহানিদ্রা, মৃত্যুঘুমে ঘুমাইয়া পড়িলে কেহ আর জাগিয়া উঠে না। কোনরূপ গাম্ভীর্যের অবতারণা না করিয়া এমনভাবে বলুন যে মৃত্যু একটি সাধারণ ঘটনা। শিশু যদি নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তাকুল হয় তাহাকে বলুন যে, অনেকদিন পর্যন্ত তাহার পক্ষে মৃত্যুর কোন সম্ভাবনা নাই। দুঃখপূর্ণ হইলেও মৃত্যু অনিবার্য এবং ইহার কষ্ট সহ্য করিতেই হইবে। মৃত্যু সম্বন্ধে এই ধরণের ভাব বাল্যকালে শিশুর মনে সঞ্চার করার চেষ্টা বৃথা। আপনি নিজে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন না কিন্তু শিশু জানিতে চাহিলে প্রশ্ন এড়াইয়া যাইবেন না।

শিশুকে বুঝাইয়া দিন যে, ইহার মধ্যে কোন রহস্য নাই। শিশু যদি স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন হয় এবং স্বাস্থ্যবান হয় তবে সে ইহা লইয়া দুঃশ্চিন্তা করিয়া মাথা ঘামাইবে না। এ প্রসঙ্গে কথা উঠিলে খোলাখুলিভাবে আপনি যাহা বিশ্বাস করেন তাহা সরলভাবে বলিবেন এবং শিশুর মনে এই ধারণা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিবেন যে, বিষয়টি খুব আনন্দপ্রদ নয়। কি শিশু কি বৃদ্ধ কাহারো পক্ষেই মৃত্যুচিন্তায় সময় কাটানো মঙ্গলজনক নয়।

কোন কিছু সম্বন্ধে বিশেষ ভয় ছাড়াও শিশুরা একটা সাধারণ উৎকণ্ঠা বোধ

করিতে পারে। বয়স্ক ব্যক্তিদের অত্যধিক শাসনই মোটামুটিভাবে এজন্য দায়ী। কিন্তু বর্তমানে ইহা অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে।

পদে পদে দোষ ত্রুটি ধরা, গোলমাল করিতে নিষেধ করা, সর্বদা ভদ্র আচরণ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া প্রভৃতি শিশুর জীবন দুঃখময় করিয়া তুলিত। আমার মনে আছে, পাঁচ বৎসর বয়সে আমি শুনিয়াছিলাম যে শৈশবকাল জীবনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুখের কাল (সে যুগে ইহা ছিল নিছক মিথ্যা কথা)। আমি কাঁদিয়া আকুল হইতাম, মনে করিতাম মরিলেই বাঁচি ; অবসাদময় বছরগুলি কিভাবে কাটাইব তাহা ভাবিতেই পারিতাম না। কেহ যে শিশুকে এরূপ বলিতে পারেন বর্তমান যুগে তাহা অচিন্তনীয়।

শিশুরা স্বভাবতই আশাবাদী ; তাহাদের মন আগামী দিনের স্বপ্ন দেখে, ভবিষ্যতের আশায় উৎসাহিত হয়। ইহা শিশুকে কাজে অনুপ্রেরণা দেয়। শিশুর দৃষ্টি যদি পিছন দিকে ফিরাইয়া দেওয়া যায়, যদি বলা হয় যে ভবিষ্যৎ অতীতের চেয়ে বেশী দুঃখপূর্ণ তবে তাহার জীবনের উৎসকেই নির্জীব ও দুর্বল করিয়া ফেলা হয়। অথচ 'বাল্যকাল সুখের সময়' এই ধরণের কথা বলিয়া হৃদয়হীন ভাবপ্রবণ ব্যক্তিরা শিশুদের জীবন বিষাদময় করিয়া তুলিতেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের কথা শিশুদের জীবনে বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। প্রায় সময়েই আমার মনে হইত বয়স্ক ব্যক্তিদের পড়াশুনার চাপ নাই তাহাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই খাইতে পারেন তাঁহারা নিশ্চয়ই খুব সুখী। আমার এই বিশ্বাস ছিল স্বাস্থ্যপ্রদ এবং প্রেরণার উৎসস্বরূপ।

লাজুকতা :

লাজুকতা বড়ই বিব্রতকর ধরনের ভীরুতা। ইহা ইংলণ্ড ও চীনদেশে ব্যাপকভাবে দেখা যায়, অন্যত্র খুব কম। ইহার উৎপত্তির আংশিক কারণ— হয় অপরিচিত লোকের সংস্পর্শে না আসা এবং আংশিক কারণ সামাজিক আদব কায়দার উপর জোর দেওয়া। সুবিধা হইলেই শিশুদিগকে প্রথম বৎসরের পর হইতেই অপরিচিত লোক দেখিতে এবং তাহাদের সান্নিধ্যে আসিতে দেওয়া উচিত। আদব-কায়দা সম্বন্ধে বলা চলে, নিম্নতম যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু শিখানো দরকার, প্রথম অবস্থায়, শিশু অন্যের নিকট অসহনীয়রূপে বিরক্তিকর না হইলেই হইল। শিশুদিগকে অপরিচিত আগন্তুকের সম্মুখে ঘরের মধ্যে শান্তভাবে বসাইয়া না রাখিয়া বরং কিছুক্ষণ নিজের ইচ্ছামত থাকিতে দিয়া পরে অন্যত্র লইয়া যাওয়া উচিত। প্রথম দুই বৎসর শিশুর ছবি, কাদামাটি যন্ত্রপাতি অথবা অন্য কোন খেলার সরঞ্জাম লইয়া দিনের মধ্যে কিছু

সময় নিজের ইচ্ছমত কাটাইতে অভ্যাস করানো ভাল। শিশুকে শান্ত হইয়া থাকিতে বলিলে তাহার এমন কারণ থাকা চাই যাহা সে বুঝিতে পারে। খেলার মত প্রীতিকর অভ্যাসের ভিতর দিয়াই ভদ্র আচরণ শিখানো উচিত; নীরস উপদেশ বা তত্ত্বহিসাবে প্রয়োগ করিলে ইহাতে বিশেষ সুফল পাওয়া যাইবে না।। যখনই শিশুর বুঝিবার ক্ষমতা হইবে সে অনুভব করিবে যে তাহার পিতা-মাতারও অধিকার আছে; সে অন্যকে কাজে স্বাধীনতা দিবে, নিজেও যথাসাধ্য ভোগ করিতে চেষ্টা করিবে। শিশুরা সহজেই ন্যায় বিচার উপলব্ধি করে; অন্যের নিকট হইতে তাহারা যেরূপ আচরণ পাইবে অন্যের প্রতিও তাহারা তদ্রূপ করিতে প্রস্তুত থাকিবে। ইহাই ভদ্র আচরণের মূল।

ভয় নিবারণের উপায়ঃ

সর্বোপরি, আপনি যদি আপনার সন্তানদের ভীতি দূর করিতে ইচ্ছা করেন, আপনি নিজে নির্ভীক হউন। আপনি যদি মেঘগর্জনে ভয় পান, তবে প্রথমবার যখন আপনার শিশু আপনার সম্মুখে থাকিয়া মেঘগর্জন শুনিবে তখনই তাহার মধ্যে ভয় সঞ্চারিত হইবে। আপনি যদি সামাজিক বিপ্লব সম্পর্কে ভীতি প্রকাশ করেন, আপনি কি বিষয়ে বলিতেছেন তাহা বুঝিতে না পারায় আপনার সন্তান আরো বেশী ভীত হইবে। আপনি যদি রোগ সম্বন্ধে শংকিত হন আপনার সন্তান আরো বেশী শংকিত হইবে। জীবন বিঘ্ন-সংকুল কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তি অবশ্যম্ভাবী বিপদকে উপেক্ষা করেন এবং যেগুলি প্রতিরোধ করা সম্ভব সেগুলি সম্বন্ধে বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া অবিচলিতভাবে কাজ করেন। আপনি মৃত্যুর হাত এড়াইতে পারেন না কিন্তু বিমা উইলে মৃত্যুর হাত এড়াইতে পারেন। কাজেই আপনার উইল (দানপত্র) করিয়া ফেলুন তারপর মনে ভুলিয়া যান যে আপনি মরণশীল। বাস্তব দুর্ভাগ্য বা দৈব-দুর্বিপাকের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা ভয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস; ইহা বিজ্ঞতার পরিচায়ক, কিন্তু ভীতি আত্ম-অমর্যাদাকর। আপনি যদি নিজের ভয় দমন করিতে না পারেন তবে চেষ্টা করিবেন যাহাতে আপনার সন্তান ইহা সন্দেহ করিতে না পারে। সর্বোপরি তাহাকে এমন উদার দৃষ্টিভঙ্গী দিবেন এবং তাহার মনে বহুবিচিত্র বিষয়ে এমন জীবন্ত উৎসাহ সঞ্চার করুন যেন সে পরবর্তী জীবনে নিজের ব্যক্তিগত বিপদের আশঙ্কা সম্বন্ধে চিন্তা না করে। কেবল এই উপায়েই আপনি তাহাকে বিশ্বের একজন মুক্ত নাগরিকরূপে গড়িয়া তুলিতে পারেন।

পঞ্চম অধ্যায়

খেলা ও কল্পনা

কি মনুষ্য, কি মনুষ্যতর প্রাণী সকলের সন্তানই খেলা ভালবাসে। মানব-শিশুরা খেলার ভিতর দিয়া নানারূপ ভান করিয়া অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করে। খেলা এবং তাহার ভিতর দিয়া নানা কাজের ভান শিশুর সুখ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, এইরূপ খেলার অন্য কোন উপকারিতার কথা চিন্তা না করিলেও শুধু শিশুর স্বাভাবিক এবং সুস্থভাবে বৃদ্ধির জন্যও ইহা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে দুইটি বিষয় চিন্তা করিবার আছে: প্রথম, শিশুর খেলার সুযোগদানের জন্য পিতামাতা এবং স্কুল কি করিবেন? দ্বিতীয়, খেলার শিক্ষাসম্বন্ধীয় উপকারিতা বৃদ্ধি করিবার জন্য তাঁহাদিগকে কি আরো বেশী কিছু করিতে হইবে?

সূচনায় খেলার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। কার্ল গ্রূস্ এ সম্বন্ধে বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করিয়াছেন; পূর্ব অধ্যায়ে উইলিয়াম স্টার্নের যে পুস্তকের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতেও কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা আছে। এ বিষয়ে দুইটি পৃথক প্রশ্ন আছে প্রথমটি, খেলার মূল উৎস কি, সে সম্পর্কে; দ্বিতীয়টি খেলার দৈহিক বা জৈবিক উপযোগিতা সম্পর্কে। দ্বিতীয় প্রশ্নটি সহজতর। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে পূর্ণ বয়সের প্রাণীদিগকে যে কাজ দৈহিক প্রয়োজনের খাতিরেই করিতে হইবে সকল প্রজাতির (species) শিশুরাই তাহা শৈশবে খেলাচ্ছলে করিয়া থাকে। কুকুর শাবকদের খেলা ঠিক বয়স্ক কুকুরের লড়াইয়ের মতই, কেবল সত্য সত্যই দাঁত বসাইয়া কামড়ায় না এই যা পার্থক্য। বিড়ালছানাদের খেলা বিড়ালের ইঁদুর ধরবার কসরতের অনুরূপ। শিশুরা যাহা দেখে তাহা অনুকরণ করিতে ভালবাসে, যেমন ইট, পাথর, কাঠের টুকরা প্রভৃতি দিয়া বাড়ি তৈয়ার করা কিংবা গর্ত খনন করা। যে কাজ তাহাদের কাছে বেশী আকর্ষণীয় তাহারা সেই কাজই করিতে বেশী পছন্দ করে। যে সব খেলায় শিশুদের মাংসপেশী নূতনভাবে সঞ্চালিত হইবার সুযোগ পায় তাহা তাহাদের নিকট বড়ই আনন্দ দায়ক মনে হয়, যেমন—লাফানো, মই বা খুঁটি বাহিয়া উপরে উঠা, সরু তক্তার উপর দিয়া হাঁটা প্রভৃতি; তবে দেখিতে হইবে একাজ যেন খুব কঠিন না হয়! ইহা যদিও সাধারণভাবে শিশুর (খেলার আবেগের) ক্রীড়া আবেগের উপযোগিতা

প্রমাণ করে, খেলার জন্য তাহার যে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত কামনা থাকে, তাহার সম্পূর্ণ প্রকাশ শুধু ইহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। ইহার মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

কতক মনঃসমীক্ষক শিশুর খেলার ভিতর যৌন প্রতীকতা খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা যে সম্পূর্ণ অলীক সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই। শৈশবে শিশুর কার্যকলাপের মধ্যে প্রবৃত্তি-জাত যৌন আবেগ প্রধান নয়, বয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হওয়ার বাসনা কিংবা আরো খাঁটিভাবে বলিলে বলা যায় যে, শক্তিলাভের বাসনাই তখন থাকে প্রবল। বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে তুলনায় শিশু তাহার দুর্বলতা বুঝিতে পারে; সে মনে মনে তাহাদের সমকক্ষ হওয়ার বাসনা পোষণ করে। আমার ছেলে যখন বুঝিয়াছিল যে সেও একদিন বয়স্কব্যক্তি হইবে এবং আমি নিজেও একদিন তাহার মতই ছোট ছিলাম তখন সে অত্যন্ত সুখী হইয়াছিল। কৃতকার্য হওয়া যাইবে এই আশ্বাস মানুষের উত্তম বৃদ্ধি করে। শিশুদের অনুকরণের অভ্যাস হইতেই দেখা যায় বয়স্ক ব্যক্তিরা যাহা করে শিশুরাও তাহা করিতে চায়; শিশুদের কাজে প্রেরণা যোগানে বড় ভাইবোনেরা খুব সাহায্য করে; তাহাদের উদ্দেশ্য কি তাহা শিশুরা সহজে বুঝিতে পারে এবং তাহাদের শক্তিও বয়স্ক লোকের দৈহিক শক্তির মত বেশী নয় বলিয়া শিশুদের নাগালের সম্পূর্ণ বাহিরে নয়। বয়স্ক লোকের সঙ্গে তুলনায় শিশু নিজেকে যতখানি হীন মনে করে তাহার বড় ভাইবোনের সঙ্গে তুলনা করিয়া ততখানি ছোট মনে করে না। শিশুদের মধ্যে স্বভাবতই হীনতাবোধ খুব বেশী; তাহারা যদি স্বাস্থ্যবান হয় এবং উপযুক্ত ভাবে শিক্ষা পায় তবে এই হীনতাবোধ তাহাদিগকে চেষ্টায় প্রেরণা দেয়, তাহারা শক্তিমান হইয়া বয়স্কদের সমান হইতে চায় কিন্তু তাহাদিগেকে যদি দমন করিয়া রাখা হয় তবে তাহাদের মানসিক অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

খেলার ভিতর আমরা দুই প্রকারে শিশুর শক্তি অর্জনের বাসনার প্রকাশ (দুইটি স্বরূপ) দেখিতে পাই: প্রথম, কোন কাজ শিখিবার চেষ্টায়; দ্বিতীয়, ভান বা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণে। যৌনজীবনে ব্যর্থকাম হতাশ যুবক তাহার মনের কামনাগুলি পরিতৃপ্ত করিবার জন্য অনেক সময় জাগর স্বপ্নের আশ্রয় নেয়; বাস্তব জীবনে যাহা পায় না, কল্পনায় তাহাই উপভোগ করিতে আনন্দ পায়। তেমনি স্বাভাবিক সুস্থ শিশু খেলার ভিতর দিয়া এমন ভান করিতে ভালবাসে যাহাতে সে নিজের দৈহিক শক্তির পরিচয় দিতে পারে। সে দৈত্য, সিংহ কিম্বা রেলগাড়ি হইতে চায়, সে এমন প্রাণী সাজিতে চায় বা এমন জিনিসের ভান করা পছন্দ করে যাহাতে অন্যের মনে ভয়ের সঞ্চার করিতে পারে।

আমি পুত্রকে দানব নিধনকারী জ্যাকের গল্প বলিয়া তাহাকে জ্যাক সাজিতে বলিলাম কিন্তু সে দানব হওয়ার জন্যই ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

সে যখন তাহার মায়ের নিকট ব্লু-বিয়ার্ডের গল্প শোনে তখন ব্লু-বিয়ার্ড হওয়ার জন্যই সে পীড়াপীড়ি করিতে থাকে এবং বলে যে অবাধ্য হওয়ার জন্য তাহার স্ত্রীকে শাস্তি দেওয়া ঠিক কাজই হইয়াছে। ব্লু-বিয়ার্ডের ভান করিয়া খেলার সময় সে মহিলাদের মাথা কাটিয়া ফেলে। ফ্রয়েডবাদী মনস্তাত্ত্বিকগণ হয়ত বলিবেন—স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার করার বাসনা শিশুর মনে লুকাইয়া রহিয়াছে। কামজ প্রেমের বিকৃত অবস্থায় এই প্রকার ধর্ষকাম অর্থাৎ প্রীতির বিপরীত ভাব, নিষ্ঠুরতা দেখা দেয়। মহিলাদিগকে শাস্তি দেওয়ার বাসনা শিশুর ধর্ষকামের পরিচায়ক। কিন্তু সে শুধু মহিলাদিগের মাথা কাটিতেই আনন্দ পায় নাই ছোট ছোট বালকদিগকে খাইয়া ফেলিয়াছিল যে দৈত্য সেরূপ দৈত্য সাজিতে কিংবা ভারী ওজনের জিনিষ টানিয়া লইয়া যাইতে পারে এমন এঞ্জিন সাজিতেও অনুরূপ আনন্দলাভ করিয়াছে। এইসব ভান-ক্রীড়ার মধ্যে শক্তিমান হওয়ার, দৈহিক ক্ষমতার পরিচয় দেওয়ার বাসনাই ছিল, যৌনবাসনার কোনপ্রকার প্রকাশ ছিল না। একদিন বেড়াইয়া ফিরিবার পথে গল্পচ্ছলে কৌতুক করিয়া ছেলেকে বলিয়াছিলাম, হয়ত বাড়ি গিয়া দেখিব যে টিডলিউইংক্স নামে এক অপরিচিত ভদ্রলোক আমাদের বাড়ি দখল করিয়া বসিয়াছেন, তিনি হয়ত আমাদিগকে বাড়িতে ঢুকিতেই দিবেন না। ইহার পর অনেক দিন পর্যন্ত আমার ছেলে বাড়িতে ঢুকিবার পথের দেওয়ালের উপর দাঁড়াইয়া মিঃ টিডলি-উইংক্স সাজিয়া আমাকে অন্য বাড়িতে যাইতে আদেশ করিত। এই খেলায় তাহার আনন্দের সীমা থাকিত না। এইভাবে যে সে শক্তির পরিচয় দেওয়ার ভান করিত তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়।

যাহা হউক শক্তিমান হওয়ার বাসনাই যে শিশুর খেলার প্রেরণা যোগাইবার একমাত্র উৎস তাহা অনুমান করিলে বিষয়টি অযথাভাবে সহজ করিয়া দেখা হইবে। ইহার মূলে আরো অন্য কারণ আছে। শিশুরা ভয় পাওয়ার ভান করিতে আমোদ পায়, ইহার কারণ বোধ হয় এই যে ইহা যে ভান, সত্য নয় এই জ্ঞান তাহাদের নিরাপত্তার বোধ বৃদ্ধি করে। সময় সময় আমি কুমীরের ভান করিয়া ছেলেকে খাইতে আসি। সে এমন স্বাভাবিকভাবে চীৎকার করিয়া উঠে যে, সে সত্যই ভয় পাইয়াছে, মনে করিয়া আমি থামিয়া যাই, কিন্তু আমি থামা মাত্রই সে বলিয়া উঠে, বাবা আবার কুমীর হও। নাটক অভিনয়েও এই ভান আনন্দ দেয়; ইহার জন্যই বয়স্ক ব্যক্তিরা উপন্যাস ও নাটক অভিনয় পছন্দ করেন। আমার মনে হয় এ সকলের মধ্যে কৌতূহলের বিশেষ স্থান আছে:

ভালুক সাজিয়া শিশু ভালুক সম্বন্ধে কিছু কিছু শিখিল মনে করে, যেমন ভালুক কেমন করিয়া হাঁটে, কেমন শব্দ করে, কেমন পোষ মানে ও নাচে ইত্যাদি। আমি মনে করি যে শিশুর জীবনের প্রত্যেকটি প্রবল আবেগ তাহার খেলার ভিতর প্রতিফলিত হয়। ক্ষমতা বা শক্তি শিশুর বাসনার মধ্যে যেরূপ প্রাধান্যলাভ করে তাহার খেলার ভিতরেও সেই পরিমাণে তাহার প্রাধান্য প্রকাশ পায়। ক্ষমতার প্রতি যদি তাহার ঝোঁক বেশী থাকে তবে খেলায় সে এরূপ ভানই ভালবাসিবে যাহাতে সে নিজেকে শক্তিশালী বলিয়া মনে করিতে পারে। এইভাবেই তাহার বাসনা কতকটা তৃপ্তি লাভ করে।

খেলার শিক্ষামূল্য কি, শিশুর শিক্ষাদান ব্যাপারে খেলা কতখানি সাহায্য করে সে বিষয় আলোচনা করিলে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, যে-খেলার ভিতর দিয়া শিশু নূতন প্রবণতা ও কৌশল আয়ত্ত করে তাহা উপকারী ও প্রশংসনীয়। কিন্তু আধুনিক কালের অনেকে ভান বা কল্পনা অবলম্বনে শিশু যে খেলা করে তাহার শিক্ষামূল্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। বয়স্ক যুবক যখন মনের রুদ্ধ কামনাগুলির তৃপ্তির জন্য জাগর স্বপ্নে অর্থাৎ রঙিন কল্পনা-বিলাসে মগ্ন হয়, তখন ইহাকে একপ্রকার মানসিক রোগ বলিয়া অভিহিত করা যায়। মনের বাসনাকে কার্যে রূপান্তরিত করার পরিবর্তে জাগর স্বপ্নবিলাসী নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিয়া কল্পনায় বাসনার সার্থকতা আস্বাদ করিতে চায়। এই প্রকার অলস কল্পনাবিলাস কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। ইহার উপর সাধারণ মানুষের যে বিরূপ ভাব আছে তাহা ভুলক্রমে শিশুর কল্পনাবিলাসের উপরও গিয়া পড়িয়াছে। শিশুরা যে তাহাদের খেলার সরঞ্জামগুলি রেলগাড়ি বা ষ্টীমার বা অন্য কোন কিছু বলিয়া কল্পনা করিয়া লইবে মন্তেসরি বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাহা পছন্দ করেন না। তাঁহারা ইহাকে বলেন বিশৃঙ্খল কল্পনা। তাঁহাদের অভিমত সম্পূর্ণ সত্য, কেননা শিশুরা এভাবে প্রকৃতই কোন খেলায় মগ্ন হইতেছে না। এমন কি শিশুদের নিজেদের নিকটও ইহা পূর্ণাঙ্গ খেলা বলিয়া মনে হয় না। মন্তেসরি সরঞ্জাম শিশুকে আনন্দ দেয়, এ সরঞ্জামের উদ্দেশ্য শিশুকে শিক্ষা দেওয়া; এখানে আনন্দ শিক্ষাদানের একটি উপায় মাত্র। কিন্তু প্রকৃত খেলায় আনন্দ লাভই প্রধান উদ্দেশ্য। কাজেই মন্তেসরি বিদ্যালয়ের শিক্ষা সরঞ্জাম লইয়া খেলা ও প্রকৃত খেলা সম্পূর্ণ একপ্রকার নয়। বিশৃঙ্খল কল্পনা সম্বন্ধে যে আপত্তির সঙ্গত কারণ আছে তাহাই যদি আসল খেলার বিরুদ্ধে ও প্রয়োগ করা হয় তবে ইহা একটু বাড়াবাড়ি হইবে। শিশুকে পরী, দৈত্য, ডাইনী যাদুভরা কার্পেট প্রভৃতি অবাস্তব বিষয়ের গল্প শুনাইতে যাঁহারা আপত্তি

করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে একথা বলা যায় যে শিশুকে সত্য ও বাস্তবের উপর গড়িয়া তুলিতে গিয়া তাঁহারা বাড়াবাড়ি করিতেছেন। এই ধরণের সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির সহিত আমি একমত হইতে পারি না। এরূপ বলা হয় যে শিশুরা বাস্তব এবং বাস্তবের ভানের মধ্যে কোন পার্থক্য করিতে পারে না কিন্তু ইহা বিশ্বাস করার কোন কারণ আমি দেখি না। বাস্তব জগতে কখনো হ্যামলেট ছিল বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু যখন আমরা হ্যামলেট নাটকের অভিনয় দেখিতেছি তখন যদি কেহ সর্বদা বলিতে থাকে যে এ কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক তখন আমরা বিরক্ত না হইয়া পারি না। সেইরূপ শিশু যখন কোন কিছুর ভান করিয়া খেলায় আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে তখন ইহাকে কখনই সত্য বলিয়া গ্রহণ করে না কিন্তু কেহ যদি তাহাকে সর্বদা স্মরণ করাইয়া দেয় যে ইহা নিছক মিথ্যা তবে সে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করে।

সত্য এবং কল্পনা উভয়ই প্রয়োজনীয় কিন্তু জাতির ইতিহাসে যেমন, ব্যক্তির জীবনেও তেমনি, কল্পনার স্ফুরণই হয় প্রথমে। যতদিন শিশুর স্বাস্থ্য সবল এবং স্বাভাবিক থাকে ততদিন সে বাস্তব সত্য অপেক্ষা খেলাতেই বেশী আনন্দ পায়। খেলার সময় সে যেন রাজা: বাস্তবিক সে নিজের কল্পনারাজ্যে জাগতিক রাজার চেয়েও বেশী ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া রাজত্ব করিয়া থাকে। বাস্তবে তাহাকে নির্দিষ্ট সময়ে শুইতে হয়, কত রকম আদেশ, হুকুম পালন করিতে হয়, উপদেশ অনুসারে কাজ করিতে হয়। কঠোর কল্পনাবিহীন বয়স্ক ব্যক্তিরা যখন শিশুর এই কল্পনাবিলাসে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে তখন সে অত্যন্ত রুষ্ট হয়। সে হয়ত একটি দেওয়াল তৈয়ারি করিয়াছে এবং কল্পনা করিয়াছে যে সেটি এত উঁচু যে সবচেয়ে বড় দৈত্যও তাহা ডিঙাইতে পারে না; আপনি যদি তাহা ডিঙাইয়া গিয়া হেলায় তাহার কল্পনা তুচ্ছ করিয়া দেন তবে সে আপনার উপর বিরক্ত হইবেই। বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে তুলনায় শিশুর হীনতা বোধ একান্তই স্বাভাবিক; ইহা মানসিক রোগের লক্ষণ নয়। তেমনি কল্পনায় এই হীনতা দূর করিয়া নিজের শক্তির পরিচয় দেওয়ার কামনা শিশুর পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক ইহা কোনরূপ মনোবিকারের লক্ষণ নয়। খেলায় যে সময় ব্যয়িত হয় তাহা অন্য কোন প্রকারে ইহার চেয়ে সার্থকতরভাবে নিয়োজিত হইতে পারে না, সব সময়ই যদি শিশুকে গুরুতর কাজকর্মে ব্যাপৃত রাখার ব্যবস্থা হয় তবে অচিরেই তাহার স্নায়ু বিকল হইয়া পড়িবে, সে হইবে অসুখী এবং অপদার্থ। যে বয়স্ক ব্যক্তি জাগর স্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকে তাহাকে কাজে প্রবৃত্ত হইয়া মনের বদ্ধ ভাবগুলিকে বাস্তবে পরিণত করিতে উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু শিশুর পক্ষে এ উপদেশ নিরর্থক,

কেনন। ইচ্ছাকে বাস্তব রূপ দিবার দৈহিক ও বুদ্ধিগত সামর্থ ও কৌশল তাহার কাছে আশা করা যায় না। কল্পনা তাহার নিকট বাস্তবের স্থায়ী পরিবর্ত (Substitute) নয়, চিরদিন সে কল্পনা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে প্রস্তুত নয়, উপযুক্ত সময় হইলে সে বরং তাহার কামনাকে বাস্তবে পরিণত করার আশাই মনে পোষণ করে।

সত্য ও কঠোর বাস্তবকে একত্রে মিশাইয়া তাল পাকাইয়া ফেলা একটা মারাত্মক ভুল। আমাদের জীবন কেবল বাস্তব ঘটনা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় না, জীবন গঠনে আশারও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। সত্য বলিতে গিয়া যদি বাস্তব ঘটনা ছাড়া আর কিছু না বুঝায় তবে এরূপ সত্যনিষ্ঠা মানব মনের পক্ষে কারাগারস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। কল্পনা যদি মনের বাসনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার পরিবর্তে কেবল অলস স্বপ্নেই পর্যবসিত থাকে কেবল তখনই তাহা নিরুৎসাহ করা উচিত, কিন্তু কল্পনা যখন কাজের প্রেরণা যোগায় তখন ইহা মানুষের আদর্শগুলিতে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিতেই সাহায্য করে। শৈশবে কল্পনাকে পিষিয়া মারিয়া ফেলিলে মানুষ বস্তুতান্ত্রিকতার দাসরূপে পরিণত হয়, মাটির পৃথিবীর বাস্তব দীনতা, হীনতা, তুচ্ছতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে আবদ্ধ থাকিয়া সে ভাবের স্বর্গলোক সৃষ্টি করিতে পারে না। আপনি হয়ত বলিবেন এ সবই উত্তম কিন্তু শিশু ভক্ষণকারী দৈত্যের সঙ্গে অথবা স্ত্রীহত্যা-কারী ব্লু বিয়ার্ডের সঙ্গে ইহার কি সম্বন্ধ? আপনার স্বর্গে কি এসব থাকিবে? কল্পনা যাহাতে সত্যই কোন ভাল কাজে লাগে সেজন্য কি ইহা বিশুদ্ধ ও উন্নত ধরণের করিতে হইবে না? আপনি তো একজন শান্তিবাদী কিন্তু আপনার নির্দোষ শিশু মানুষ হত্যার চিন্তায় আনন্দ পাইবে ইহা কি আপনি সমর্থন করিবেন? মানুষ আদিম প্রবৃত্তিগত বর্বরতার স্তর পার হইয়া আসুক ইহাই কাম্য, কিন্তু নিষ্ঠুরতাব চিন্তায় শিশু যে আনন্দলাভ করে তাহা আপনি কিভাবে সমর্থন করিবেন? পাঠক হয়ত এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, কেন আমি এ বিষয়ে পৃথক অভিমত পোষণ করি তাহাই বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

প্রবৃত্তিগুলি দমন করিয়া রাখিলেই শিক্ষাদান সম্পূর্ণ হইল না, এগুলির যথাযথ বৃদ্ধি এবং মঙ্গলজনক কাজে নিয়োগ করিতেই শিক্ষার সার্থকতা। মানব প্রবৃত্তিগুলি বড়ই অস্পষ্ট, ইহারা কোন নির্দিষ্ট আকারে কোন নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হয় না, নানাভাবে ইহাদের তৃপ্তিসাধন করা যায়। বেশীর ভাগ প্রবৃত্তিরই পরিতৃপ্তির জন্য কোন প্রকার কৌশল আবশ্যক। ক্রিকেট এবং বেস্‌বল একই প্রবৃত্তিকে তৃপ্ত করে কিন্তু বালক যে খেলাটি জানে সেইটিই

খেলিবে। বালকের ক্রীড়াপ্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধনের জন্য শুধু যে একই নির্দিষ্ট প্রকার খেলার কৌশল আয়ত্ত করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। কাজেই চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার মূল সূত্র হইল মানুষকে এমন কৌশল আয়ত্ত করানো যাহাতে সে তাহার প্রবৃত্তিগুলিকে ব্যবহারিক প্রয়োজনে লাগাইতে পারে। শক্তিমান হওয়ার যে বাসনা তৃপ্ত করিবার জন্য শিশু কল্পনায় অত্যাচারী, নিষ্ঠুর, ব্লু-বিয়ার্ড সাজিয়া নিজের ক্ষমতার পরিচয় দেয়, পরবর্তীকালে সেই বাসনাই পরিতৃপ্তির জন্য অন্য পথ খোঁজে, শৈশবের সেই ক্ষমতাকামী কল্পনাপ্রবণ কামনা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, শিল্প সৃষ্টি, শিক্ষার ভিতর দিয়া উন্নত প্রকৃতির মানুষ সৃষ্টি প্রভৃতি অসংখ্য রকমের উৎকৃষ্ট কাজের মধ্যে সার্থকতা লাভ করে। কোন লোক যদি কেমন করিয়া যুদ্ধ করিতে হয় কেবল তাহাই জানে তবে যুদ্ধই হইবে তাহার আনন্দের বিষয়। কিন্তু যদি অন্যান্য বিষয়েও তাহার নিপুণতা থাকে তবে আরও অনেক উপায়ে তাহার বাসনা চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে। যদি তাহার শক্তিলাভের বাসনা শৈশবেই বিনাশ করিয়া ফেলা হয় তবে সে হইবে উদ্দেশ্যবিহীন এবং অলস, ভাল বা মন্দ কোনপ্রকার কাজ করার ক্ষমতাই তাহার থাকিবে না। এই রকম নিরীহ, নির্বীর্য নিষ্ক্রিয় ভাল মানুষ দ্বারা জগতের কোন উপকার হয় না, আমাদের শিশুদিগকে আমরা এইভাবে মেরুদণ্ডহীন প্রাণীতে পরিণত করিতে চাই না। বাল্যকালে শিশুরা বর্বরতার প্রতি আকৃষ্ট হয়, কল্পনায় তাহারা অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার অভিনয় করিতে ভালবাসে, দৈহিক বিক্রমের প্রকাশ তাহাদের নিকট আনন্দদায়ক। শিশুর ক্রমবিকাশের পক্ষে এরূপ আচরণ তাহার জৈবিক প্রয়োজন বলিয়া গণ্য করা হয়। ক্রমবিবর্তনের ফলে আদিম হিংস্র বর্বর মানব বর্তমানের সভ্য মানবে রূপান্তরিত হইয়াছে। বয়স্ক সভ্য মানুষ তাহার আদিম পূর্বপুরুষের আচরণ অনুসরণ করে না, করিলে সভ্য সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারিত না, পৃথিবী নররূপী হিংস্র পশুর আবাসে পরিণত হইত। মানব-শিশু তাহার জীবনের প্রথম কয়েক বৎসর কল্পনা ও আচরণের ভিতর দিয়া আদিম মানুষের জীবনস্তর পার হইয়া আসে। এই সময় তাহারা থাকে ছোট, তাহাদের ক্ষতি করার সামর্থও থাকে কম, কাজেই বর্বর আদি মানবের অভিনয় করিলেও তাহারা সমাজের কোন অপকার করিতে পারে না। তাহাদের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য উন্নততর কোন কৌশল আয়ত্ত করিতে পারিলে তাহারা বর্বরের স্তরে থাকিয়া যাইবে না। অতএব বাল্যে যেরূপ কল্পনায় তাহারা আনন্দ অনুভব করে পরবর্তীকালেও যে তাহারা সেই কল্পনাকেই বাস্তবে রূপ দিতে চাহিবে এমন আশংকার কোন কারণ নাই।

বাল্যকালে ডিগবাজি খাইতে আমি খুব আনন্দ বোধ করিতাম। একাজ যদিও খারাপ মনে হয় না তবু আমি আর এখন ডিগবাজি খাই না। সেইরূপ যে শিশু এখন ব্লু-বিয়ার্ড সাজিতে ভালবাসে পরে রুচির পরিবর্তন ঘটিলে সে অন্য উপায়ে তাহার কামনা তৃপ্ত করিবে। বাল্যকালে শিশুর দেহ মনের উপযোগী উদ্দীপকের (Stimuli) সাহায্যে যদি তাহার কল্পনা সরস ও সজীব রাখা হয়, তবে সেই শিশু যখন বয়স্ক মানুষে পরিণত হইবে তখন তাহার কল্পনা বয়স্ক ব্যক্তির আশা আকাঙ্ক্ষা ও নানা প্রবৃত্তিকে বাস্তবরূপ দিতে সাহায্য করিবে। শৈশবে শিশুর মনে নৈতিক ভাব বা আদর্শ প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করা বৃথা; ইহাতে তাহাদের কোন সাড়া পাওয়া যাইবে না; ঐ বয়সে তাহাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এরূপ নৈতিক উপদেশের কোন প্রয়োজনও নাই। এরূপ করিলে শিশুর মনে আসিবে অবসাদ এবং ফল হইবে যে, যে-বয়সে শিশু এই ভাব গ্রহণে সক্ষম হইত তখনও সে উহা গ্রহণ করিতে বিন্দু-মাত্র আগ্রহ দেখাইবে না। অপ্রবেশ্য শিলায় জল জমিলে তাহা যেমন চুয়াইয়া নীচে নামে না শিশুর মনেও তেমনি নৈতিক ভাব গ্রহণের বিরুদ্ধে একটি শক্ত স্তর গঠিত হইবে। ভিন্ন ভিন্ন বয়সে শিশুর মনের গতি-প্রকৃতি কেমন থাকে তাহা প্রত্যেক পিতামাতা এবং শিক্ষকের জানা দরকার। এজন্যই শিশু মনস্তত্ত্ব শিক্ষাক্ষেত্রে এতখানি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য করা হয়।

শৈশবের খেলার সঙ্গে পরবর্তীকালের খেলার পার্থক্য এই যে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খেলাও ক্রমে বেশী প্রতিযোগিতামূলক হইয়া উঠে। প্রথমে শিশু একা একা নির্জনে খেলিতে ভালবাসে; বড় ভাইবোনের সঙ্গে মিলিয়া খেলিবার সামর্থ তখন তাহার থাকে না। কিন্তু সে যখন অন্যের সঙ্গে একত্রে খেলিলে আনন্দ পায় তখন একাকী খেলা আর তাহার নিকট পছন্দ হয় না। ইংরেজ অভিজাত সম্প্রদায় স্কুলের খেলাধূলার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। যদিও খেলার কতকগুলি উপকারিতা আছে তবুও আমার মনে হয় ইংরেজরা ক্রীড়াকৌশলকে যেরূপ প্রাধান্য দিয়াছে তাহাতে যেন কিঞ্চিৎ আতিশয্য ঘটিয়াছে। খেলাধূলায় যদি চরম উৎকর্ষের দিকে ঝোঁক দেওয়া না হয় তবে ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী সন্দেহ নাই। যদি খেলায় নিপুণতা প্রদর্শনই উদ্দেশ্য হয় তবে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়গণ বাড়াবাড়ি করে এবং অপর সকলে দর্শকে পরিণত হয়। যাহারা ভাল খেলা জানেন্তাহারা আরো উৎকর্ষ লাভ করিবার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করে, সাধারণখেলোয়াড়গণপ্রতিযোগিতাহইতে দূরে সরিয়া শুধু অপরের ক্রীড়া-কৌশল দেখে তাহাদের নিজেদের স্বাস্থ্যচর্চা আশানুরূপ হয় না। খেলার একটি গুণ এই যে ইহা বালকবালিকাদিগকে

হৈ-চৈ না করিয়া আঘাত সহ্য করিতে এবং প্রফুল্লচিত্তে কঠোর পরিশ্রম করিতে শিক্ষা দেয়। খেলার অন্যান্য উপকারিতা সম্বন্ধে যাহা বলা হয় তাহার বেশীর ভাগই আমার কাছে কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়। বলা হয় যে, খেলা সহযোগিতা শিক্ষা দেয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বালকবালিকা উহা প্রতিযোগিতার আকারেই শিক্ষা করে। এই ধরণের প্রতিযোগিতা শিল্পে বা যথাযথ রূপ সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নয়, ইহার প্রয়োজন যুদ্ধে। বিজ্ঞানের কল্যাণে অর্থনীতিতে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রতিযোগিতার স্থান গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছে, বিজ্ঞানের কল্যাণেই প্রতিযোগিতা (যেমন যুদ্ধবিগ্রহ) পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছে। সেজন্য যে প্রতিযোগিতামূলক কার্যকল্যাপে মানুষে মানুষে সংঘাত বাঁধে, যাহাতে একদল মানুষ হয় জয়ী, অপর দল হয় পরাজিত তাহার পরিবর্তে এমন সহযোগিতামূলক কর্ম প্রচেষ্টায় উৎসাহ দেওয়া উচিত যাহাতে সেখানে বহিপ্রকৃতিকে "শত্রু" বলিয়া গণ্য করিয়া মানুষ তাহার উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারে। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা না করিয়া পরস্পরের সহযোগিতায় মানুষ প্রকৃতিকে জয় করিতে যত্নবান হউক ইহাই কাম্য। এই বিষয়ের উপর আর বেশী গুরুত্ব দিতে চাই না, কেননা প্রতিযোগিতার মনোভাব মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক এবং ইহা প্রকাশের কোন পথও থাকা দরকার ; আর খেলাধূলায় ও দেহচর্চায় দ্বন্দ্বের মত নির্দোষ প্রতিযোগিতাও বিশেষ কিছু নাই। খেলা বন্ধ না করার পক্ষে ইহা যুক্তিপূর্ণ কারণ সন্দেহ নাই কিন্তু এই কারণে স্কুলের পাঠ্যতালিকায় ইহাকে প্রধান স্থান দেওয়া সমর্থনযোগ্য নয়। বালকেরা খেলা পছন্দ করে, কাজেই তাহাদিগকে খেলিতে দেওয়া উচিত ; জাপানীরা যাহাকে বলে 'বিপজ্জনক চিন্তা' তাহা হইতে বালকদিগকে মুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে বিপজ্জনক চিন্তার প্রতিশোধক রূপে কর্তৃপক্ষ দ্বারা খেলার প্রবর্তন ও প্রয়োগ সমর্থন করা চলে না।

পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে ভয়কে জয় করা এবং সাহস প্রদর্শনের উপযোগিতা আলোচনা করা হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে সাহসএবং নির্দয়তা (brutality) এক জিনিস নয়। একজনের ইচ্ছা জোর করিয়া অন্যের উপর চাপাইয়া যে আনন্দ তাহাই নির্দয়তা; ব্যক্তিগত বিপদ উপেক্ষা করার মধ্যে দেখা যায় সাহস। সুযোগ পাওয়া গেলে আমি বালকবালিকাদিগকে ঝড়ের মধ্যে সমুদ্রে ছোট জাহাজ চালানো, উচ্চস্থান হইতে জলে ঝাঁপানো, মোটর গাড়ি চালানো, এমন কি বিমান চালনা শিক্ষা দিতে চাই। আউণ্ডলের (Sanderson of Oundle) স্যাণ্ডারসন যেমন করিয়াছিলেন আমিও তেমনি কিশোরকিশোরীকে যন্ত্র

তৈয়ার করিতে এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বিপদের সম্মুখীন হইতে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী। যতদূর সম্ভব খেলাধূলায় জড় প্রকৃতিকে আমি মানুষের প্রতিপক্ষরূপে বিবেচনা করিতে চাই ; জড় প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্বেও বালকের ক্ষমতালাভের বাসনা পরিতৃপ্ত হইবে, যেমন হয় অপর মানুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। এই উপায়ে যে কৌশল অধিগত হয় তাহা ফুটবল বা ক্রিকেট খেলার কৌশলের চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় এবং যে চরিত্র গঠিত হয় তাহা সামাজিক নীতির সহিত বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ। নৈতিক গুণগুলি ছাড়াও দেহচর্চ্চার উপর অতিরিক্ত ঝোঁক দেওয়ার ফলে বুদ্ধিবৃত্তি ম্লান হইয়া পড়ে। মূর্খতা হেতু এবং কর্তৃপক্ষ বুদ্ধির বেশী মূল্য দেন না কিম্বা ইহা বিকাশের উপর গুরুত্ব দেন না এজন্য গ্রেটব্রিটেন শিল্পজগতে তাহার অধিকার হারাইতেছে, হয়ত সাম্রাজ্যও হারাইবে। এই সবই খেলাধূলার উপকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অতিরিক্ত গোঁড়া বিশ্বাসের ফল। ইহার আরো গভীরতর দিক আছে : বর্তমানের জটিল সমস্যাসঙ্কুল জগৎকে বুঝিতে হইলে জ্ঞান এবং চিন্তার বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু খেলাধূলার যোগ্যতাই কোন যুবকের গুণপনার একমাত্র মাপকাঠি, এই বিশ্বাস যেখানে প্রবল সেখানে বুঝিতে হইবে যে বর্তমান জগতের মানুষের কোন্ কোন্ গুণ বেশী দরকারী তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। এই বিষয়টি পরে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইবে।

স্কুলের খেলাধূলার আরও একটি দিক আছে ; সাধারণতঃ এটি ভাল বলিয়াই বিবেচিত হয় কিন্তু আমার মতে ইহার ফল মোটের উপর ভাল নয়। খেলার ভিতর দিয়া সংঘ-প্রীতি বা দলের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করার কথাই এখানে বলিতেছি। কর্তৃপক্ষ এই সংঘ-প্রীতি পছন্দ করেন, কেনন৷ ইহার সাহায্যে খারাপ উদ্দেশ্যকেও তথাকথিত ভাল কাজে লাগানো যায়। ছাত্রদের কাজে উৎসাহ দিতে হইলে অন্য এক দলকে প্রতিযোগিতায় পরাভূত করার বাসনা জাগাইয়া তুলিলেই কাজেই সহজ হয়। ইহার অসুবিধা হইল এই যে, যাহাতে প্রতিযোগিতা নাই সেরূপ কাজে উদ্যম আসে না। আমাদের সকল কাজেই প্রতিযোগিতার মনোভাব কতদূর প্রসারিত হইয়াছে তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। আপনি যদি আপনার নিজের জেলার শিক্ষা মঙ্গল সমিতির সেবাকার্য আরো ভাল করিতে চান আপনাকে উল্লেখ করিতে হইবে যে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে শিশু-মৃত্যুর হার অনেক কম। কোন শিল্পোৎপাদনকারীকে যদি কোন নূতন প্রকৃত পন্থা গ্রহণ করিতে বলেন তবে আপনাকে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ইহা দ্বারা কিরূপ সুবিধা হইবে তাহা দেখাইয়া দিতে হইবে।

প্রতিযোগিতা ভিন্ন কোন নির্মাণ ক্ষমতার বা গঠন কৌশলের উন্নতির চেষ্টা হয় না; অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতার চিন্তা বাদ দিয়া লোকে কেবল উন্নতির জন্যই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয় না। আমাদের স্কুলের খেলাধূলার চেয়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গেই ইহার বেশী সম্বন্ধ। কিন্তু বর্তমানে স্কুলে অনুষ্ঠিত খেলাধূলার মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। যদি প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহ-যোগিতার মনোভাব প্রবর্তন করিতে হয় তবে স্কুলের খেলাধূলায় এর পরিবর্তন আবশ্যক হইবে। এবিষয়ে বিশদ আলোচনা করিতে হইলে আমাদের নির্ধারিত বিষয়বস্তু ছাড়া অন্যবিষয়ের অবতারণা করিতে হয়। আমরা এখানে ভাল রাষ্ট্র গঠনের বিষয় আলোচনা করিতেছি না, বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিতরেই ভাল নাগরিক সৃষ্টি করার উপায়ই এ পুস্তকের আলোচ্য বিষয়। নাগরিকের ব্যক্তিগত উন্নতি এবং সমাজের উন্নতি পাশাপাশি চলা উচিত কিন্তু শিক্ষা-প্রসঙ্গের লেখকের নিকট ব্যক্তি ও তাহার যথোপযুক্ত বিকাশ সাধনই প্রধান।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সৃজন কার্য

খেলার আলোচনা প্রসঙ্গে এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। এখন কিঞ্চিৎ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।

আমরা দেখিয়াছি, শিশুদের প্রবৃত্তিজাত বাসনাগুলি প্রথমে কোন নির্দিষ্ট আকারে থাকে না; শিক্ষা এবং সুযোগ তাহাদিগকে বিভিন্ন আকার দিয়া বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে। 'আদি পাপ' সম্বন্ধে পুরাতন ধারণা কিম্বা স্বভাবতই শিশু নিষ্পাপ এবং সকল গুণের আধার বলিয়া রুশোর বিশ্বাস—ইহার কোনটিই সত্য নয়। [কতক লোকের ধারণা ছিল, শিশু মানুষের পাপ হইতে জাত, তাহার ভিতরেও পাপের বীজ রহিয়াছে এবং কালক্রমে তাহা বিকাশ লাভ করিবে; পাপ হইতে যাহা জাত তাহা কখনই আপনা আপনি ভাল হইতে পারে না। রুশো ঠিক ইহার বিপরীত বিশ্বাস প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে শিশু নিষ্কলুষ এবং সকল গুণের সম্ভাবনা তাহার মধ্যে সুপ্ত রহিয়াছে।] কাঁচা মালের মত শিশুর প্রবৃত্তি নিরপেক্ষ থাকে; পরিবেশের প্রভাবে ইহা ভাল বা মন্দ আকার গ্রহণ করে। এরূপ বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে কতকগুলি অস্বাভাবিক ক্ষেত্র ছাড়া অধিকাংশ লোকের প্রবৃত্তিগুলি এমন থাকে যে তাহাদিগকে ভালর দিকেই বিকশিত করা যায়; শিশুর অল্পবয়স হইতেই যদি তাহার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন লওয়া যায় তবে মনোরোগীর সংখ্যা খুব অল্পই হইবে। উপযুক্ত শিক্ষার ফলে মানুষ তাহার প্রবৃত্তি অনুসারে আচরণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে; প্রবৃত্তি হইতে শিশু অমার্জিত, নির্দিষ্ট আকারবিহীন, উদ্দাম প্রবৃত্তি লাভ করে। শিক্ষার ফলে ইহাই হয় সুসংযত, সুষ্ঠুভাবে বিকশিত। আদিম ও অসংস্কৃত প্রবৃত্তি দ্বারা নয়, উপযুক্ত শিক্ষার ফলে মানুষের প্রবৃত্তি যখন সুনিয়ন্ত্রিত হয় তখনই ইহা দ্বারা পরিচালিত হইয়া সে ভদ্রভাবে জীবন যাপন করিতে পারে। কোন বিষয়ে দক্ষতা বা কৌশল মানুষের প্রবৃত্তিকে সুনির্দিষ্টভাবে বিকশিত করার একটি প্রধান উপায় এই কৌশল কোন নির্দিষ্ট প্রকারের তৃপ্তিদান করে; মানুষকে কোন যথাযথ রকমের কৌশল শিখাইলে কিম্বা কোন প্রকার কৌশলই না শিখাইলে সে হইবে পাপী। শিশুর প্রবৃত্তিগুলিকে প্রথম অবস্থায় মনে করা যায় কাঁচামালের মত। শিল্পী যেমন কাঁচামালকে তাহার সামর্থ্য ও অভিরুচি

অনুসারে সুন্দর অথবা অসুন্দর দ্রব্যে পরিণত করে, তেমনি শিশুর প্রবৃত্তিগুলি যেরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত ও বিকাশপ্রাপ্ত হয়, তাহার উপরই নির্ভর করে শিশু কিরূপ বয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হইবে।

এই সাধারণ নিয়ম শিশুর ক্ষমতা অর্জনের বাসনার প্রতি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আমরা কোন কিছু করিতে চাই; এইরূপ কাজের ভিতর দিয়া ক্ষমতার প্রকাশ দেখানই উদ্দেশ্য। কি ধরণের কাজের মাধ্যমে এই ক্ষমতা প্রকাশ করা হইবে সে সম্বন্ধে প্রথমে কোন লক্ষ্য থাকে না। মোটামুটিভাবে বলা যায়; কাজ যত কঠিন হইবে ইহা সম্পন্ন করার আনন্দও তত বেশী হইবে। মানুষ পাখীর মত ডানা মেলিয়া উড়িতে চায়, কারণ ইহা কঠিন কাজ, শিকারী উপবিষ্ট পাখীকে গুলী করিয়া মারিতে বিশেষ আনন্দ পায় না। কেননা ইহা সহজ কাজ। উদাহরণ স্বরূপ ইহাদের কথা উল্লেখ করা হইল। কারণ ইহার মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করার আনন্দ ছাড়া অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নাই। আকাশে উড়া বা গুলী করিয়া পাখী মারা কাজ সম্পন্ন করিতে যে পদ্ধতি কঠিন বা অসাধারণ তাহাই বেশী আনন্দ দেয়। অন্যত্রও এই নীতি প্রয়োগ করা চলে। জ্যামিতি শেখার আগে পর্যন্ত আমি গণিত পছন্দ করিতাম, বিশ্লেষণ-মূলক (analytical Geometry) জ্যামিতি শেখার পূর্ব পর্যন্ত জ্যামিতি ভাল লাগিত। এইভাবে একটি আয়ত্ত করার পর কঠিনটির দিকে ক্রমশঃ ঔৎসুক্য অগ্রসর হইতে থাকে। শিশু প্রথমে হাঁটিতেই আনন্দ পায় পরে দৌড়াইতে তারপর লাফাইতে এবং কোন কিছু ধরিয়া উপরে উঠিতে সে ভালবাসে। যাহা আমরা সহজে করিতে পারি তাহার মধ্যে আর শক্তির প্রকাশ অনুভব করি না। নূতন কৌশল অথবা যাহা আয়ত্ত করা সম্ভব হইবে কিনা সন্দেহ আছে তাহা আয়ত্ত করিতে পারিলে কৃতকার্য হওয়ার তীব্র আনন্দানুভূতি লাভ হয়। কাজেই দেখা যায় ক্ষমতা লাভের বাসনাকে যে-কোন প্রকার কৌশল আয়ত্ত করার সঙ্গেই খাপ খাওয়াইয়া লওয়া চলে।

কোন কিছু সৃষ্টি করা এবং কোন কিছু ভাঙিয়া ফেলা উভয়ই ক্ষমতা প্রকাশের বাসনাকে তৃপ্ত করে কিন্তু ভাঙিয়া ফেলার চেয়ে সৃষ্টি করা কঠিনতর। কাজেই ধ্বংস করা অপেক্ষা সৃষ্টিতে আনন্দ বেশী। সৃজন বা ধ্বংস বলিতে কি বুঝায় তাহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিব না।

মনোবিজ্ঞানের কথায় বলা যায় আমরা যখন পূর্বপরিকল্পিত গড়ন অনুযায়ী কিছু তৈয়ার করি তখনই সৃষ্টি করি; নূতন কোন আকার দিবার পরিকল্পনা না রাখিয়া আমরা যখন কোন বর্তমান জিনিসের পরিবর্তন সাধন করি তখনই ধ্বংস করা হইল। এ ব্যাখ্যার সম্বন্ধে যাহাই মনে করা হোক না কেন

কোন কাজ গঠনমূলক কিনা কার্যক্ষেত্রে তাহা আমরা সকলেই বুঝিতে পারি, তবে ইহারও ব্যতিক্রম আছে ; কোন লোক যখন বলে যে নূতন সৃষ্টির জন্যই সে ধ্বংস করিতেছে তখন তাহার আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকিলে তাহার কাজ সৃষ্টিকার্য কি ধ্বংসকার্য তাহা নির্ণয় করা সত্যই কঠিন।

সৃষ্টি অপেক্ষা ধ্বংস করা সহজ ; এজন্য ধ্বংস করা অর্থাৎ কোন কিছু ভাঙিয়া ফেলা হইতে শিশুর সূত্রপাত হয়। বালির মধ্যে খেলা করিবার সময় শিশুরা চায় বয়স্ক ব্যক্তিরা কেহ বাটি দিয়া ছোট ছোট পিঠার মত ঢিবি তৈয়ার করিয়া দিক, তারপর তাহারা সেগুলি ভাঙিয়া ফেলিতে আনন্দ পায়। কিন্তু যখন তাহারা নিজেরা এরূপ তৈয়ার করিতে শেখে তখন ইহার প্রস্তুত করিতেই তাহাদের আনন্দ ; তখন তাহারা কাহাকেও সেগুলি ভাঙিয়া ফেলিতে দিতে চায় না। শিশুরা যখন প্রথম ইট লইয়া খেলা করে তখন তাহারা তাহাদের চেয়ে বয়সে বড় সঙ্গীদের নির্মিত ইটের খেলার ঘরবাড়ি ভাঙিয়া ফেলিতে ভালবাসে। কিন্তু তাহারা নিজেরা ইট দিয়া কোন কিছু তৈয়ার করিতে পারিলে নিজেদের কাজের জন্য রীতিমত গর্ব বোধ করে এবং কেহ যে তাহাদের সাধের সৌধ ভাঙিয়া দিবে তাহা তাহারা সহ্য করিতে পারে। যে আবেগের ফলে শিশু এই খেলার আনন্দ পায় তাহা ভাঙা এবং গড়া উভয়ক্ষেত্রেই সমানভাবে বিদ্যমান আছে। নূতন কৌশল কেবল খেলার আবেগ পরিতৃপ্ত করার কাজে পরিবর্তন আনিয়াছে। ভাঙিতে শিশুর যেরূপ, গড়িতেও সেরূপ আনন্দ। গড়িবার কৌশল শেখার পর শিশু ভাঙার চেয়ে গড়াই বেশী পছন্দ করে। দেখা যায় যে শিশু পূর্বে কেবল ভাঙিয়া ফেলিয়াই আনন্দ পাইত, সেই পরে গড়িতেই বেশী আনন্দ পাইতেছে।

শিশু যেমন প্রথম সৃষ্টির আনন্দ উপলব্ধি করে তখন তাহার মধ্যে অনেকগুলি গুণের বিকাশ ঘটানো যায়। শিশু যখন তাহার নিজের তৈরী জিনিস নষ্ট না করিতে অনুরোধ করে তখন তাহাকে সহজেই বুঝাইতে পারেন যে, সে নিজেও যেন অন্যের কোন জিনিস নষ্ট না করে। এইভাবে আপনি শিশুর মনে অপরের পরিশ্রম দ্বারা উৎপাদিত জিনিসের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিতে পারেন। পরিশ্রমই ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনের পক্ষে সমাজের দিক হইতে একমাত্র নির্দোষ উপায়। সৃজন কার্যের উৎসাহ দান করিতে আপনি শিশুর ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ দিন ; এ গুণগুলি ছাড়া সে যতখানি উঁচু চূড়া তৈয়ার করিতে চায় ততখানি পারিবে না। শিশুদের সঙ্গে খেলায় যোগদান করিয়া আপনি এমনভাবে কোন কিছু তৈয়ার করুন যাহাতে তাহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়; আপনি কেবল দেখাইয়া দিন কিভাবে

তৈয়ার করিতে হয়, তারপর শিশুদের উপরই তৈয়ার করিবার ভার ছাড়িয়া দিন।

শিশুকে বাগানে প্রবেশ করিতে দিলে তাহার সৃষ্টির বাসনাকে নূতন আকারে ভালভাবে বর্ধিত করা যায়। বাগানে গেলেই সুন্দর আকর্ষণীয় ফুলগুলি তোলাই হইবে তাহার প্রথম আবেগ। নিষেধ করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করা যায় কিন্তু শিক্ষা হিসাবে শুধু নিষেধই যথেষ্ট নয়। যে শ্রদ্ধাযুক্ত মনোভাবের ফলে বয়স্থ ব্যক্তিরা বাগানের ফুল যথেচ্ছভাবে নষ্ট করে না, সেইরূপ মনোভাব শিশুর মধ্যেও জাগাইয়া তুলিতে হইবে। সুন্দর এবং নয়নানন্দদায়ক কিছু তৈয়ার করিতে কি পরিমাণ পরিশ্রম ও চেষ্টার দরকার তাহা উপলব্ধি করিতে পারে বলিয়াই বয়স্থব্যক্তিদের মনে শ্রদ্ধার ভাব জাগে। শিশুর বয়স যখন তিন বৎসর হইবে তখনই তাহাকে বাগানের মধ্যে এক কোনে কিছুটা জায়গায় ফুলগাছের চারা লাগাইতে উৎসাহিত করা যায়। গাছগুলি বড় হইয়া ফুল ফুটিলে তখন সেগুলি তাহার কাছে অপূর্ব এবং মহামূল্যবান বলিয়া মনে হইবে। তাহার ফুল কেহ নষ্ট করুক ইহা যেমন সে চাহিবে না, তেমনি সে বুঝিতে পারিবে যে তাহার মায়ের ফুলগুলির প্রতিও অনুরূপ যত্ন লওয়া উচিত।

গঠনমূলক কাজ ও জীবন্ত প্রাণীর প্রতি প্রীতি এবং অনুরাগ বৃদ্ধি করিয়া শিশুর নিষ্ঠুরতা দূর করা যায়। প্রায় সকল শিশুই একটু বড় হইলেই মাছি এবং অন্যান্য কীট পতঙ্গ মারিতে চায়। এই অভ্যাস ক্রমে বড় প্রাণী এবং শেষ পর্যন্ত মানুষ হত্যা করার অভিলাষ জন্মায়। ইংলণ্ডে সাধারণ সম্ভ্রান্ত পরিবারে পাখী হত্যা করা বিশেষ প্রশংসনীয় কাজ বলিয়া পরিগণিত; যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ হত্যা তো তাহাদের নিকট একটি মহান কাজ। এ সকল কাজ অসংস্কৃত প্রবৃত্তির প্রেরণাসঞ্জাত। যে সকল লোক কোন প্রকার গঠনমূলক কৌশল জানে না এবং যাহারা ক্ষমতা প্রকাশের বাসনাকে অন্য কোন নির্দোষ শান্তিপূর্ণ উপায়ে পূর্ণ করিতে পারে না, তাহারাই নৃশংস আচরণের ভিতর দিয়া ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা সুন্দর পাখী হত্যা করিতে পারে, রায়ত প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিতে পারে; প্রয়োজন হইলে তাহারা একটি গণ্ডার অথবা একজন জার্মানকে বিনা দ্বিধায় গুলী করিয়া মারিতে পারে। কিন্তু তাহাদের পিতামাতা ও শিক্ষকগণ শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে শুধু ইংরেজ ভদ্রলোকে পরিণত করিয়াছেন; অন্যান্য অধিকতর প্রয়োজনীয় শিল্পকাজে তাহারা সম্পূর্ণ অপারগ। আমি বিশ্বাস করি না যে জন্মের সময় তাহারা অন্যান্য শিশু অপেক্ষা অধিকতর মূর্খ ছিল; পরবর্তীকালে তাহাদের চরিত্রের ত্রুটিগুলির জন্য একমাত্র কুশিক্ষাই দায়ী। যদি বাল্যকাল হইতে তাহারা প্রাণী

পুষিয়া যত্নের সঙ্গে তাহাদের বৃদ্ধি লক্ষ্য করিত এবং জীবনের মূল্য উপলব্ধি করিত, যদি তাহারা সৃজন কৌশল আয়ত্ত করিত, যদি তাহারা বুঝিত যে, কোন ভাল জিনিস তৈয়ার করিতে কত যত্ন পরিশ্রম এবং অনুরাগ দরকার কিন্তু নষ্ট করা যায় এক মুহূর্তেই তবে অন্যের উৎপাদিত বা লালিতপালিত কোন কিছু অনায়াসে ধ্বংস করিতে উদ্যোগী হইত না। যদি অপত্যস্নেহ জাগ্রত হয় পিতৃত্ব এবিষয়ে বড় শিক্ষকের কাজ করে। [পিতৃ-হৃদয়ে সন্তানের প্রতি স্নেহ সঞ্চার হইলে তাহা মানুষের মন কোমল এবং অপরের সন্তানের প্রতি মমতা-শীল করে। অপত্যস্নেহ মানুষের হৃদয়ের কঠোরতা দূর করিয়া করুণা ও ক্ষমা গুণে তাহাকে মহত্তর করে।] কিন্তু ধনীদের মধ্যে কদাচিৎ এরূপ ঘটে কেননা সন্তানের লালনপালনের ভার তাহারা বেতনভুক পরিচারিকাদের হাতে ছাড়িয়া দেয়। সন্তানকে নিজেদের স্নেহরসে পুষ্ট করিবার বা সন্তানের প্রতি বাৎসল্য-প্রীতি জাগ্রত করার ও প্রয়োগ করার তাহাদের অবসর কোথায়? কাজেই এরূপ পরিবারের শিশুরা পিতৃত্বে উপনীত হওয়ার পরও যে ধ্বংসমনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিবে সেরূপ আশা নাই। বাল্যকাল হইতেই জীবনের মূল্যবোধ এবং জীবনের প্রতি দরদ সঞ্চার করিয়া শিশুর মন হইতে নিষ্ঠুরতা দূর করিতে হইবে।

যে লেখকের বাড়িতে অশিক্ষিতা পরিচারিকা আছে তিনিই জানেন লেখার পাণ্ডুলিপি দিয়া আগুন জ্বালাইতে ইহারা কেমন উৎসাহী এবং তাহাদিগকে একাজ হইতে নিবৃত্ত করা কত কঠিন। এ লেখক যদি অন্য লেখকের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হন তবু তিনি এরূপ কাজ করিবেন না, কেননা পাণ্ডুলিপির মূল্য তিনি জানেন। তেমনি যে বালকের নিজের বাগান আছে সে অন্যের ফুলের চারাগুলি মাড়াইবে না, যে বালক কোন পশুপক্ষী পোষে তাহাকে জীবজন্তুর প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে শিখানো যায়। নিজের সন্তানের প্রতি যাহার প্রীতি আছে সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতিও তাহার দরদ থাকা স্বাভাবিক। যাহাদিগকে সন্তান লালনপালন করিতে প্রত্যক্ষ ভাবে ঝামেলা পোহাইতে হয়, তাহাদের মধ্যে অপত্যস্নেহ প্রবল আকারে প্রকাশ পায়, যাহারা এই ঝামেলা এড়াইয়া চলে, তাহাদের অপত্যস্নেহ অসাড় হইয়া পড়ে এবং শুধু সন্তানের প্রতি দায়িত্ববোধে পর্যবসিত হয়। বাল্যাবস্থায় শিশুদের গঠনমূলক আবেগ অথবা সৃজন মনোবৃত্তির বিকাশ সাধিত হইলে তাহারা যখন পিতা-মাতাতে পরিণত হয় তখন তাহারাও সযত্নে সন্তানকে গড়িয়া তোলার চেষ্টা করে এ জন্তও শিশুর চরিত্রের এই দিকটিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

সৃজন কার্য্য বলিতে কেবল বস্তুগত কোন জিনিস তৈয়ার করার কথাই

বুঝাইতেছি না। অভিনয় এবং সমবেত সংগীতও সহযোগিতামূলক সৃজন কার্য, যদিও দৃশ্যত: বস্তুর সাহায্যে কোন কিছু প্রস্তুত করা হইল না। এরূপ কাজ অনেক বালকবালিকার পক্ষে আনন্দদায়ক। এরূপ প্রীতিপদ সৃজনকার্যে তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া কর্তব্য কিন্তু জোর-জবরদস্তি করিবার প্রয়োজন নাই। যে-কাজে নিছক বুদ্ধিবৃত্তিই প্রধান সেখানেও সৃজনাত্মক ও ধ্বংসাত্মক মনোভাব থাকিতে পারে। প্রাচীন সাহিত্য-শিক্ষাকে একরকম দোষগ্রাহী (critical) বলা চলে: ছাত্র ভুল না করিতে এবং যাহারা ভুল করে তাহাদিগকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা করে। ইহার ফলে নিজেদের শিক্ষণীয় বিষয়টুকু শুদ্ধভাবে শিখিবার ঝোঁক আসে এবং নূতনত্বের পরিবর্তে প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব বৃদ্ধি পায়। বিশুদ্ধ ল্যাটিন ভাষা একবারেই স্থির হইয়া গিয়াছে-- ভার্জিল এবং সিসেরোর সাহিত্যই ইহার নিদর্শন, কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতি চিরদিনের মত স্থির ও রুদ্ধ হইয়া যায় নাই। ইহা প্রতিনিয়তই আগাইয়া চলিয়াছে। যে-কোন সমর্থ যুবক ইহার অগ্রগতিতে সাহায্য করিতে পারে। কাজেই বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারে যে মনোভাব গড়িয়া উঠে তাহা মৃত ভাষা শিক্ষার ফলে উদ্ভূত মনোভাব হইতে বেশী গঠনমূলক। কেবল ভুল না করাই যেখানে শিক্ষার প্রধান কাম্য লক্ষ্য সেখানে শিক্ষার মধ্যে সজীবতা থাকে না। সকল সুস্থ সবল কিশোর কিশোরীকে নূতন উদ্যম প্রয়োগ করিয়া নূতন কিছু করিতে অনুপ্রাণিত করা উচিত, শুধু ভুল বাঁচাইয়া কোনরকমে গতানুগতিক পন্থায় চলার মধ্যে প্রাণের গতিবেগ ও নবসৃষ্টির উন্মাদনা নাই। প্রায় মনে করা হয় যে, উচ্চশিক্ষা মানুষকে ভদ্র আচরণ শিখায় মাত্র, যাহাতে সে ব্যাকরণগত কোন গুরুতর ভুল না করে সে সম্বন্ধে নেতিবাচক শিক্ষা দেয় মাত্র। এরূপ শিক্ষায় গঠনকার্য বা সৃজন-প্রচেষ্টা উপেক্ষিত হইয়াছে। ইহার ফলে সৃষ্ট হয় সংকীর্ণচেতা, কর্মপ্রচেষ্টাবিমুখ এবং অনুদার লোক। কোন কিছু গঠন করা এবং সৃষ্টি করাকেই যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করা হয় তবে এইরূপ কু-ফলের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে।

শিক্ষার শেষ কয়েক বৎসরে সামাজিক গঠনের জন্য বিশেষ অনুপ্রেরণা দিতে হইবে। অর্থাৎ সমাজের বর্তমান শক্তিগুলিকে (forces) অধিকতর ফলপ্রদভাবে প্রয়োগ করিতে কিম্বা নূতন শক্তি সৃষ্টি করিতে বুদ্ধিমান যুবকদিগকে উৎসাহ দিতে হইবে। লোকে প্লেটোর 'রিপাব্লিক' (Republic) পুস্তক পাঠ করে কিন্তু তাহারা বর্তমান রাজনীতিতে কোথাও তাহার নীতি প্রয়োগ করে না। আমি যখন বলিয়াছিলাম যে প্লেটোর রিপাব্লিকের যাহা আদর্শ প্রায় ঠিক সেই আদর্শ ছিল ১৯২০ সনে রুশ রাষ্ট্রের, তখন প্লেটোর সমর্থকগণ কিম্বা

বলশেভিকগণ কোন্ দল যে বেশী বিস্মিত হইয়াছিল তাহা বলা শক্ত। লোকে যখন প্রাচীন সাহিত্য পাঠ করে তখন চিন্তা করিয়া দেখে না তখনকার অবস্থা রাম, শ্যাম, যদুর জীবনে কতখানি প্রযোজ্য। কোন লেখক যখন রামরাজ্যের চিত্র পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরে তখন সে বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে, কেননা বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা হইতে রামরাজ্য উপনীত হইবার কোন পথের হদিস্ সেরূপ পুস্তকে থাকে না। সমাজ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কি পন্থা অবলম্বন করা দরকার তাহা বিচারবুদ্ধির দ্বারা নির্ণয় করাই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ উদারনীতিকদের এই গুণ ছিল, যদিও তাঁহাদের কাজের শেষ পরিণতি দেখিলে তাঁহারা স্তম্ভিতই হইতেন।

সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে ধারণা

ছাঁচ :

মানুষ যখন কিছু গঠন করিতে বা পুরাতনের সংস্কার সাধন করিতে চায় তখন তাহার কাম্য বিষয়ের যে আকৃতি বা রূপ তাহার মনের পটে স্পষ্টভাবে অঙ্কিত থাকে তাহা অনেক সময় অজ্ঞাতসারে তাহার চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যাহা আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন অনেকদিনের মনন, কল্পনা, অনুরাগ, যুক্তি ও অনুভূতির রঙে রঞ্জিত হওয়ায় তাহা তাঁহাদের মনে স্পষ্ট আকার লাভ করে। তাঁহাদের মনে যে আদর্শ বিশেষ আকার গ্রহণ করিয়াছে পরিকল্পনার সাহায্যে তাহারই বাস্তবরূপ তাঁহারা সমাজে গড়িয়া তুলিতে চান। সমাজ-ব্যবস্থা গঠনের প্রণালী অনেকভাবে চিন্তা করা যায় এবং সাধারণতঃ ইহাকে তুলনা করা যায় ছাঁচ যন্ত্র এবং গাছের সঙ্গে। ছাঁচে ঢালা সমাজ-ব্যবস্থা বলিতে এমন সমাজ বুঝায় যেখানে কঠোর সামাজিক নিয়ম-কানুন অচলায়তনের মত দেশের বুকে চাপিয়া আছে, যেমন ছিল প্রাচীন স্পার্টায় এবং চীনদেশে, যেখানে সমাজবিধি এবং সংস্কারের ছাঁচে ঢালিয়া সকল মানুষকে একই মানসিক আকার দিবার চেষ্টা হইত। কঠোর নৈতিক ও সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে এই ধারণা কিছুটা বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপ ছাঁচে-ঢালা সমাজ-ব্যবস্থা যাহার আদর্শ, তাহার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী হয় শক্ত, অনমিত, কঠোর এবং অত্যাচারী।

যন্ত্র :

যে ব্যক্তি সমাজকে একটি যন্ত্র বলিয়া মনে করে তাহাকে অনেকটা আধুনিক

বলা চলে। শিল্পপতি এবং কমিউনিস্ট এই শ্রেণীতে পড়ে। তাহাদের নিকট মানব-স্বভাব নীরস এবং আকর্ষণবিহীন; মানবজীবনের উদ্দেশ্যও অতি সরল বলিয়া বোধ হয়। তাহারা মনে করে দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধিই মানুষের একমাত্র কাম্য। এই সহজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করাই তাহাদের সমাজ সংগঠনের লক্ষ্য। কিন্তু অসুবিধা হইল এই যে, সংগঠকগণ যাহা সাধারণ মানুষের বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন লোকে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জিনিষ পাওয়ার কামনা করে। সংগঠকগণ পরিকল্পনা করিয়া নির্ধারণ করেন। কি কি জিনিষ পাইলেই মানুষের সন্তুষ্ট থাকা উচিত; তাহাদের পরিকল্পনা মত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইয়া লোকের অভাব পূরণ করা এবং সকলকে সুখী করাই ইঁহাদের উদ্দেশ্য কিন্তু মানুষের বাসনার অন্ত নাই। নূতন সমাজ সংগঠকের তালিকাভুক্ত জিনিষ পাইয়া লোকে সন্তুষ্ট হয় না। ইহার ফলে সংগঠককে বাধ্য হইয়া এমন ছাঁচে ঢালা সমাজ গড়িতে চেষ্টা করিতে হয় যেখানে সকলেই তাঁহার আদর্শকে মানিয়া লইয়া তিনি যাহা ভাল মনে করেনতাহাই সানন্দে গ্রহণ করিবে। এই প্রচেষ্টাকে বলা যায় 'সোজা খাপে বাঁকা তলোয়ার' ভরার কসরৎ। ইহা জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি করে এবং অবশেষে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব সৃষ্টি করে।

বৃক্ষ:

সমাজব্যবস্থাকে যিনি একটি বৃক্ষের মত মনে করেন তাঁহার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অন্যের সঙ্গে পার্থক্য থাকে। একটি খারাপ যন্ত্র ভাঙিয়া ফেলিয়া তাহার পরিবর্তে নূতন যন্ত্র স্থাপন করা যায়। কিন্তু একটি গাছ কাটিয়া ফেলিলে সেইরূপ আকার ও শক্তিসম্পন্ন একটি নূতন গাছ জন্মিতে অনেক সময় লাগিবে; যন্ত্র বা ছাঁচ নির্মাতার ইচ্ছামত তৈয়ার করা যায় কিন্তু বৃক্ষের নিজস্ব স্বভাব আছে। যত্ন পরিচর্যায় সেই নির্দিষ্ট স্বভাবই বিকশিত হইয়া উঠে। যে-জাতীয় গাছ তাহার বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পায়, চেষ্টা করিয়া ইহাদের বৃদ্ধি কম বেশী করা যায় এইমাত্র; একজাতীয় গাছকে অন্য জাতীয় গাছে পরিণত করা যায় না। জীবন্ত জিনিষ গড়িয়া তোলা আর যন্ত্র তৈয়ার করার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। জীবন্ত জিনিষ গড়িতে কৌশলের প্রয়োজন বেশী নয়; ইহার জন্য একপ্রকার সহানুভূতির প্রয়োজন। এইজন্য শিশুদিগকে গঠন-কার্য শিক্ষা দিবার সময় কেবল ইট, কাঠ ও যন্ত্রের উপর তাহাদের গঠন-ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে শিখাইলেই চলিবে না, তাজা গাছ ও পোষা পশু-পক্ষীর প্রতি যত্ন ও সমবেদনার মনোভাবও গড়িয়া তুলিতে হইবে। নিউটনের সময়

হইতে জড়বিজ্ঞান মানুষের মন অধিকার করিয়াছিল, শিল্পবিপ্লবের সময় হইতে ইহার বাস্তব প্রয়োগ চলিতেছে। যন্ত্রশিল্পের উন্নতি ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের প্রতিও যন্ত্রসুলভ মনোভাব ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে। জীবের ক্রম-বিবর্তনবাদ কতকগুলি নূতন ভাবধারার প্রবর্তন করিয়াছিল কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে এগুলি কতকটা ম্লান হইয়া পড়ে, সুপ্রজনন, জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং শিক্ষা দ্বারা ইহার বিলোপ সাধন করা আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সমাজকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করা ছাঁচ কিম্বা যন্ত্ররূপে কল্পনা করার চেয়ে ভাল কিন্তু ইহাও দোষমুক্ত নয়। মনোবিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া এই দোষত্রুটি দূর করিতে হইবে।

মনোবিজ্ঞানমূলক সংগঠন ঃ

মনোবিজ্ঞানমূলক গঠন (Psychological Constructiveness) নূতন এবং সম্পূর্ণ অভিনব ধরণের, এ পর্যন্ত ইহার বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতা লোকে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। শিক্ষাপ্রণালী, রাজনীতি ও সকল মানবীয় ব্যাপারে ইহার একান্ত প্রয়োজন এবং নাগরিক যাহাতে মিথ্যা সাদৃশ্য দেখিয়া বিভ্রান্ত না হয় সেজন্য তাহাদের কল্পনাক্ষেত্রে ইহাকে একটি বিশেষ স্থান দিতে হইবে। কতকলোক মানুষের ব্যাপারে কোন কিছু গঠন করিতে ভয় পান, তাঁহাদের আশঙ্কা পাছে তাঁহাদের মানুষকে প্রাণহীন যন্ত্রে পরিণত করিয়া ফেলেন, মানুষের স্বভাবের উপরই তাঁহারা নির্ভর করেন।

অতএব অরাজকতা এবং তাহার ফলে মানুষের পুনরায় পশুত্বে প্রত্যাবর্তন (back to nature) ইহার উপরেই তাঁহাদের বিশ্বাস। মনোবিজ্ঞানমূলক গঠন ও যন্ত্রের গঠনের মধ্যে কি পার্থক্য তাহা এই পুস্তকে স্থূল উদাহরণ সাহায্যে দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। উচ্চশিক্ষায় এই ভাবের কল্পনা-উদ্রেককারী দিকটার সহিত বিদ্যার্থীর পরিচয় ঘটাইতে হইবে। এরূপ করিতে পারিলে আমার বিশ্বাস এই যে, আমাদের রাজনীতি আর এমন তীব্র ও ধ্বংসমুখী থাকিবে না, ইহার পরিবর্তে রাজনীতি হইবে নমনীয় এবং বিজ্ঞানসম্মত, আর উৎকৃষ্ট নরনারী প্রস্তুত করাই হইবে ইহার উদ্দেশ্য।

সপ্তম অধ্যায়

স্বার্থপরতা ও সম্প্রীতি

পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে ভয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়টিও ভয়ের মতই প্রবল আবেগসঞ্জাত, আংশিকভাবে প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন এবং বিশেষভাবে অবাঞ্ছনীয়। এই রকম ক্ষেত্রে শিশুর স্বভাবকে হঠাৎ বাধা দিয়া সংশোধনের চেষ্টা বা তাহাকে মনোমতভাবে চালাইবার চেষ্টা করা কখনই উচিত হইবে না। শিশুর স্বভাব এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে উদাসীন থাকায় কোন লাভ নাই কিম্বা শিশুর প্রকৃতি যদি অন্যরূপ হইত তবে ভাল হইত মনে মনে কেবল এরূপ আশা করিয়াও কোন উপকার হইবে না। শিশুকে তাহার স্বভাব ও প্রকৃতি জাত আবেগসহ কাঁচামালরূপে (raw material) গ্রহণ করিতে হইবে। তারপর উপযুক্ত শিক্ষার ভিতর দিয়া এমন ভাবে তাহার প্রবৃত্তিগুলির বিকাশ ঘটাইতে হইবে যাহাতে বাঞ্ছনীয় আচরণগুলি তাহার জীবনে অভ্যস্ত হইয়া যায়।

স্বার্থপরতা :

যতই বিশ্লেষণ করা যায় ততই ইহা অস্পষ্ট হইতে থাকে। কিন্তু শৈশবে শিশুর জীবনে ইহা সুস্পষ্ট আকারে প্রকাশ পায়, এবং ইহার ফলে যে সমস্যার উদ্ভব হয় তাহার সমাধান একান্ত আবশ্যক। কোনরূপ শিক্ষা না দিলে একজন শিশু তাহার চেয়ে কম বয়সীর খেলনা কাড়িয়া লইবে, নিজের ভাগ অপেক্ষা বেশী দাবী করিবে এবং তাহার কমবয়সী নিরাশ হোক আর নাই হোক সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজের বাসনা পূর্ণ করিতেই চেষ্টা করিবে। বাহিরের চাপে যদি নিয়ন্ত্রিত ও সংযত না হয় তবে গ্যাসের মত মানুষের সাহসিকতাও ক্রমেই বিস্তার লাভ করে। এ ব্যাপারে শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল মানুষের ক্রমবর্ধমান স্বার্থপরতাকে সংযত করিবার জন্য বাহিরের চাপ প্রয়োগ করা, এ চাপ শিশুকে কীল, চড় বা অন্য শাস্তিদান নয়, শিশুর মনে সহানুভূতি, ভাল ভাব ও সদভ্যাস গড়িয়া তোলা। শিশুর মনে ন্যায় বিচারের ভাবটি দৃঢ় করিতে হইবে, আত্মত্যাগের ভাব নয়। সংসারে প্রত্যেক লোকেরই কিছু স্থানের উপর অধিকার আছে; সে যদি তাহার নিজের প্রাপ্য অধিকারের জন্য দণ্ডায়মান হয় তবে তাহাকে দোষ দেওয়া উচিত নয়। যখন স্বার্থত্যাগ শিক্ষা দেওয়া হয় তখন

হয়ত (শিক্ষাদাতার) উপদেষ্টার মনে এই ধারণা বিদ্যমান থাকে যে, ইহা পুরা-পুরি মাত্রায় অনুসরণ করা হইবে না ; কাজেই বাস্তব ফল প্রায় ঠিকই হইবে অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গতভাবে যেটুকু তাহার প্রাপ্য তাহার দাবী সে ছাড়িবে না। কিন্তু কার্যত লোকে এরূপ উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে না কিম্বা নিজেদের জন্য ন্যায়বিচার দাবী করিতেও মনে মনে পাপ ও সঙ্কোচ বোধ করে, আর না হয় হাস্যকরভাবে আত্মত্যাগের চরম নিদর্শন দেখায়। যদি কেহ নিজের ন্যায়সঙ্গত অধিকার পর্যন্ত ত্যাগ করে তবে যাহার জন্য ত্যাগ করা হইল ত্যাগীর মনে তাহার প্রতি ক্ষীণ আক্রোশ লুক্কায়িত থাকে ; স্বার্থপরতা কৃতজ্ঞতা লাভের বাসনার ছদ্মবেশে তাহাদের মনে মনের পিছন-দরজা দিয়া প্রবেশ করে। যাহাই হোক আত্মত্যাগ সত্য নীতি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, কেননা ইহাকে সার্বজনীন করা সম্ভবপর নয়। যাহা সত্য নয় তাহাকে গুণের উপায় হিসাবে শিক্ষা দেওয়া কখনই সমীচীন নয়, কারণ মিথ্যা ধরা পড়িলেই গুণও কর্পূরের মত উবিয়া যায়।* পক্ষান্তরে ন্যায়বিচার সকলের পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য ; ইহা সার্বজনীন। কাজেই শিশুর অভ্যাসে ও চিন্তায় আমাদিগকে ন্যায়ের ধারণা অনুপ্রবেশ করাইতে হইবে।

ন্যায়বিচার শিখানো :

সঙ্গিহীন শিশুকে ন্যায়বিচার শিখানো অসম্ভব না হইলেও কঠিন। বয়স্ক ব্যক্তির অধিকার ও বাসনা এবং শিশুর আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এত বেশী পার্থক্য যে, এগুলি শিশুর মনে কোন সাড়া জাগায় না। একই প্রকার আনন্দ-লাভের জন্য উভয়ের মধ্যে কোনরূপ সাক্ষাৎ প্রতিযোগিতাও নাই ; অধিকন্তু বয়স্ক লোকেরা জোর করিয়া অন্যকে দিয়া তাহাদের দাবী পূরণ করাইতে পারে, কাজেই তাহাদের বিচারক তাহারা নিজেরাই। তাহাদের স্বার্থের সঙ্গে শিশুর স্বার্থের দ্বন্দ্ব বাধিলে শিশুরা নিরপেক্ষ লোকের নিকট হইতে ন্যায়বিচার পাইল বলিয়া ধারনা করিতে পারে না। বয়স্ক লোকেরা শিশুদের আচরণ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারে, যেমন মা যখন কিছু গুণছেন তখন মাঝখানে বাধা দিয়ো না, বাবা যখন কাজ করেন তখন চীৎকার করো না, যখন বাড়ীতে আগন্তুক আসে তখন কিছুর জন্য বায়না ধরো না ইত্যাদি। শিশুরা যদি অন্য সময় সদয় ব্যবহার পায় তবে উপদেশ মানিয়া লইয়া সংযত আচরণ করে কিন্তু ইহার যুক্তিযুক্ততা তাহারা বুঝিতে পারে না। শিশুদিগকে এরূপ নিয়ম মানিতে বাধ্য করা উচিত, কেননা তাহাদিগকে যথেচ্ছাচারী হইতে দেওয়া সঙ্গত। ইহা ছাড়া তাহাদিগকে ইহাও বুঝিতে হইবে যে অন্যলোকের কাছে তাহাদের

কাজের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। কিন্তু এরূপ শিক্ষার ফলে শিশুদের নিকট হইতে বাহিরে-দেখানো ভদ্র আচরণ ছাড়া আর কিছু আশা করা যাইবে না; যখন শিশুর সমবয়সী অন্য বালক-বালিকা থাকে কেবল তখনই তাহার মনে ন্যায়বিচার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা জন্মানো যায়। শিশুকে বহুদিন একাকী সাথীবিহীন অবস্থায় না রাখার পক্ষে ইহা একটি যুক্তি বটে। যে দম্পতীর একটিমাত্র সন্তান তাহাদিগকে মাঝে মাঝে শিশুর জন্য সঙ্গীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার জন্য শিশুকে সাময়িকভাবে কাছ ছাড়া করিতে হইলে তাহা করা উচিত। নিঃসঙ্গ শিশুর বাসনাগুলি বয়স্ক ব্যক্তির হাতে নিগৃহীত, দমিত হয়, অথবা সে স্বার্থপর হইয়া বাড়িয়া উঠে।

কোন পরিবারের একমাত্র শিশু যদি ভদ্র আচরণে অভ্যস্ত হয় তবে সে হয় অনুকম্পার পাত্র, আর যদি অভদ্র ব্যবহার শেখে তবে হয় বিরক্তিজনক। [সমবয়সীদের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইলে শিশুর মনের অনেকগুলি গুণ পরিপূর্ণভাব বিকাশের সুযোগ পায় না। সঙ্গীবিহীন শিশু সর্বদা বয়স্ক ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকিলে তাঁহাদের উপদেশ পালন করিতে শেখে বটে কিন্তু সেরূপ জোর করিয়া চাপানো আচরণ তাহার কাছে প্রীতিপদ হইতে পাবে না। নিরুপায় হইয়া সে প্রাণহীনভাবে কতকগুলি বাঁধাধরা ভদ্র আচরণ পালন করে। তাই সে কৃপার পাত্র। পক্ষান্তরে পিতামাতার অতিরিক্ত আদর যত্ন লাভ করিয়া শিশু যদি আত্মসবস্ব, স্বার্থপর, আবদারে হইয়া উঠে তবে তাহার আচরণ অন্যের বিরক্তি উৎপাদন করে।

বর্তমানে ছোটপারিবারের সংখ্যাই বেশী; এজন্য অনেক পরিবারে শিশুর শিক্ষায় এদিকটি সমস্যা সৃষ্টি করে। নার্সারি স্কুল এরূপ ক্ষেত্রে উপকারে আসে। সেখানে সমবয়সী শিশুদের পরস্পর মিলিয়া খেলা করিবার সুযোগ শিশুর জীবন গঠনে বিশেষ কাজে লাগে। এ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে। বর্তমানে শিশুর স্বার্থপরতা কিভাবে দূর করা যায় তাহা আলোচনা করিবার সময় ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে, পরিবারে অন্তত দুইটি প্রায় সমবয়সী শিশু আছে; তাহাদের বয়সের পার্থক্য খুব বেশী না হওয়ায় তাহাদের রুচিও প্রায় একইরূপ হইবে।

যেখানে খেলনা আছে মাত্র একটি অথবা খেলার আনন্দ একবারে মাত্র এক জন করিয়া উপভোগ করিতে পারে; যেমন ছোট ঠেলাগাড়িতে চড়া, সেখানে শিশু সহজেই ন্যায়বিচার বুঝিতে পারে। অবশ্য প্রথমে সে অন্যকে বাদ দিয়া নিজেই সবটা আনন্দভোগ করিতে চায় কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিরা যখন নিয়ম করিয়া দেন একজনের পর আর একজন পরপর সকলেই আনন্দ ভোগ করিবে, তখন

শিশু তৎক্ষণাৎ রাজী হয়। ন্যায়বিচার বোধ যে শিশুর সহজাত তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই তবে কত শীঘ্র এ বোধ সৃষ্টি করা যায় তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বিচার অবশ্য প্রকৃতই ন্যায় বিচার হওয়া চাই, কোন এক-জনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকিলে চলিবে না। আপনি যদি কোন শিশুকে অপরের চেয়ে বেশী ভালবাসেন, লক্ষ্য রাখিবেন তাহাদিগকে আনন্দ দিবার সময় আপনার আচরণে যেন পক্ষপাতীত্ব প্রকাশ না পায়। এটা সর্বসম্মত নীতি যে একই বাড়ীর শিশুদের খেলনা সমান হওয়া দরকার।

ন্যায় বিচার ও নীতি উপদেশ :

শিশু যখন ন্যায় বিচার দাবী করে তখন শুধু নীতি উপদেশে ভুলাইয়া রাখিলে কোন ফল হইবে না। ন্যায়সঙ্গতভাবে যেটুকু তাহার প্রাপ্য তাহার চেয়ে বেশী দিবেন না কিন্তু ইহাও আশা করিবেন না যে, সে কিছু কম লইয়াই সন্তুষ্ট থাকুক। The Fair Child Family পুস্তকে 'অন্তরের গুপ্ত পাপ' (The Secret Sins of the Heart) শীর্ষক একটি অধ্যায় আছে ; যে যে প্রনালী বর্জন করা উচিত এখানে তাহার উল্লেখ আছে। লুসি জানে সে ভাল মেয়ে কিন্তু তাহার মা তাহাকে বলেন যে, তাহার আচরণ দৃশ্যতঃ ভাল হইলেও তাহার চিন্তাগুলি খারাপ। তিনি বাইবেল হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলেন : হৃদয় সবচেয়ে বেশী প্রবঞ্চনাপূর্ণ এবং ভীষণ পাপে ভরা। শ্রীমতী Fairchild তাঁহার মেয়ে লুসিকে একখানি ছোট খাতা দিলেন ; তাহার বাইরের আচরণ যখন ভাল, তখন হৃদয়ে যে পাপ উঁকিঝুকি মারে তাই এই খাতায় লিখিয়া রাখিতে হইবে। একদিন প্রাতর্ভোজনের সময় লুসির পিতামাতা তাহার বোনকে একটি ফিতা এবং তাহার ছোট ভাইকে চেরি ফুল দিলেন কিন্তু তাহাকে কিছুই দেওয়া হইল না। এবিষয় লুসি তাহার খাতায় লিখিয়া রাখিল 'আমার মা-বাবা আমার চেয়ে ছোট ভাই'বোনকে বেশী ভালবাসে এই পাপচিন্তা আমার মনে উদয় হইয়াছিল।' তাহাকে শিখানো হইয়াছিল এবং সে বিশ্বাসও করিত যে, নৈতিক মানসিক শাসন দ্বারা এই পাপচিন্তা দূর করিতে হইবে। কিন্তু এরূপ করিলে মনের স্বাভাবিক বাসনাকে শুধু দাবাইয়া রাখা হইবে এবং পরবর্তীকালে এই নিগৃহীত বাসনাই নূতন ও বিকৃত আকারে আত্মপ্রকাশ করিবে। এ ব্যাপারে প্রকৃত পন্থা ছিল—লুসির পক্ষে তাহার মনের কথা প্রকাশ করা এবং তাহার পিতা-মাতার পক্ষে উচিত ছিল লুসিকে কোন উপহার দিয়া অথবা তখন দিবার মত অন্য কোন কিছু না থাকায় দেওয়া গেল না, পরে তাহাকেও দেওয়া হইবে ইহা বুঝাইয়া তাহার পিতামাতার ন্যায় বিচার ও পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কে যে সন্দেহ

জাগিয়াছিল তাহা নিরসন করা। সত্য কথা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করিলে তাহা সন্দেহ দূর করে কিন্তু শুষ্ক নৈতিক উপদেশ দিয়া ও শাসন করিয়া ইহা দমন করিতে গেলে ইহাকে শুধু বাড়াইয়া দেওয়া হয়।

সম্পত্তি-বোধঃ

ন্যায় বিচারের সহিত আরো একটি বিষয়ের নিবিড় সম্বন্ধ আছে ; ইহা হইল সম্পত্তি-বোধ অর্থাৎ কোন জিনিস নিজের অধিকারে রাখিবার আত্মপ্রসাদ। এই মনোভাবটির ভাল এবং মন্দ উভয় দিকই আছে। কাজেই ইহাকে অতিরিক্ত উৎসাহ দিলে যেমন ক্ষতিকর হইতে পারে, শাসন দ্বারা দাবাইয়া রাখিলেও তেমনি শিশুর সুস্থ আত্মবিকাশে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে। এ সম্পর্কে শিশুর সঙ্গে কিরূপ আচরণ করিতে হইবে তাহার বাঁধা-ধরা নিয়ম ঠিক করিয়া দেওয়া যায় না। শিশুর প্রকৃতি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝিয়া কিরূপ আচরণ করা সঙ্গত তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। তবে এরূপ ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

শিশুর সম্পত্তি-প্রীতি যদি খুব বেশী হয় তবে পরবর্তী জীবনে ইহা হইতে অনেক দুর্বিপাকের সৃষ্টি হইতে পারে ; পৃথিবীতে যত অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক নিষ্ঠুরতা অনুষ্ঠিত হয়, যত মতবাদ, কলহ ও দ্বন্দ্ব মানব-সমাজকে আলোড়িত করে তাহার অন্যতম প্রধান কারণ মূল্যবান সম্পত্তি হারানোর ভয়। কাজেই যতদূর সম্ভব নরনারী যাহাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর ভিত্তি না করিয়া সুখী হইতে পারে এরূপ মনোভাব গড়িয়া তোলাই বাঞ্ছনীয়, অর্থাৎ কেবল নিজেদের সম্পত্তির রক্ষামূলক কাজে লিপ্ত না থাকিয়া তাহারা যাহাতে সৃজনাত্মক কাজে আনন্দ পাইতে পারে এরূপ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। এজন্য শিশুদের সম্পত্তির অধিকার-বোধ উগ্রভাবে বাড়িতে না দেওয়া ভাল। তবে এ সম্বন্ধে মনে রাখিতে হইবে যে, কোন জিনিসের অধিকার পাইবার বাসনা শিশুর জীবনে অত্যন্ত প্রবল থাকে। শিশু যখন দৃষ্ট জিনিস ধরিতে পারে, যখন তাহার হাত ও চোখের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হয় তখন হইতেই এই অধিকার লাভের বাসনা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যাহা সে হাতে চাপিয়া ধরে তাহাই সে নিজের মনে করে এবং কাড়িয়া লইলে রাগান্বিত হয়। শিশুর যদি খেলনা না থাকে তবে সে ভাঙ্গা কাঠি, ইটের টুকরো এবং এটা সেটা কুড়াইয়া আনিলে নিজের সম্পত্তি বলিয়া জমাইয়া রাখিবে। জিনিস থাকিলে শিশু তাহার যত্ন লইতে শেখে এবং ধ্বংস করা মনোবৃত্তি কমিয়া যায়। শিশু নিজে যাহা নিজের জন্য তৈয়ার করিয়া লয় তৎপ্রতি তাহার মমতা ও গর্ববোধ খুব

বেশী। সম্পত্তির উপর অধিকার-বোধ জন্মিতে না দিলে শিশুর গঠন করার আবেগ আহত করা হয়।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে শিশুর সম্পত্তির উপর অধিকার-বোধের অপকারিতা আছে, উপকারিতাও আছে। ইহাকে উৎসাহ দিয়া বৃদ্ধি করা যেমন ক্ষতিকর দমন করাও তেমনি অপকারী। কি উপায়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়া শিশুর সহিত আচরণ করা উচিত তাহা আলোচনা করা যাক।

খেলার মধ্যে কতক হইবে শিশুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, কতক হইবে সকলের সাধারণ সম্পত্তি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় দোলনা, ঘোড়া সর্বদাই সাধারণ সম্পত্তি হইবে। ইহা হইতে একটি নীতি ঠিক করা যায়: যেখানে খেলনাটি ব্যবহার করিয়া সকলে আনন্দ পায় কিন্তু ব্যবহার করিতে হয় একে একে এক-জনের পর আর একজন পালা করিয়া, সেখানে ইহা যদি বেশ বড় এবং দামী হয় তবে ইহাকে সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা সঙ্গত। পক্ষান্তরে শিশুদের বয়সের কমবেশী হওয়ায় যদি কোন খেলনা সকলের পক্ষে সমান আকর্ষণীয় না হয় তবে ইহা যাহাকে সবচেয়ে আনন্দ দেয় তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে পারে। যদি কোন খেলনা নাড়া-চাড়া করিতে যত্নের প্রয়োজন হয় যাহা কেবল একটু বয়স্ক শিশুরাই করিতে পারে তবে ছোটদের হাতে দিয়া তাহা নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত নয়। ছোট শিশুকে বরং তাহার বয়সের উপযোগী পুতুল বা খেলনা দিয়া তাহার অভাব পূরণ করা চলে। দুই বৎসর বয়সের পর শিশু যদি নিজের দোষে পুতুল ভাঙিয়া ফেলে তবে সঙ্গে সঙ্গে আবার নূতন খেলনা দিবেন না; খেলনার অভাব তাহাকে কিছুদিন বুঝিতে দিতে হইবে। শিশু যাহাতে তাহার খেলনা অন্য ছেলেকে খেলিতে দিতে সর্বদা অসম্মত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবেন। শিশুর যদি বেশী খেলনা থাকে তবে সে যেগুলি ব্যবহার করে না, সেগুলি অন্য শিশুর খেলার জন্য দিতে তাহাকে আপত্তি করিতে দিবেন না। তবে যে খেলনা অন্য শিশু হয়ত ভাঙিয়া ফেলিতে পারে কিম্বা যে খেলনা দিয়া ইহার মালিক নূতন কিছু তৈয়ার করিয়াছে তাহা অন্যের হাতে না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়; যতদিন না সে তাহার সৃষ্টির কথা ভুলিয়া না যায় ততদিন তাহার পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ ইহা রাখা উচিত। এই ব্যতিক্রমটুকু মনে রাখিয়া শিশুর খেলার সরঞ্জাম দিয়া অন্য শিশুকে খেলিতে দিতে হইবে। শিশু হয়ত অনেক সময় স্বেচ্ছায় এইরূপ ভদ্র আচরণ করিবে না। সে ক্ষেত্রে কঠোর হওয়াই উচিত। শিশুর কোন জিনিস অন্য কেহ হাতে লইলেই যে তৎক্ষণাৎ তাহার হাত হইতে তাহা কাড়িয়া লইবে এরূপ আচরণ কখনই বরদাস্ত করিবেন না। বয়স্ক শিশু যদি অপেক্ষাকৃত ছোট শিশুর প্রতি অসদয় ব্যবহার

করে আপনিও তাহার প্রতি তদ্রুপ ব্যবহার করুন এবং কেন আপনি ওরূপ করিলেন তাহা সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে বুঝাইয়া দিন। এরূপ আচরণ দ্বারা শিশুদের মধ্যে কিছুটা প্রীতির ভাব গড়িয়া তোলা যায়, যাহার ফলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া ও কান্নাকাটি বন্ধ হইতে পারে। সময় সময় কিছুটা কঠোর হওয়ার এবং মৃদু শাস্তিদানের প্রয়োজনও হইতে পারে। কিন্তু কোনক্রমেই দুর্বলের উপর অত্যাচার করার অভ্যাস গড়িয়া উঠিতে দেওয়া সঙ্গত হইবে না।

সাধারণ সম্পত্তি :

শিশুর নিকট প্রিয় কতকগুলি খেলনা তাহার নিজস্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, আর যে খেলনাগুলি অন্যকেও ব্যবহার করিতে দেওয়া চলে সেগুলি সম্বন্ধে এরূপ নিয়ম করিতে হয় : যে যখন ব্যবহার করিবে সেগুলির উপর তখনকার জন্য সম্পূর্ণরূপে তাহারই অধিকার থাকিবে। মন্তেসরি খেলার সরঞ্জামগুলি বিদ্যালয়ের সকল শিশুর সাধারণ সম্পত্তি কিন্তু একজন যখন কোন একটি ব্যবহার করে তখন আর কেহ সেটি দাবী করিয়া তাহার খেলায় বাধা দেয় না। এরূপ ব্যবস্থার ফলে শিশুর মনে ধারণা জন্মে যে, যতক্ষণ সে কোন দ্রব্য ব্যবহার করিবে ততক্ষণ সেগুলির মালিক সে নিজে। কাজই হইল তাহার মালিকানা-স্বত্বের ভিত্তি। পরবর্তীকালের কর্মপ্রণালী ও মনোভাবের সঙ্গে এ সময়কার মনোভাবের কোন বিরোধ নাই।

অত্যন্ত কাঁচা শিশুর পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা প্রয়োগ করা যায় না, কেননা তখনও তাহাদের গঠন-ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ইহা প্রবর্তন করা উচিত। যখন তাহারা বুঝিতে পারে যে তাহাদের খেলিতে ইচ্ছা হইলেই খেলার সরঞ্জাম ফিরিয়া পাইবে তখন তাহাদের অন্যকে ব্যবহার করিতে দিতে বিশেষ আপত্তি থাকে না, থাকিলেও রীতি মানিয়া চলার ফলে ক্রমে তাহা দূর হয়।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি :

তথাপি শিশুর বয়স কিছু বেশী হইলেই তাহাকে কিছু বই দেওয়া উচিত ; এগুলি হইবে তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। পুস্তক-প্রীতি তাহার পড়ার বাসনা উদ্রেক করিবে। তবে দেখিতে হইবে বইগুলি যেন প্রকৃতই ভাল বই হয় ; আর শিশুরা যদি বাজে বই চায় তাহা বরং সকলের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

মূলনীতি ঃ

স্বার্থপরতা এবং সম্পত্তি লাভের বাসনা দুই-ই শিশুর জীবনে সত্য এবং তাহার চরিত্রগঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে ঃ পিতা-মাতাকে শিশুর প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া যত্নসহকারে এই উপযুক্ত আচরণ শিখাইতে হইবে। এ সম্পর্কে কয়েকটি মূলনীতি মনে রাখা আবশ্যক ঃ

প্রথম, যথেষ্ট পরিমাণ খেলনা নাই বলিয়া শিশুর মনে যেন বিফলতা বা ব্যর্থতার ভাব জাগ্রত না হয়। এই ভাব বদ্ধমূল হইয়া গেলে শিশু পরবর্তীকালে হয় অনুদার, সংকীর্ণমনা, কৃপণ।

দ্বিতীয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তি যখন শিশুর কতকগুলি সদ্গুণ বিকাশ করে, বিশেষ করিয়া যখন তাহাকে নিজের জিনিসের প্রতি যত্ন লইতে শিখায়, তখন তাহাকে কিছু জিনিষ ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে রাখিতে দিন। তবে লক্ষ্য রাখিবেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তিই যেন শিশুর আনন্দলাভের একমাত্র বা প্রধান উপায় না হয়।

অষ্টম অধ্যায়

সত্যবাদিতা

সত্য বলার অভ্যাস গঠন কর। নৈতিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সত্য বলিতে সত্য কথা ও সত্য চিন্তা উভয়ই বুঝাইতেছি ; বস্তুতঃ এ দুটির মধ্যে শেষোক্তটিই আমার কাছে বেশী প্রয়োজনীয় মনে হয়। মিথ্যা-বাদীকে দুইটি পৃথক দলে ভাগ করা যায় : একদল লোক সজ্ঞানে মিথ্যা বলে অর্থাৎ তাহারা যে মিথ্যা কথা বলিতেছে তাহারা তাহা জানে, অপর দল প্রথমে মিথ্যা দ্বারা নিজেদের অচেতন মনকে বঞ্চনা করে তারপর কল্পনা করে যে তাহারা ধার্মিক ও সত্যবাদী। প্রথম দল মিথ্যাবাদী, দ্বিতীয় দল ভণ্ড কপটা-চারী। এই দুই দলের মধ্যে যদি একদলকে বাছিয়া লইতে হয় তবে আমি প্রথম দলকে পছন্দ করিব। যাঁহারা সত্যভাবে চিন্তা করেন তাঁহারা মিথ্যা-কথা বলা যে সর্বদাই অন্যায় তাহা বিশ্বাস করেন না। যাঁহারা এরূপ মনে করেন, যাঁহারা কোন অবস্থাতেই সত্যভাষণ হইতে বিরত হওয়ার পক্ষপাতী নন, তাঁহাদিগকে ধর্মাবিচার দ্বারা আচরণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া অনেক সময় নিজেদের অভিমতের পরিবর্তন করিতে হয়। ইহার ফলে মনকে ফাঁকি দিয়া নিজেদের মিথ্যাচার স্বীকার না করিলেও ক্ষেত্রবিশেষে তাহারা প্রকৃতই মিথ্যাচারী। তবে যেরূপ ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদিতা সমর্থনযোগ্য সেরূপ অবস্থা মানুষের জীবনে খুব কমই আসে। প্রায় সকল সময় দেখা যায় এরূপ অবস্থায় সৃষ্টি হয় অত্যাচারী শক্তিমানের উদ্ধত অবিচারে অথবা যুদ্ধের ন্যায় কোন দেশব্যাপী ব্যাপক বিপদের সময়ে। মানব-সমাজের অবস্থার উন্নতি ঘটিলে এরূপ অবস্থা কমই সংঘটিত হইবে।

প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় ভয় হইতে মিথ্যাবাদিতার উৎপত্তি। যে শিশু নিঃশঙ্কভাবে বাড়িয়া উঠে সে কখনও মিথ্যা কথা বলে না ; কোনপ্রকার নৈতিক উপদেশ বা চেষ্টা ইহার কারণ নয়, প্রকৃত কারণ এই যে, মিথ্যা কথা বলার কোন প্রয়োজন সে অনুভব করে না। যে শিশু গৃহে উপযুক্ত অভিভাবকের নিকট হইতে সদয় ব্যবহার লাভ করে তাহার চোখে ফুটিয়া উঠে সরলতার দীপ্তি এবং অপরিচিত লোকের সঙ্গেও তাহার আচরণ হয় নির্ভীক ও সঙ্কোচহীন। কিন্তু যে শিশু সর্বদা অত্যাচার এবং কঠোরতার মধ্যে লালিত-পালিত হয় শাস্তি পাওয়ার ভয়ে সে সর্বক্ষণ সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, তাহার ভয়

—কখন বা কি অন্যায় করিয়া ফেলে! সর্বদা ভীতি ও সংকোচের মধ্যে থাকিতে হয় বলিয়া তাহার আচরণে স্বাভাবিকতা আসে না।

শিশু আপনা হইতে মিথ্যাকথা বলিতে শেখে না। মিথ্যা বলিয়া যে কিছু আছে এবং মিথ্যাকথা যে বলা যায় তাহা প্রথমে শিশুর ধারণায় আসে না। বয়স্কদের নিকট হইতে শিশু এ শিক্ষা পায়; ভয় ইহাকে দ্রুততর করে। শিশু বুঝিয়া ফেলে যে, বয়স্ক ব্যক্তিরা তাহার নিকট মিথ্যা কথা বলে এবং তাহাদের নিকট সত্য কথা বলায় বিপদ আছে; কাজেই সে মিথ্যা বলিতে শুরু করে। যে কারণগুলি শিশুকে মিথ্যাভাষণে উৎসাহ দেয় বা বাধ্য করে সেগুলি দূর করুন, দেখিবেন সে মিথ্যা বলার চিন্তা তাহার মনেই আসিবে না।

মিথ্যাবাদিতা ও শিশুমনের বৈশিষ্ট্য:

শিশু প্রকৃতই মিথ্যাকথা বলিতেছে কিনা সে সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। শিশুদের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত দুর্বল, তাহারা অনেক সময় বয়স্কদের প্রশ্নের উত্তর কি হইবে তাহা জানে না। কিন্তু বয়স্করা হয়ত মনে করেন তাহারা ঠিক জানে। শিশুদের সময় সম্পর্কে ধারণা খুবই অস্পষ্ট; চার বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর কাছে গতকাল ও এক সপ্তাহ পূর্বের মধ্যে কিম্বা গতকাল ও ছয় ঘণ্টা পূর্বের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। আপনার প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকিলে তাহারা আপনার প্রশ্নকরার ভঙ্গী ও কণ্ঠস্বর অনুসারে হাঁ কিম্বা না বলিবে। আবার অনেক সময় কল্পনার আশ্রয়ে কোন কিছুর ভান করিয়াও তাহারা কথা বলে। তাহারা যখন বলে যে পিছনের বাগানে সিংহ আছে তখন এ ভান সহজেই বোঝা যায়; শিশু তখন কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করিতেছে, সিংহ সম্বন্ধে সে শুনিয়াছে বা ছবি দেখিয়াছে; সিংহ গাছপালার মধ্যে থাকে তাহাও সে জানে; কল্পনায় সিংহকে সে নিজের বাড়ির কাছেই আনিয়াছে মাত্র। এ ক্ষেত্রে শিশুর কথা কল্পনাপ্রসূত বলিয়া সহজেই বোঝা গেল; অনেক সময় তাহার কল্পনাপ্রণোদিত কথাও ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বাস্তবতার কষ্টিপাথরে এগুলিকে মিথ্যাভাষণ বলা যায় সত্য কিন্তু ইহাতে কাহাকেও বঞ্চনা করার বিন্দুমাত্র উদ্দেশ্য বক্তার নাই। বস্তুতঃ বয়স্ক ব্যক্তিকে ঠকানো বা ফাঁকি দেওয়ার কোন চিন্তাই শিশুদের মনে উঠিতে পারে না; তাহাদের নিকট বয়স্ক ব্যক্তিরা সর্বজ্ঞ; কাজেই তাহাদিগকে বঞ্চনা করা অসম্ভব। আমার পৌনে চার বছর বয়সের ছেলে শুধু গল্প শোনার আনন্দের জন্যই, আমি যখন বর্তমান ছিলাম না তখন তাহার কি হইয়াছিল সে সম্বন্ধে গল্প শুনিতে চায়। তাহার ধারণা তাহার পিতার অজানা কিছু নাই।

তাহাকে বুঝান কষ্ট যে, তাহার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। শিশুরা নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে বয়স্কদের জ্ঞানের তুলনা করিয়া এত পার্থক্য দেখে যে, বয়স্কদের জ্ঞানের যে সীমা আছে তাহা ধারণা করিতে পারে না। গত ইস্টারের সময় ছেলেকে কতকগুলি চকোলেট দেওয়া হইয়াছিল। আমরা তাহাকে বলিয়াছিলাম বেশী খাইলে অসুখ করিবে; শুধু বলিয়াই ক্ষান্ত ছিলাম, চকোলেটগুলিই তাহার কাছেই রাখা হইয়াছিল। বেশী খাইয়া সে অসুখে পড়িল। অসুখ সারিলে সে একদিন হাস্যোজ্জ্বল, কতকটা বিজয়োৎফুল্লকণ্ঠে বলিল: 'বাবা আমার অসুখ হয়েছিল—বাবা বলেছিলেন যে আমার অসুখ হবে।' তাহার পিতার ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা পরীক্ষা করিয়া শিশু বিস্মিত হইয়াছিল। সে যেন পরীক্ষা দ্বারা কোন বৈজ্ঞানিক নিয়মের সত্যতা প্রমাণ করিয়াছিল। ইহার পর হইতে তাহার হাতে অধিক পরিমাণে চকোলেট দিয়াও নিশ্চিন্ত হওয়া গিয়াছে। যদিও চকোলেট পাইত তবু কখনো লোভের বশে বেশী খাইয়া অসুখ সৃষ্টি করিত না। ইহা ছাড়া আরো একটি সুফল হইয়াছে এই যে তাহার খাদ্য সম্বন্ধে আমরা যাহা বলি তাহা সে একান্তভাবে বিশ্বাস করে। তাহার মনে এই ভাব জাগ্রত করার জন্য নৈতিক উপদেশ শাস্তি অথবা ভয়ের প্রয়োগ করিতে হয় নাই। প্রথম অবস্থায় শিশুর সঙ্গে আচরণে ধৈর্য ও দৃঢ়তার প্রয়োজন হইয়াছে। সে এমন এক বয়সে আসিয়া পৌঁছিতেছে, যখন সকল ছেলের পক্ষেই মিষ্টি খাবার চুরি করা এবং এ সম্বন্ধে মিথ্যা বলা স্বাভাবিক। আমার ছেলেও খাবার চুরি করিবে নিশ্চয় কিন্তু এ বিষয়ে মিথ্যা কথা বলিলে আমি বিস্মিত হইব। শিশু যখন মিথ্যা কথা বলে তখন তাহাকে ইহার জন্য দায়ী না করিয়া পিতামাতার নিজেদিগকেই দায়ী মনে করা উচিত। তাঁহাদের কর্তব্য হইবে—কি জন্য মিথ্যা কথা না বলা ভাল তাহা শান্তভাবে শিশুকে বুঝান এবং যে যে কারণে শিশু মিথ্যাকথা বলিতে অভ্যস্ত হয় তাহা দূর করা। শাস্তি দিয়া মিথ্যা ভাষণ বন্ধ করার চেষ্টা ঠিক হইবে না, ইহার ফলে বরং তাহার ভয় বেশী হইবে এবং ভয় তাহার মিথ্যা ভাষণের প্রবণতা আরো বাড়াইয়া দিবে। আঘাত করিয়া আগুন নিভানো চেষ্টার মতই শাস্তি দিয়া মিথ্যা বলার অভ্যাস ত্যাগ করাইতে গেলে বিপরীত ফল ফলিবে।

শিশুদিগকে যদি মিথ্যা ভাষণ অভ্যাস করা হইতে বিরত রাখিতে চান তবে তাহাদের সহিত ব্যবহারে বয়স্ক ব্যক্তিদের সত্যবাদিতা একান্তভাবে অপরিহার্য। যে পিতা-মাতা শিক্ষা দেন যে, মিথ্যা কথা বলা পাপ তাঁহাদের ছেলে-মেয়েরাই যদি তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া জানে তবে সে পিতা-মাতার উপদেশ দিবার নৈতিক অধিকার থাকে না। সন্তান-সন্ততির নিকট সত্যকথা বলার নীতিটা

সম্পূর্ণ নূতন ; বর্তমান প্রজাতির (generation) পূর্বে বড় বিশেষ কেহ ইহা মানিয়া চলিতেন না ; ইভ্ তাঁহার ছেলে Cain এবং Abel কে আপেলের সম্বন্ধে সত্যকথাটি বলিয়াছিলেন কিনা আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে ; আমার বিশ্বাস তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে যাহা কল্যাণকর নয় এমন কোন খাদ্য তিনি গ্রহণ করেন নাই। পিতা-মাতা সন্তানের নিকট নিজদিগকে সর্বশক্তিসম্পন্ন, মানুষের স্বাভাবিক কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুর তাড়না হইতে মুক্ত এবং সর্বদা বিশুদ্ধ বিচারবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত বলিয়া জাহির করিতেন। শিশুদিগকে তিরস্কার করিবার সময় ক্রোধের চেয়ে দুঃখের ভাবই বেশী দেখাইতেন। যত গাল-মন্দই করুন না কেন তাঁহারা মেজাজ ঠিক রাখিয়া সন্তানদের মঙ্গলের জন্যই বলিতেছেন এরূপ ভাব দেখাইতেন। তাঁহারা বুঝিতেন না যে শিশুরা বিস্ময়কর ভাবে স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন : তাহারা ভাঁওতা বা ভণ্ডামির রাজনৈতিক কারণ বোঝে না কিন্তু ইহাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করে। আপনার যে হিংসা-দ্বেষ সম্বন্ধে আপনি নিজেই জানেন না তাহা শিশুদের নিকট সহজে ধরা পড়ে ; ইহার পর আপনি হিংসা-দ্বেষের দোষ সম্বন্ধে শিশুদিগকে যতই উপদেশ দিন না কেন তাহারা কিছুই মানিবে না। কখনই নিজেকে দোষত্রুটিশূন্য, অতিমানুষ বলিয়া ভান করিবেন না ; ইহাতে শিশু আপনাকে বিশ্বাস করিবে না, পছন্দও করিবে না। আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে, অতি অল্প বয়সে আমি কেমন করিয়া আমার উপর প্রযুক্ত **ভিক্টোরিয়া যুগের ভাঁওতা** ও ভণ্ডামি বুঝিয়া ফেলিয়াছিলাম এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, আমার যদি কখনো সন্তান-সন্ততি হয় তবে তাহাদের প্রতি আচরণে এইরূপ ভুল করিব না। যথাসাধ্য আমি এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া চলিতেছি।

বয়স্কের পক্ষে আর একপ্রকার মিথ্যা হইল—শিশুকে যে শাস্তি দেওয়া হইবে না, তাহার ভয় দেখানো। ডক্টর ব্যালার্ড তাঁহার চিত্তাকর্ষক পুস্তকে (The Changing School) এই নীতি বিশেষ জোরের সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : শাসাইবেন না। যদি শাস্তির ভয় দেখান তবে আপনাকে শাস্তি দিতেই হইবে। আপনি যদি ছেলেকে বলেন, "আবার যদি একাজ কর তবে তোমাকে মেরে ফলব" এবং সে যদি সেই কাজ আবার করে তবে ছেলেকে হত্যা করিতেই হইবে। আপনি যদি তাহা না করেন, তবে ছেলে আপনার প্রতি সকল শ্রদ্ধা হারাইবে।' পরিচারিকা এবং অশিক্ষিত পিতা-মাতা শিশুদের সঙ্গে ব্যবহারে যে শাস্তির ভয় দেখায় তাহা হয়ত এমন চরম নয় কিন্তু এ ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য। বিশেষ যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকিলে শিশুকে দিয়া কোন কিছু করাইবার জন্য জেদ করিবেন না কিন্তু একবার যদি জেদ শুরু করেন

তবে (ফল যাহাই হোক) শেষ পর্যন্ত আপনাকে ইহা বজায় রাখিতেই হইবে। যদি কোন শাস্তির ভয় দেখান তবে আপনি যাহা প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত আছেন সেইরূপ শাস্তির ভয় দেখাইবেন; আপনার শাস্তিদানের হুমকিতেই কাজ হইবে বাস্তবিক শাস্তি দিতে হইবে না এরূপ ধারণা করিবেন না। অশিক্ষিত জনসাধারণকে এই নীতি বুঝান বড় কঠিন। পুলিশ লইয়া গিয়া আটকাইয়া রাখিবে; দৈত্য আসিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবে, প্রভৃতি ধরনের অবাস্তব ভীতি প্রদর্শন বিশেষ আপত্তিজনক। ইহা প্রথমে শিশুর মনে নিদারুণ ভীতি সঞ্চার করে, পরে যখন বুঝিতে পারে যে সবই ভাঁওতা মাত্র তখন বয়স্ক ব্যক্তিগণের কথা ও ধমকানির উপর তাহার আর কোন আস্থা থাকিবে না। আপনি জেদ করিয়া শেষ পর্যন্ত শিশুকে আপনার মনোমতভাবে চলিতে বাধ্য না করান তবে সে শীঘ্র বুঝিয়া ফেলিবে যে এরূপ ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন; সে বরং তৎক্ষণাৎ মুখে স্বীকার করিবে কিন্তু কার্যতঃ কিছুই করিবে না। শাস্তির ভয় দেখাইয়া সংশোধন করিতে চাহিলে মনে রাখিতে হইবে যে বিশেষ উপযুক্ত কারণ না থাকিলে কখনই শিশুকে ভয় দেখানো বা ধমকানো উচিত নয়।

আর এক ধরণের অবাঞ্ছনীয় ভাঁওতা হইল প্রাণহীন পদার্থের প্রতি জীবন্ত প্রাণীর মত আচরণ করিতে শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু টেবিল বা চেয়ারের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া আঘাত পাইলে তাহার পরিচারক পরিচারিকারা 'দুষ্ট টেবিল' 'দুষ্ট চেয়ার' প্রভৃতি বলিয়া এগুলিকে আঘাত করিতে শিখাইয়া দেয়। শিশুর আঘাত লাগার জন্য টেবিলই বা চেয়ার যেন দায়ী এরূপ ধারণা শিশুর মনে আনিয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে স্বাভাবিক উপায়ে শৃঙ্খলা বিধানের একটি অতি প্রয়োজনীয় সূত্র নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। নিজের বুদ্ধিতেই শিশু অল্প-দিনেই বুঝিতে পারে যে প্রাণহীন পদার্থের সঙ্গে রাগ খাটাইয়া বা তোষামোদ করিয়া কোন লাভ নাই। এগুলি নাড়াচাড়া করিতে নিজের শারীরিক পটুতা অর্জন করিতে হইবে। এই বোধ তাহাকে দৈহিক কৌশল বা পটুতা অর্জন করিতে উৎসাহ দেয় এবং শিশু নিজের ব্যক্তিগত ক্ষমতার সীমা কতদূর তাহা উপলব্ধি করিতে শেখে।

যৌনজীবন বা যৌন আচরণ সম্বন্ধে শিশুর নিকট মিথ্যাকথা বলা অনেক কালের রেওয়াজ হইয়া গিয়াছে। আমার কাছে ইহা অত্যন্ত অপকারী মনে হয়। পরবর্তী এক অধ্যায়ে যৌনশিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

যদি রূঢ় আচরণ দ্বারা শিশুদের কৌতূহল দমিত না হয় তবে তাহারা অসংখ্য প্রশ্ন করিবে, কতক প্রশ্ন হইবে বুদ্ধির পরিচায়ক, কতক বা ইহার

বিপরীত। প্রশ্নগুলি প্রায়ই বিরক্তিকর, কখনো বা অসুবিধাজনক। তথাপি আপনার সাধ্যানুসারে ইহাদের সদুত্তর দিতে হইবে। কিন্তু যদি ধর্ম সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন করে তবে এ সম্বন্ধে আপনার নিজের যাহা অভিমত তাহাই বলুন; ইহাতে যদি অন্য ব্যক্তির সঙ্গে মতের পার্থক্য প্রকাশ পায় তাহাতেও কিছু আসে যায় না। সে যদি এমন প্রশ্ন করে যাহার উদ্দেশ্য আপনাকে দুষ্ট বা বোকা বলিয়া প্রতিপন্ন করা, তবে তাহারও উত্তর দিন। সে যদি যুদ্ধ অথবা মৃত্যুদণ্ড সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, উত্তর দিন। কতক প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক জটিলতা জড়িত থাকে—যেমন বৈদ্যুতিক আলো কেমন করিয়া উৎপন্ন করা হয়? ইত্যাদি। এই ধরণের কঠিন প্রশ্ন ছাড়া অন্য প্রশ্নের উত্তরে 'তুমি এখনো সব বুঝতে পারবে না' বলিয়া শিশুকে থামাইয়া দিবেন না। যদি কখনো এরূপ উত্তর দিতে হয় তবে তাহাকে বুঝাইয়া দিবেন যে, প্রশ্নের উত্তরটি খুবই আনন্দদায়ক; তাহার জ্ঞান আরো কিছু বেশী হইলে তবে সে ইহার আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারিবে। কোন প্রশ্নের উত্তরে শিশুকে কিছু বলিবার সময় কম না বলিয়া সে যাহা বুঝিতে পাবে তাহার চেয়েও কিছু বেশী বলিবেন: যেটুকু সে বুঝতে পারিল না তাহা তাহার কৌতুহল ও জ্ঞান বুদ্ধির বাসনা জাগাইয়া তুলিবে।

শিশুর সঙ্গে যদি সর্বদা সকল অবস্থাতেই সত্যকথা বলা যায় তবে ইহার সুফলস্বরূপ তাহার আস্থা এবং শ্রদ্ধালাভ করা যায়। আপনি যাহা বলিলেন তাহা বিশ্বাস করার প্রবণতাই শিশুর বেশী থাকে যদি না আপনার কথা তাহার কোন প্রবল বাসনার বিরুদ্ধে যায়, যেমন হইয়াছিল ঈষ্টারের সময় খোকার চকোলেট খাওয়ার ব্যাপারে। একথা একটু পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। আপনার মন্তব্যের সত্যতা পরীক্ষিত হইলে সহজেই আপনি শিশুর বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিবেন। কিন্তু আপনি যদি মিথ্যা শাস্তির ভয় দেখান তবে শিশু আর সহজে ভীত হইবে না এবং আপনার কথামত চলিবেও না; তখন আপনাকে আরো বেশী কড়াকড়ি ও ভীতি প্রদর্শন করিতে হইবে; ফলে শিশুর অস্থিরচিত্ততা সৃষ্টি হইবে। একদিন আমার ছেলে স্রোতের জলের মধ্যে হাঁটিতে চায়। সেখানে ভাঙা কাচ প্রভৃতির টুকরা থাকিলে তাহার পা কাটিয়া যাইতে পারে, এজন্য আমি তাহাকে বারণ করি। জলে নামার বাসনা তাহার এমন প্রবল হইয়াছিল যে, সে কাচের টুকরা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠে কিন্তু আমি যখন একটি টুকরা পাইয়া তাহার ধারালো কিনারা দেখাইলাম তখন সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিল। আমি যদি আমার নিজের সুবিধার জন্য অর্থাৎ তাহাকে জলে নামা হইতে বারণ করার জন্য বাসনপত্রের ভাঙা টুকরা

আছে বলিয়া মিথ্যা ভাঁওতা দিতাম তবে সে আমার উপর বিশ্বাস হারাইত; সেখানে কোন ভাঙা ধারালো টুকরা না পাইলে আমি তাহাকে নিশ্চয়ই জলে নামিতে দিতাম। এই ধরণের নানা পরীক্ষার ফলে শিশু আমার যুক্তি ও বিবেচনা সম্বন্ধে আর কোনপ্রকার সন্দেহ পোষণ করে না।

আমরা ছলনা ও প্রতারণাময় সংসারে বাস করিতেছি। যে শিশু ইহার আওতায় বর্ধিত হয় না সে সাধারণতঃ যাহা শ্রদ্ধার যোগ্য বলিয়া অনেকে মনে করে তাহার ভিতরকার ভণ্ডামির জন্য অনেক কিছুই ঘৃণা করিবে। কোন কিছুর প্রতি ঘৃণার ভান পোষণ করা বাঞ্ছনীয় নয়। আমি এরূপ অবস্থার প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করার পক্ষপাতী নই, তবে সে যদি স্বেচ্ছায় জানিতে চায় তবে তাহার কৌতূহল নিবৃত্ত করিতেই হইবে। ভণ্ডামিপূর্ণ সমাজে জীবন-যাত্রার ক্ষেত্রে সত্যবাদিতা কতকটা বাধাস্বরূপ হয় বটে কিন্তু সত্যবাদিতাকে ভিত্তি করিয়া মানুষের যে নির্ভীকতা লাভ হয় তাহার মূল্য অনেক বেশী। আমাদের সন্তানগণ সৎ, সরল এবং আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন হউক ইহাই আমরা কামনা করি। আমি তো মনে করি এই সকল গুণে ভূষিত হইয়া তাহারা যদি কর্মক্ষেত্রে অকৃতকার্য হয় তাহা বরং ভাল তবু তাহারা যে ক্রীতদাসের কলাকৌশলে অর্থাৎ মিথ্যা, কপটতা ও ভণ্ডামির সাহায্যে কৃতকার্য হইবে তাহা চাই না। প্রত্যেক খাঁটি চমৎকার ব্যক্তির সততা এবং নিজের সততা সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন গর্ববোধ থাকা উচিত। [এই গর্ববোধকে তুলনা করা চলে মাংসপেশীর অভ্যন্তরস্থিত অস্থির সঙ্গে। শক্তি অস্থি দেহকে উন্নত ও দৃঢ় রাখে; অস্থিহীন প্রাণী উন্নত মস্তকে চলিতে পারে না। কিন্তু অস্থি যদি মাংস দ্বারা আবৃত না থাকে তবে অপরের সংস্পর্শে আসিলে তাহা অন্যকে রূঢ় আঘাত দেয়। বিনয় ও ভদ্রতারূপ মাংসপেশীর আড়ালে অস্থিরূপ গর্ব-বোধ মানুষকে অনেক হীনতা ও নীচতা হইতে রক্ষা করে।] এইরূপ গর্ববোধ থাকিলে বিশেষ কোন মহত্তর উদ্দেশ্য ব্যতীত সে ব্যক্তির পক্ষে মিথ্যা কথা বলা অসম্ভব। আমি চাই আমার ছেলেমেয়েরা চিন্তায় ও বাক্যে সত্যবাদী হউক; ইহার জন্য যদি তাহাদিগকে জাগতিক ব্যাপারে দুর্ভাগ্য ভোগ করিতে হয় তাহাতেও আমি রাজী, কেন না সত্যকে পরিত্যাগ করা ধন, মান অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান সম্পদ বিসর্জন দেওয়ারই সামিল।

নবম অধ্যায়

শাস্তি

আগেকার দিনে এবং কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত শিশু এবং বালকবালিকা-দিগকে শাস্তি দেওয়া একটি অতি সাধারণ প্রচলিত ব্যাপার ছিল; শিক্ষার জন্য ইহাকে সর্বজনস্বীকৃত এবং অপরিহার্য মনে করা হইত। বেত্রাঘাত সম্বন্ধে ডক্টর আর্নল্ড কি অভিমত পোষণ করিতেন তাহা সর্বজনবিদিত। তাঁহার সময়ে ডক্টর আর্নল্ডের অভিমত অতি কোমলতাপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইত। শিশুকে তাহার নিজের স্বভাব ও প্রকৃতি অনুসারে বাড়িয়া উঠিতে দিবার নীতি প্রচার করেন রুশো। তথাপি তিনিও "এমিল" (Emile) গ্রন্থে কোন কোন ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তিদানের অনুকূলে অভিমত দিয়াছেন। একশত বৎসর পূর্বে শিশুর শাস্তি বিধান সম্পর্কে কিরূপ ধারণা ছিল তাহা তখনকার সতর্ককারী এক গল্পে বর্ণিত আছে। ছোট্ট একটি মেয়েকে সাদা জামা পরাইয়া দেওয়া হইতেছে কিন্তু সে জেদ ধরিয়াছে ফিকে লাল রঙেরটি পরিবে। তাহার অবাধ্যতার ফল কি হইল ?

বহির্বাটি থেকে এসে বাবা শুনিলেন যবে
খুকুর তর্জন ক্রন্দন;
তখনি রাগের বশে ভিতরে ছুটিয়া এসে
বেত্রাঘাতে করে দমন।

The Fair Child Family পুস্তকে বর্ণিত আছে মিঃ ফেয়ার চাইল্ড তাঁহার ছেলেমেয়েদিগকে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া করিতে দেখিলে বেত মারিতেন আর তালে তালে কবিতা আবৃত্তি করিতেন 'কুকুর মাতুক আনন্দে কামড়ে গর্জনে' (Let dogs delight to bark and bite)। তারপর ফাঁসীর কাঠের সঙ্গে ঝুলানো মৃতদেহ দেখানোর জন্য লইয়া যাইতেন। বাতাসে মৃতদেহটি নড়িত, শিকলের ঝন্ ঝন্ শব্দ হইত; ছেলেমেয়েরা ভয়ে জড় হইয়া তাহাদিগকে বাড়িতে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে অনুরোধ করিতে থাকিত। কিন্তু মিঃ ফেয়ার চাইল্ড তাহাদিগকে বহুক্ষণ সেই বীভৎস দৃশ্য দেখিতে বাধ্য করিতেন এবং বলিতেন, যাহাদের অন্তরে ঘৃণা আছে তাহাদের এই দশাই হয়। পিতার ইচ্ছা ছিল ছেলেকে ধর্মযাজক করা; এবং এই উদ্দেশ্যেই হয়তো তাহাকে এমন শিক্ষা

দেওয়ার দরকার ছিল যাহাতে সে পাপীর অপরাধ যে কিরূপ ভীষণ হয় সে সম্বন্ধে পরে প্রত্যক্ষদর্শীর মত জ্বলন্ত বর্ণনা দিতে পারে। বর্তমান যুগে এরূপ শাস্তি কেহই সমর্থন করিবে না। কিন্তু ইহার পরিবর্তে কিরূপ শাস্তির ব্যবস্থা থাকা উচিত সে সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। কেহ কেহ এখনো ভালমত শাস্তিদানের পক্ষপাতী আবার কেহ কেহ মনে করেন ইহার কোন প্রয়োজন নাই। এ দুইটিই চরম অভিমত।

আমার মনে হয় শিক্ষায় শাস্তির প্রয়োজন আছে, তবে ইহার স্থান খুব কম; আর কঠোর শাস্তি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয় আমার মতে ধমক দেওয়া বা তিরস্কার করাও শাস্তির অন্তর্ভুক্ত। যদি কখনো কঠোর শাস্তির প্রয়োগ করিতে হয়; তাহার জন্য স্বাভাবিক ক্রোধ প্রকাশই যথেষ্ট হওয়া উচিত। কয়েকবার আমার ছেলে তাহার ছোট বোনের উপর রূঢ় ব্যবহার করিলে তাহার মা রাগিয়া বিরক্তির সঙ্গে জোরে ধমক দেন। ইহাতেই সুফল ফলিল। ছেলে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল এবং তাহার মা তাহাকে আদর না করা পর্যন্ত সে শান্ত হইল না। পরে ছোট বোনের সঙ্গে তাহার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল ক্রোধের সুফল তাহার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছে। আমরা কোন জিনিস না চাহিলেও সে যখন ইহার জন্য জেদ করিয়াছে কিম্বা তাহার ছোট বোনের খেলায় বিঘ্ন-সৃষ্টি করিয়াছে, তখন তাহাকে মৃদু আকারে শাস্তি দিতে হইয়াছে। এরূপ-ক্ষেত্রে ভালভাবে বুঝাইলেও কোন ফল না হইলে আমরা তাহাকে একটি ঘরে একাকী রাখিয়া আসিতাম। ঘরের দরজা খোলা থাকিত; তাহাকে বলা হইত সে ভাল হইলেই যেন ঘর হইতে চলিয়া আসে। কয়েক মিনিট সে খুব জোরে চীৎকার করিয়া কাঁদিত তারপর শান্ত হইয়া বাহির হইয়া আসে এবং ভাল ব্যবহার করিতে থাকে। সে ইহা ভালভাবেই বুঝিত যে বাহিরে আসায় সে শান্ত আচরণের সর্ত মানিয়া লইয়াছে। আমাদিগকে ইহার চেয়ে কঠোরতর শাস্তি প্রয়োগ করিতে হয় নাই।

যাহারা কঠোর শাস্তি দিয়া শিশুকে শায়েস্তা করিতে চাহিতেন এমন প্রাচীনপন্থী শৃঙ্খলা-বিধানকারী ব্যক্তিদের বই পড়িয়া বোঝা যায় যে, বর্তমান প্রণালীতে শিক্ষিত শিশুদের অপেক্ষা প্রাচীন প্রণালীতে শিক্ষিত শিশুরা অনেক বেশী দুষ্ট ছিল। The Fair Child Family পুস্তকে শিশুদের যেরূপ আচরণের কথা উল্লেখ করা আছে, আমার ছেলে তাহার অর্ধেক খারাপ আচরণ করিলেই আমি স্তম্ভিত হইব। এরূপ ক্ষেত্রে আমি মনে করিব ছেলের পিতামাতার দোষই বেশী। আমি বিশ্বাস করি যে, বিচারবুদ্ধিবিশিষ্ট পিতা-মাতাই অনুরূপ সন্তান গড়িয়া তুলিতে পারেন। শিশুদের জীবনগঠনের পক্ষে

পিতামাতার স্নেহ বিশেষ প্রয়োজনীয়। সন্তানের প্রতি গুরু কর্তব্য ও দায়িত্ব সন্তানগণ বোঝে না বা তজ্জন্য কৃতজ্ঞও থাকে না। তাহারা চায় জনক-জননীর অন্তর নিঙড়ানো মধুর স্নেহ। শিশুকে ভালভাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে তাহাকে বুঝিতে দিতে হইবে যে, সে পিতামাতার স্নেহের অধিকারী। ইহা ছাড়া তাহাকে কোন কাজ বা আচরণ হইতে বিরত থাকিতে বলিলে অথবা কোন কাজ করিতে নিষেধ করিলে সম্পূর্ণ অসম্ভব না হইলে, ইহার কারণ তাহার নিকট যথাযথভাবে বুঝাইয়া বলা উচিত। খেলাধূলা করিতে গেলে অনেক সময় ছোটখাট আঘাত লাগে, হাত-পা কাটে বা ছাল উঠিয়া যায়; এরূপ বরং ঘটিতে দেওয়া ভাল তথাপি শিশুদিগকে দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটির খেলা হইতে নিবৃত্ত করা উচিত নয়। এরূপ কিছু কিছু অভিজ্ঞতা হইতে তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে যে, নিষেধ মানিয়া চলা বুদ্ধিমানের কাজ। যেখানে প্রথম হইতেই শিশুরা এইরূপ অবস্থার মধ্যে দিয়া শিক্ষা পাইতে থাকে সেখানে গুরুতর শাস্তি পাওয়ার যোগ্য কোন কাজ তাহারা করিবে না বলিয়া আমার বিশ্বাস।

শিশু যখন জেদ করিয়া ক্রমাগতই অন্য শিশুদের খেলায় প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে থাকে কিম্বা অন্যদের আনন্দে বাধা দেয় তখন শাস্তিস্বরূপ তাহাকে অপর শিশুদের কাছ হইতে পৃথক করিয়া সরাইয়া রাখা উচিত। এরূপ কোন শাস্তি দিতেই হইবে, কেননা একজনের দুষ্টামির জন্য অন্য সকলের আনন্দে বিঘ্ন হইতে দেওয়া কর্তব্য নয়। কিন্তু দিবার প্রয়োজন নাই যাহাতে সে যে বিশেষ দোষী সেই ভাব তাহার মনে হয়। সে যদি বুঝিতে পারে যে অন্যেরা যে আনন্দভোগ করিতেছে সে তাহা হইতে বঞ্চিত তবেই যথেষ্ট। এরূপ ক্ষেত্রে মাডাম মন্তেসারি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন :

আমরা অনেক সময় এমন শিশুদের সংস্পর্শে আসিয়াছি যাহারা কোন রকম সংশোধন বা উপদেশ কর্ণপাত না করিয়া অন্যের আনন্দে উৎপাত সৃষ্টি করিয়াছে। এরূপ শিশুকে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করান হয়। যখন দেখা যায় যে তাহাদের কোনরূপ শারীরিক অসুস্থতা নাই, তখন তাহাকে ধরিয়া কোণে ছোট একটি টেবিলে বসাইয়া অন্যের নিকট হইতে দূরে পৃথক করিয়া রাখা হয়। তাহা ছোট একটি হাত-ওয়ালা আরাম চেয়ারে এমনভাবে একটু উঁচুতে বসানো হয় যাহাতে সে অন্য ছেলে মেয়েদের খেলা দেখিতে পারে। যে সব খেলনা সে সব চেয়ে বেশী পছন্দ করে, তাই তাহাকে খেলিতে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়া প্রায় সকল ক্ষেত্রে শিশুকে শান্ত করিয়াছে পৃথক স্থানে

বসিয়া থাকিয়া সে অন্য সাথীদের খেলা দেখিতে পায় এবং তাহা তাহার নিকট বস্তুপাঠের (object lesson) মত কাজ করে। শিক্ষকের মৌখিক উপদেশ অপেক্ষা ইহা বেশী কার্যকরী হয়। ধীরে ধীরে সে অন্য সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া খেলার সুবিধা উপলব্ধি করিতে পারে, সে নিজেই সকলের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে চায়। এইভাবে যে সব শিশু প্রথমে আমাদের শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল তাহাদের সকলকেই শৃঙ্খলার মধ্যে আনিতে সক্ষম হইয়াছি। পৃথক করিয়া রাখা শিশুর প্রতি সর্বদা বিশেষ যত্ন লওয়া হইত, যেন সে পীড়িত। আমি নিজে কক্ষে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে তাহার কাছে যাইতাম; যেনসে অতি কচি শিশু। তারপর আমি অন্যদের প্রতি দৃষ্টি দিতাম, তাহাদের খেলায় কৌতূহল দেখাইতাম, তাহারা যেন ছোট ছোট বয়স্ক ব্যক্তি এইভাবে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতাম। যাহাদিগকে পৃথক করিয়া রাখিয়া শাস্তি দিতে হইত, তাহাদের মনে কি হইত তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহাদের আচরণের পরিবর্তন হইত স্থায়ী এবং সম্পূর্ণ। কেমন করিয়া কাজ করিতে হয়, কেমন করিয়া অন্যের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হয়,—ইহা শিখিতে তাহারা রীতিমত গর্ববোধ করিত। তাহারা অন্য শিক্ষয়িত্রী এবং আমার প্রতি সর্বদা প্রীতির ভাব দেখাইত।"

যে যে কারণের জন্য, এই প্রণালীতে সুফল পাওয়া যায়, তাহা আগেকার দিনের স্কুলে ছিল না। কোনরূপ অসুস্থতার জন্য শিশু খারাপ ব্যবহার করিতে সুরু করিলে এখন তাহাকে সরাইয়া পৃথক করিয়া রাখা হয়। তারপর এ প্রণালী প্রয়োগ করার কৌশল ও নিপুণতা তো আছেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব চেয়ে বড় কথা হইল, বেশীর ভাগ শিশুর শৃঙ্খলা মানিয়া চলার স্পৃহা। অবাধ্য শিশু একাই যেন জগতের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। কিন্তু ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারি না। যে স্কুলে শ্রেণীর সকল ছাত্রই হৈ চৈ করিয়া শৃঙ্খলা অমান্য করিতে উৎসুক, সেখানে শিক্ষককে এক সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষকের কি প্রণালী অবলম্বন করা উচিত তাহা আলোচনা করিতে চাই না, কেন না প্রথম হইতে শিশুকে উপযুক্তভাবে শিক্ষা দিলে শিক্ষকের শ্রেণীকক্ষে এরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টিই হইবে না।

তোষামোদ করিয়া শিক্ষাদান

শিশুরা শিক্ষণীয় বিষয় শিখিতে চায় তবে বিষয়টি শিখিবার উপযুক্ত হওয়া চাই এবং উপযুক্ত ভাবে শিক্ষা দেওয়া চাই। শৈশবে খাওয়ান ও ঘুমপাড়ানোর ব্যাপারে যে ভুল, শিক্ষাদানের ব্যাপারেও সেই ভুল করা হইয়া থাকে। শিশুর

পক্ষে যাহা করা উপকারী তাহার জন্য তাহাকে এমন তোষামোদ করা হয় যে সে ভাবে সে বুঝি তদ্দ্বারা বয়স্ক ব্যক্তিদিগকে কৃতার্থ করিতেছে। শিশুদের মনে অতি সহজেই এই ধারণা আসে যে, বয়স্ক ব্যক্তিরা চাহেন বলিয়াই তাহারা খায় এবং ঘুমায়। আহার ও নিদ্রায় কোনরূপ ব্যতিক্রম দেখাইলে অভিভাবকগণ ব্যস্ত হইয়া পড়েন, শিশুর অহমিকাবোধ তৃপ্ত হয়। এই অবস্থার বাড়াবাড়ি ঘটিলে শিশুর পরিপাক ক্রিয়া ও নিদ্রা দুই-ই ব্যাহত হয় এবং সে রুগ্ন হইয়া পড়ে। পরিচারিকা আমার ছেলেকে খোসামোদ করিয়া খাওয়ানো অভ্যাস করিয়াছিল, ইহার ফলে ক্রমেই সে জেদী হইয়া উঠিতে ছিল। একদিন দুপুরে তাহাকে আহার করিতে ডাকিলে সে পুডিং খাইতে অস্বীকার করিল। কাজেই ইহা রাখিয়া দেওয়া হইল। কিছুক্ষণ পরে সে নিজেই খাবার চাহিল কিন্তু তখন দেখা গেল পাচক তাহা খাইয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে সে সংযত হইয়া গেল এবং পরে আর কখনো আমাদের কাছে রাগের ভান করে নাই। শিক্ষা ব্যাপারে ঠিক এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। যদি কেহ শিক্ষা নিতে না চায় তাহাকে বাদ দেওয়া উচিত। তবে দেখিতে হইবে পাঠদান হইতে সে যতক্ষণ অনুপস্থিত থাকিবে, ততক্ষণ যেন আনন্দে সময় কাটাইতে না পারে। সে যদি অন্যকে শিখিতে দেখে, তাহা হইলে শীঘ্রই নিজেই শিখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিবে। শিক্ষক তখন তাহাকে সাহায্য করিতে পারেন; কাজটি এমনভাবে করিতে হইবে যেন শিশু বুঝিতে পারে যে, সে নিজেই উপকৃত হইতেছে, অপর কাহাকেও কৃতার্থ করিতেছে না। আমি স্কুলে একটি করিয়া বড় খালি কক্ষ রাখার পক্ষপাতী। পাঠে অনিচ্ছুক ছেলেদিগকে সেখানে পাঠান হইবে। একবার সেখানে গেলে সে দিন আর তাহাকে শ্রেণীতে ফিরিতে দেওয়া হইবে না। পাঠের সময় খারাপ ব্যবহার করিলে শাস্তিস্বরূপ তাহাদিগকে শূন্য কক্ষে নির্বাসন করিতে হইবে। সাধারণ নীতি এই যে অপরাধীকে এমন শাস্তি দিতে হইবে যাহা সে পছন্দ করে না। তথাপি ছাত্রের মনে প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি প্রীতি জন্মাইবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ পুস্তক হইতে লেখা নকল করার শাস্তি প্রদান করা হইয়া থাকে।

প্রশংসা ও নিন্দা

ছোট খাট রকমের অপরাধের জন্য (যেমন আচরণের অশোভনতা ইত্যাদি) মৃদু রকমের শাস্তির উপযোগিতা আছে। প্রশংসা ও নিন্দা ছোট শিশুদের এবং বয়স্ক বালক বালিকাদের পক্ষেও পুরস্কার ও শাস্তি হিসাবে বিশেষ প্রয়োজনীয়। যিনি ছোটদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন এমন লোক যদি

প্রশংসা বা নিন্দা করেন তবে ইহার গুরুত্ব আরো বাড়ে। প্রশংসা ও নিন্দা ব্যতীত শিক্ষাদান কার্য চলে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না, তবে ইহা প্রয়োগ করিতে কিছুটা সতর্কতা আবশ্যক।

প্রথমতঃ প্রশংসা বা নিন্দা তুলনামূলকভাবে প্রয়োগ করা উচিত নয়। কোন শিশুকে বলা ঠিক হইবে না—'তুমি অমুকের চেয়ে ভাল করিয়াছ' বা 'অমুকে অমুকে মোটেই খারাপ নয়'। প্রথমাটির ফলস্বরূপ তাহার মনে অবজ্ঞার ভাব উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় শত্রুতার সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দার প্রয়োগ কম করা দরকার। শিশু কোন অশোভন আচরণ করিলে শাস্তিস্বরূপ ইহা প্রয়োগ করিতে হইবে; ফল পাওয়া গেলে উহার প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই।

তৃতীয়তঃ, যে কার্যে বিশেষ কৃতিত্ব নাই, তাহার জন্য প্রশংসা করা অনুচিত। সাহস কিম্বা নূতন কৌশল প্রদর্শনের জন্য অথবা নিজের সম্বন্ধে কোন প্রকার নিঃস্বার্থপরতা দেখাইলে শিশুর নৈতিক শক্তির প্রকাশকে উৎসাহ দিবার জন্য প্রশংসা করিতে হইবে। শিক্ষা ব্যাপারে ছাত্র অনন্যসাধারণ ভাল কিছু করিলে তাহাকে প্রশংসা করা একান্ত আবশ্যক।

কঠিন কোন কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রশংসাপ্রাপ্তি তরুণদের নিকট অতি আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা; প্রশংসা লাভের কামনা তাহাদের কাজে প্রেরণা যোগায়, যদিও ইহা প্রধান উদ্দেশ্য নয়। কাজের প্রতি অনুরাগ ও নিষ্ঠাই প্রেরণার মূল উৎস হওয়া উচিত।

নিষ্ঠুরতা

চরিত্রের গুরুতর দোষগুলি, যেমন নিষ্ঠুরতা, শাস্তি দিয়া সংশোধন করা যায় না; তাহার জন্য শাস্তি প্রয়োগ করিলেও পরিমাণ খুব কম হওয়া বাঞ্ছনীয়। জীবজন্তুর প্রতি নিষ্ঠুরতা ছেলেদের মধ্যে কম বেশী স্বাভাবিক ভাবেই দেখা যায়; ইহা প্রতিরোধ করার জন্য যথা সময়ে শিক্ষার প্রয়োজন। আপনি যদি মনে করেন ছেলেকে যখন কোন প্রাণীর উপর নির্যাতন করিতে দেখিবেন, তখন তাহাকে শাসন করিবেন, তবে ভুল করা হইবে। এরূপ করিলে সে যাহাতে পরে আপনার নজরে না পড়ে সেই চেষ্টা করিবে। শিশুর যে ভাবটি পরে হয়ত নিষ্ঠুরতায় পরিণত হইতে পারে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রথম অবস্থাতেই তাহা দূর করা প্রয়োজন। ছেলেকে অপরের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা শিখান; সে যেন আপনাকে কোন প্রাণী, এমন কি বোলতা বা সাপও হত্যা করিতে না দেখে। যদি তাহা সম্ভবপর না হয়, তবে কোন্ কোন্ প্রাণী হত্যা করা হয় তাহা

সহজভাবে শিশুকে বুঝাইয়া দিন। সে যদি অপর ছোট শিশুর প্রতি নির্দয় ব্যবহার করে, আপনিও তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি সেইরূপ করুন। সে প্রতিবাদ করিবে; আপনি তখন তাহাকে বুঝাইবেন যে, সে যদি ইহা পছন্দ না করে, অন্যের প্রতিও তাহার নিষ্ঠুর আচরণ করা সঙ্গত নহে। এইভাবে অন্যেরও যে তাহার মতই সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে তাহা সে বুঝিতে পারিবে।

নিষ্ঠুরতা নিবারণের উপায়

শিশু অন্যের উপর নিষ্ঠুর আচরণ করিলে তাহার উপরও অনুরূপ আচরণ করিয়া যদি তাহার নিষ্ঠুরতার মনোভাব দূর করিতে চান, তবে এ প্রণালী প্রথম হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। ইহার কারণ স্পষ্ট। অন্যের উপর নির্দ্দয়তার প্রতিদানে শিশুর উপর যে অনুরূপ নির্দয় ব্যবহার করিবেন, তাহা তো গুরুতর হওয়া চলিবে না।

যখান নিষ্ঠুরতার প্রতিদানে নিষ্ঠুরতা প্রয়োগ করিবেন শিশু যেন বুঝিতে পারে আপনি রাগিয়া তাহাকে শাস্তি দিতেছেন না, তাহার শিক্ষার জন্যই ঐরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন। তাহাকে বলিতে পারেন—'দেখ তোমার ছোট-বোনকে তুমি এমনিভাবে কষ্ট দিয়েছ।' আঘাত পাইয়া ছেলে প্রতিবাদ করিবে। তখন আপনি বলিবেন—'বেশ, তোমার যদি ইহা ভাল না লাগে অন্যের উপরেও তো তোমার এরূপ করা উচিত নয়'। এইরূপে শিশু যদি সঙ্গে সঙ্গে সহজ-ভাবে শিক্ষা পায়, তবে তাহার এই ধারণা হইবে যে, অন্যের সুখদুঃখ বোধকে মানিয়া চলা উচিত। ইহার ফলে কখনো গুরুতর নিষ্ঠুরতার উদ্ভব হইবে না।

নৈতিক উপদেশ

নৈতিক উপদেশসকল ঠিক সময়ে এবং বস্তুসাপেক্ষ ভাবে (concrete) প্রয়োগ করা উচিত। শিশুকে উপদেশ দিবার জন্য আপনি ইচ্ছা করিয়া কোন ঘটনার অবতারণা করিবেন না। স্বাভাবিক ভাবে কোন ঘটনা ঘটিলে তখন তাহার সুযোগ লইবেন। মনে রাখিতে হইবে, একটিমাত্র সুযোগ অবলম্বন করিয়া ব্যাপকভাবে নানা উপদেশ দিলে কোন ফল হইবে না। কোন একটি বিশেষ ঘটনায় শিশু যে উপদেশ পাইবে পরে অনুরূপ কোন ক্ষেত্রে সে নিজেই উহা প্রয়োগ করিতে পারিবে। কোন্‌গুলি মানুষের সদ্‌গুণ এবং কি ভাবে তাহা প্রকাশ করিতে হয়, সে সম্বন্ধে সাধারণ নীতি জানিয়া তাহা অনুসরণ করা শিশুর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। কোন বিশেষ অবস্থায় কিরূপ আচরণ করিতে

হয় তাহা জানাই বরং তাহার পক্ষে সহজ। পরে অনুরূপ অবস্থা ঘটিলে সে পূর্বের অভিজ্ঞতার সাহায্যে যথাযথ আচরণ করিতে পারিবে।

সাহসী হও, দয়ালু হও, সাধারণভাবে এরূপ উপদেশ দিবেন না; বরং কোন বিশেষ ক্ষেত্রে তাহাকে সাহস দেখাইতে উৎসাহ দিন; পরে বলুন—'বেশ! এই তো তুমি সাহসী ছেলে, তাহার খেলনাটি তাহার ছোট ভাই বা বোনকে খেলিতে দিতে বলুন। খেলনা পাইয়া শিশু যখন আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিবে, তখন খোকাকে বলুন—'এই তো তুমি ঠিক কাজ করেছ। খোকার বেশ দয়া আছে। নিষ্ঠুরতা নিবারণ করিতেও এই নীতি প্রয়োগ করিতে হইবে। লক্ষ্য রাখিবেন কখনো ইহার সূচনা দেখিতে পান কিনা; নির্দয়তার ভাব বাড়িতে না দিয়া অঙ্কুরে ইহা নিবারণ করিতে হইবে।

সকল রকম চেষ্টা সত্ত্বেও যদি বয়স বাড়িলে শিশুর নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায়, তবে রোগের মত ইহার প্রতিবিধান করিতে হইবে। হাম বা অন্য কোন প্রকার রোগ হইলে শিশুকে যেমন অপ্রীতিকর অবস্থা ভোগ করিতে হয়, এক্ষেত্রেও তেমনি ভোগ করিতে হইবে; শিশু যে অপরাধী এবং দুষ্ট হইয়াছে, এমন ভাব তাহার মনে জন্মাইবার প্রয়োজন নাই। কিছু সময়ের জন্য তাহাকে অন্যান্য বালক বালিকা এবং প্রাণীর নিকট হইতে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে; তাহাকে বুঝাইতে হইবে যে, অপরের সঙ্গে তাহাকে মিশিতে দেওয়া নিরাপদ নয়। তাহার প্রতি অন্যে নির্দয় ব্যবহার করিলে তাহার কি দশা হইত তাহাও শিশুকে যথাসম্ভব বুঝান উচিত। তাহাকে ইহা উপলব্ধি করাইতে হইবে যে, নির্দয়তার আবেগ তাহার দুর্ভাগ্যের সূচনা করিতেছে এবং তাহার বয়োজ্যেষ্ঠরা তাহাকে ভবিষ্যতে ইহা হইতে রক্ষার চেষ্টাই করিতেছেন। আমার বিশ্বাস, অল্প কিছু মনোরোগবিশিষ্ট শিশু ছাড়া অন্য সকলের পক্ষেই এ প্রণালী সুফল প্রদান করিবে।

দৈহিক শাস্তির কুফল

দৈহিক শাস্তিদানকে আমি কখনই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করি না, তবে মৃদু আকারে দিলে ইহা বিশেষ ক্ষতি করে না, যদিও ভালও কিছু করে না, কঠোর আকারে দিলে ইহা নির্দয়তা সৃষ্টি করে। ইহা সত্য যে, শাস্তিদাতার প্রতি অনেক সময় শিশুর ক্রোধের উদ্রেক হয় না। যেখানে শিশুকে প্রায়ই শাস্তিভোগ করিতে হয়, সেখানে সে ইহাকে স্বাভাবিক মনে করে এবং নিজেকে ইহার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া নেয়। কিন্তু ইহা তাহার মনে এই ধারনা বদ্ধমূল

করে যে, কর্তৃত্ব বজায় রাখিবার জন্য এরূপ দৈহিক শাস্তি প্রদান করা ন্যায়-সঙ্গত। যে শিশু বয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হইয়া কর্তৃত্ব করিবে, তাহার পক্ষে এ শিক্ষা বিপজ্জনক।

তাহা ছাড়া পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে যে খোলা-খুলি সরল বিশ্বাসের সম্বন্ধ থাকা উচিত শাস্তির কঠোরতা তাহা নষ্ট করিয়া দেয়। আধুনিক পিতা চান তাঁহার পুত্রকন্যা তাঁহার উপস্থিতিতে নিঃসংকোচে অবস্থান করুক ; তাঁহাকে আসিতে দেখিলে তাহারা যেন খুশী হয়—তিনি ইহা চান। তিনি যতক্ষণ উপস্থিত আছেন ততক্ষণ সবাই মিথ্যা ভয়ে সংকোচে (কাচুমাচু হইয়া) চুপচাপ থাকিবে আর আড়ালে গেলেই নরকের তাণ্ডব সুরু করিবে—ইহা পিতার নিকট বাঞ্ছনীয় নয়। শিশুদের অকৃত্রিম প্রীতি লাভ করা জীবনের যে কোন বড় আনন্দ লাভের মতই লোভনীয়। আমাদের পূর্বপুরুষ-গণ এই আনন্দ কী জানিতেন না, কাজেই তাঁহারা কি হারাইতেছিলেন তাহাও বুঝিতেন না। তাঁহারা সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতেন যে, পিতামাতাকে ভালবাসা তাহাদের কর্তব্য কিন্তু কার্যত এই কর্তব্য পালন করা এক রকম অসম্ভব করিয়া তুলিতেন। এই অধ্যায়ের প্রথমে কবিতায় যে-মেয়েটির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার পিতা যখন বেত্রাঘাতে তাহাকে দমন করিতে আসিতেন, তখন সে নিশ্চয়ই খুশী হইত না। যতদিন পর্যন্ত লোকে বিশ্বাস করিত যে হুকুম করিয়া ভালবাসা আদায় করা সম্ভব, ততদিন তাহারা শিশুদিগের অকৃত্রিম প্রক্ষোভ (emotion) হিসাবে স্নেহ প্রীতি লাভ করিতে চেষ্টা করে নাই। ইহার ফলে মানুষের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ছিল কঠোর, রূঢ় ও নির্দয়। শিশুর শাস্তি বিধান এই সমগ্র মনোভাবের সঙ্গে সংযুক্ত এবং এই মনোভাব দ্বারাই পুষ্ট। ইহাই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, যে সকল লোক কোন স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে হাত তোলার কথা কল্পনাও করিতে পারিত না, তাহারাই অসহায় অরক্ষিত শিশুর উপর দৈহিক নির্যাতন করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না। সৌভাগ্যের কথা এই যে, গত একশত বৎসরের মধ্যে পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রীতির সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ইহারই ফলে শাস্তির নীতিই আগাগোড়া পাল্টাইয়া গিয়াছে। আমি আশা করি, শিক্ষাক্ষেত্রে যে উন্নতির ভাবধারার প্রবর্তন হইয়াছে তাহা ক্রমে মানুষের অন্যান্য কর্মক্ষেত্রেও প্রসারিত হইবে, কারণ আমাদের শিশুদের সহিত ব্যবহারে যেমন, অন্যত্রও তেমনি উহার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

দশম অধ্যায়

অপর শিশুর সাহচর্য

পিতামাতা এবং শিক্ষক কিভাবে নিজেদের চেষ্টায় শিশুর চরিত্রগঠনে সহায়তা করিতে পারেন, এ পর্যন্ত তাহাই আলোচনা করা হইয়াছে কিন্তু অনেক কিছু আছে যাহা অপর শিশুদের সাহায্য ব্যতীত বিকাশ করা যায় না। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীর প্রয়োজনও বাড়িতে থাকে; বাস্তবিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ছাত্রের সতীর্থ সঙ্গীর যত প্রয়োজন এমন আর কোন সময়ে নয়। শিশুর প্রথম বৎসরে প্রথম কয়েক মাসে অন্য শিশুর কোন প্রয়োজনই হয় না, শেষ তিন মাসে সামান্য সাহায্য করে মাত্র। এই সময় কিঞ্চিৎ অধিক বয়স্ক শিশুরা উপকারে আসে। পরিবারের প্রথম শিশু সাধারণতঃ হাঁটিতে এবং কথা বলিতে শিখিতে বেশী সময় নেয়, কারণ বয়স্ক ব্যক্তিদের কার্য-কলাপ ও শক্তি তাহার তুলনায় এত বেশী যে তাহাদিগকে অনুসরণ করা কঠিন। এক বছর বয়সের শিশুর কাছে তিন বছরের শিশুই বেশী অনুকরনযোগ্য কারণ তিন বছরের শিশু যাহা করে ছোট শিশুও তাহা করিতে চায় এবং তাহার শক্তিও অসাধারণ বলিয়া মনে হয় না। শিশুদের নিকট অন্য শিশুরাই বেশী সমগোত্র, বয়স্ক ব্যক্তিরা নয়; অন্য শিশুরাই তাহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে, কাজে প্রেরণা দেয়। পরিবারেই কেবল ছোট শিশুরা অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সের শিশুদের নিকট হইতে এরূপ শিক্ষার সুযোগ পায়। খেলার সময় যদি শিশুকে সাথী নির্বাচন করিতে দেওয়া হয়, তবে সে তাহার চেয়ে বেশী বয়সের শিশুকেই সাথীরূপে বাছিয়া লইবে; ইহাতে তাহার অহমিকাবোধ তৃপ্ত হয়, সে যে উপরের স্তরের শিশুদের সমকক্ষ হইতে পারিয়াছে ইহা ভাবিয়া আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু বয়স্ক শিশুরা আবার তাহাদের চেয়ে বৈশী বয়সের ছেলেদের সঙ্গ কামনা করে। তাই দেখা যায় স্কুলে কি বস্তীর রাস্তায়, কি অন্যত্র প্রায় সমবয়সী ছেলেরাই একত্রে খেলে; অধিক বয়সের ছেলেরা ছোটদের সঙ্গে খেলিয়া আনন্দ পায় না। এইভাবে দেখা যায় কিঞ্চিৎ বেশী বয়সের শিশুদের সাহচর্যে যে সুবিধা তাহা কেবল গৃহে লাভ করাই সম্ভবপর। কিন্তু ইহার একটি অসুবিধা এই যে, প্রত্যেক পরিবারেই জ্যেষ্ঠ শিশু এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়। পরিবার যত ছোট হয়, বড় শিশুর হারও তত কমিয়া আসে: কাজেই এ অসুবিধা ক্রমে বাড়িয়াই চলে। নার্সারি স্কুলে শিক্ষা দ্বারা শিশুদের অপরশিশুর সাহচর্য লাভের অভাবপূরণ না করিলে ছোট পরিবার শিশুদিগের

শিক্ষায় ও আত্মবিকাশে অসুবিধাই সৃষ্টি করে। নার্সারি স্কুলের উপযোগিতা কি এ সম্বন্ধে পরে এক অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে।

বেশীবয়সী শিশুর উপকারিতা :

শিশুর ক্রমবিকাশে সহায়তা করার জন্য বেশী বয়সী, কম বয়সী অপর শিশুদের প্রয়োজন আছে। স্কুলে বা অন্যত্র সমবয়সী শিশুরাই একত্র হইয়া খেলাধূলা করে; গৃহেই প্রথমোক্ত দুই প্রকার শিশুর সহচর্য সীমাবদ্ধ থাকে। বেশী বয়সী শিশুরা ছোটদের সম্মুখে এমন এক আদর্শ তুলিয়া ধরে যাহা তাহাদের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব। শিশুরা যাহাতে তাহাদের বড়দের খেলায় যোগদানের যোগ্য হইতে পারে সেজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। বেশী বয়সী শিশুরা ছোটদের সঙ্গে খেলিতে স্বাভাবিকভাবে খেলে, কোন প্রকার ভান করে না। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিরা সেরূপ করিতে পারে না। তাহার কারণ বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে শিশুর শক্তির সমতা নাই; সে নিজের সুখের জন্য শিশুর সঙ্গে খেলে না, শিশুকে আনন্দ দেওয়ার জন্যই খেলে, কাজেই তাহার পক্ষে ভান না করিয়া উপায় নাই। সে শিশুকে নিজের সমকক্ষ মনে করিতে পারে না, করা উচিতও নয়। শিশু যেমন সহজে ও সানন্দে বড় ভাইবোনদের অনুগত হয় তেমন কোন বয়স্ক ব্যক্তির হয় না; অবশ্য যদি অতিরিক্ত শাসন করা হয় তবে অন্য কথা; এরূপ ক্ষেত্রে শিশু ক্রীতদাসের মত বয়স্ক ব্যক্তির অনুগত হয়, ইহাতে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ থাকে না।

অপরের অনুগত হইয়া কোন কাজে সহযোগিতা করার অভ্যাস শিশুরা অপর শিশুর নিকট হইতে লাভ করে। বয়স্ক ব্যক্তিরা ইহা শিক্ষা দিতে গেলে দুইটি অসুবিধা দেখা দেয়। প্রথম, তাঁহারা যদি জোর করিয়া সহযোগিতা আদায় করিতে না চান, তবে শিশুদের মিথ্যা ভানকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করার ভান করিতে হইবে। সহযোগিতা—তাহা সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক তাহার যে কোন মূল্য নাই বা তাহা যে সর্বদা বর্জনীয় এমন কথা বলিতেছি না। বেশী বয়সী ও কম বয়সী শিশুর মধ্যে যে সহযোগিতা থাকে তাহা যেমন স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত, বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে ছোটদের সহযোগিতায় তেমন সম্ভবপর নয়। এরূপ অবস্থায় উভয় পক্ষ বহুক্ষণ সানন্দে সহযোগিতা করিতে পারে না।

বাল্য, কৈশোর, যৌবন সকল অবস্থাতেই কমবয়সীদের শিক্ষাদান ব্যাপারে কিছু বেশী বয়সীদের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান থাকে; এ শিক্ষা শ্রেণীর পাঠদান হইতে স্বতন্ত্র—ইহা কাজের সময়কার বাহিরের শিক্ষা। কিছু বেশী বয়সী ছেলে বা মেয়ে তাহাদের চেয়ে কিছু কমবয়সীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা জন্মায় ও কর্ম-প্রেরণা দান করে; ছোটদের কোন কঠিন সমস্যা তাহারা বয়স্ক ব্যক্তিদের চেয়েও ভাল-

ভাবে বুঝাইয়া দিতে পারে, কারণ তাহারা নিজেরাও এ সমস্যার সমাধান করিয়া বিষয়টি অধিগত করিয়াছে এবং সেই জন্যই তাহারা ছোটদের অসুবিধা ভাল ভাবে বুঝিতে পারে ও তাহা দূর করিবার উপায় দেখাইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে আমি আমার চেয়ে কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠদের নিকট হইতে এমন অনেক কিছু শিখিয়াছিলাম যাহা প্রবীণ জ্ঞানবৃদ্ধ অধ্যাপকদিগের নিকট হইতে শিখিতে পারিতাম না। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক জীবনে ছাত্রদের বয়সের তারতম্য ভিন্ন ভিন্ন কঠিন স্তর সৃষ্টি করে না, অর্থাৎ বয়সের পার্থক্য থাকিলেও ছাত্রগণ পরস্পরের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মেশে এবং ভাবের বিনিময় করে সেখানেই বেশীবয়সীদের প্রভাব কমবয়সীদের সুফল প্রদান করে কিন্তু যেখানে বেশীবয়সী ছাত্ররা কমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশাকে 'মর্যাদাহানিকর' মনে করে সেখানে এরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই ;

ছোট ছোট ছেলেমেয়ের—বিশেষ করিয়া তিন হইতে ছয়বৎসর বয়স্কদের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাহারা কিঞ্চিৎ বেশীবয়সীদের কতকগুলি নৈতিক গুণবিকাশে সহায়তা করে। শিশু যখন বয়স্ক ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকে তখন যে গুণগুলি দুর্বলের সঙ্গে আচরণে বিকাশলাভ করে, সেগুলি আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায় না। শিশুকে শিখানো দরকার—তাহার ছোট ভাইবোনেদের জিনিস কাড়িয়া নিতে নাই, ছোট কেহ হঠাৎ যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে তাহার ইটের খেলনা ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলে তবে অত্যধিক রাগ দেখাইতে নাই, তাহার অব্যবহৃত খেলনা যদি অন্য কেহ চায় তবে জমাইয়া না রাখিয়া দেওয়াই ভাল ইত্যাদি। তাহাকে শিখানো দরকার যে, কাচা শিশুকে অসতর্কভাবে বা শক্তভাবে ধরিয়া নাড়াচাড়া করিলে সে ব্যথা পায়। অনিচ্ছায় এইভাবে কোন শিশুকে ব্যথা দিয়া কাঁদাইলে তাহার নিজেরও মনে কষ্ট অনুভব করা উচিত। এমনি ছোট শিশুকে রক্ষা করিতে বয়স্ক ব্যক্তিদিগকেও শক্ত কথা শুনানো বা ধমক দেওয়া যায় কিন্তু অন্য কোন কারণে এরূপ করা শোভণ হইবে না ; এইরূপ অপ্রত্যাশিত আচরণ ছোটদের মনের উপর দাগ রাখিয়া যায়। এ সবই শিক্ষাপ্রদ কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি না হইলে অন্য কোন উপাযে এ শিক্ষা দেওয়া চলে না।

শিশুকে বস্তুনিরপেক্ষ সাধারণ নৈতিক উপদেশদান সময়ের অপব্যবহার ও মূর্খতারই পরিচায়ক। শুধু বাস্তব ঘটনাই শিশুর কাছে সত্য ; ঘটনা ও স্বাভাবিকভাবে ঘটা চাই। বয়স্ক ব্যক্তিরা যাহা মনে করেন নৈতিক উপদেশ, শিশুর নিকট তাহার বিশেষ কোন আকর্ষণ নাই। শিশু উপদেশ হইতে তেমন শেখে না যেমন শেখে উদাহরণ হইতে। এজন্যই শিশুর নিকট উপদেশের চেয়ে উদাহরণের মূল্য বেশী। মিস্ত্রিকে কাজ করিতে দেখিলে শিশু তাহার কাজ

অনুকরণ করে, শিশু তাহার পিতামাতাকে অন্যের ভদ্র ও সদয় ব্যবহার করিতে দেখিলে নিজেও তাহা অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। এ উভয়ক্ষেত্রে শিশু যাহা অনুকরণ করিতে চায় তাহা মর্যাদাকর মনে করে। আপনি নিজে যদি ছেলেকে মিস্ত্রির সহিত খুব ভালভাবে ব্যবহার করার উপদেশ দেন কিন্তু যেমন তেমন করিয়া ব্যবহার করেন তবে আপনার উপদেশ কার্যকরী হইবে না। আপনি যদি শিশুকে তাহার ছোটবোনের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন কিন্তু নিজেই তাহার উপর নির্দয় আচরণ করেন তবে আপনার উপদেশ ব্যর্থ হইবে। যদি আপনার কোন কাজের ফলে ছোট শিশু কাঁদে—যেমন নাক পরিষ্কার করিয়া দিতে গেলে কাঁদিতে পারে—তবে তাহার চেয়ে বেশীবয়সী শিশুদিগকে এরূপ কাজের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিবেন। নতুবা তাহারা আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আপনাকে নির্দয় আচরণ হইতে থামাইতে চেষ্টা করিতে পারে। আপনার আচরণে শিশুর মনে যদি এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, ছোট শিশুকে কাঁদাইয়া আপনি নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছেন, তবে তাহার নিষ্ঠুরতার আবেগকে দমন করা আপনার পক্ষে সম্ভব হইবে না।

সমবয়সীদের উপযোগিতা :

বেশী বয়সী ও কম বয়সী শিশুদের প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু সমবয়সীদের প্রয়োজনীয়তা আরো বেশী, বিশেষতঃ শিশুর চার বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া বেশীর দিকে। সমবয়স্কদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করিতে হয় তাহা শেখা বিশেষ দরকার। জগতে যতকিছু অসমতা তাহার অধিকাংশই কৃত্রিম; আমাদের আচরণের ভিতর দিয়া এগুলি দূর করিতে পারিলেই সবচেয়ে ভাল হইত। ধনীলোকেরা নিজেদিগকে তাঁহাদের পাচক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন এবং সমাজে যেরূপ আচরণ করেন পাচকের সঙ্গে সেরূপ করেন না। কিন্তু তাঁহারাই আবার একজন ডিউকের চেয়ে নিজেদিগকে নিকৃষ্ট মনে করেন এবং তাহার সঙ্গে আচরণে তাঁহাদের আত্মমর্যাদাবোধে অভাবই পরিলক্ষিত হয়। এ দুই জায়গাতেই তাঁহারা ভুল করেন; পাচক এবং ডিউক উভয়ের প্রতি একইরূপ ভাব পোষণ করা এবং একইরূপ আচরণ করা উচিত। যৌবনে বয়সের তারতম্য অনুসারে স্তরভেদ করা হয় যাহা কৃত্রিম নয়; এই জন্যই যে সামাজিক অভ্যাসগুলি পরবর্তীকালে কাজে লাগিবে তাহা সমবয়সীদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে অর্জন করা উচিত। সমানে সমানে সকল খেলা এবং স্কুলের প্রতিযোগিতা ভাল জমে। স্কুলে যে সুনাম বা প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহা সে অর্জন করে নিজের চেষ্টায়। সে সকলের প্রশংসা লাভ করিতে পারে অথবা

সকলের ঘৃণার পাত্রও হইতে পারে ; ইহা নির্ভর করে তাহার চরিত্র ও শক্তির উপর। স্নেহশীল পিতামাতা সন্তানকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়া আদুরে গোপাল সৃষ্টি করেন, এরূপ ক্ষেত্রে ছেলে আত্মশক্তি প্রকাশে বিশেষ উৎসাহিত হয় না ; সন্তানের প্রতি স্নেহশীল পিতামাতা এমন কঠোর পরিবেশ সৃষ্টি করেন যেখানে শিশুর স্বতঃপ্রবৃত্ততা রুদ্ধ হইয়া যায়। কাজেই দেখা যায় অতিরিক্ত স্নেহ প্রদর্শনের ফলে যেসব শিশুর কর্মশক্তি লোপ পায়, অতিরিক্ত কঠোরতার ফলেও তেমনি তাহার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কাজের উৎসাহ ও উত্তম নষ্ট হইয়া যায়। সমবয়সীরাই কেবল মুক্ত প্রতিযোগিতায় এবং সমানভাবে সহযোগিতার ভিতর দিয়া শিশুদের কাজে স্বতঃস্ফূর্তি আনিতে পারে। স্বেচ্ছাচারিতা না দেখাইয়াও কিভাবে আত্মসম্মান বজায় রাখা যায়, হীনতা প্রকাশ না করিয়া কিভাবে অন্যের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করা যায় সমবয়সীদের সঙ্গে আচরণের মাধ্যমেই তাহা ভালভাবে শিক্ষা করা যায়। এই জন্য শিশুরা ভাল স্কুলে সদাচরণ শিক্ষার যে সুবিধা পায় পিতামাতা হাজার চেষ্টা করিয়াও বাড়িতে তাহা দিতে পারেন না।

শিশু ও কিশোরের জীবনে সমবয়সীদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলা হইল। আরো কয়েকটি কারণে তাহাদের সঙ্গলাভ একান্ত আবশ্যক। শিশুর দেহ ও মনের সুস্থ বিকাশের জন্য খেলা অত্যাবশ্যক কিন্তু প্রথম বছরের পর শিশু অন্য ছেলেমেয়ের সঙ্গে না হইলে খেলিয়া আনন্দ পায় না। খেলিতে না পাইলে শিশু হয় দুর্বল ; জীবনের আনন্দের আস্বাদ সে পায় না। আনন্দই শিশুর জীবন-রসায়ণ। ইহা হইতে বঞ্চিত হওয়ায় তাহার মনে উৎকণ্ঠা বাড়িয়া উঠিতে থাকে। অবশ্য শিশুকে তিন বৎসর বয়স হইতেই একটি বিদেশী ভাষা শিখাইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার বালসুলভ চপলতা হইতে দূরে সরাইয়া রাখা যায়, যেমন ঘটিয়াছিল জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবনে। কেবল জ্ঞানসঞ্চয় দিক হইতে বিবেচনা করিলে ইহার ফল ভালই হয় বলিতে হইবে কিন্তু সকল দিক বিবেচনা করিয়া এ-প্রণালীর প্রশংসা করা যায় না। মিল তাঁহার আত্মজীবনীতে, বলিয়াছেন—কৈশোরের একসময়ে তাহার মনে দারুণ উৎকণ্ঠা উপস্থিত হইয়াছিল এই ভাবিয়া যে, নানা সুরের সংমিশ্রণ কোন না কোন সময় শেষ হইয়া যাইবে ; তখন তো আর নূতন গান রচনা করা চলিবে না। এই দুশ্চিন্তায় তিনি আত্মহত্যা করার উপক্রম করিয়াছিলেন। ইহা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এই ধরণের মানসিক আলোড়ন স্নায়বিক দুর্বলতারই পরিচায়ক। মিলের পিতাও একজন বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন কিন্তু পিতার দার্শনিক মত যে কোথাও ভুল হইতে পারে পুত্র তাহা চিন্তাই করিতে পারিতেন না। তাঁহার মানসিক দাসত্ব এইভাবে তাঁহার বিচার-শক্তির মূল্য অনেকটা হ্রাস করিয়া

দিয়াছিল। সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে দিয়া যৌবনে উপনীত হইলে হয়তো মিল আরো বেশী সতেজ বুদ্ধি ও অধিকতর মৌলিকতার অধিকারী হইতেন। আর যাহাই হউক, জীবন উপভোগ করার শক্তি তিনি নিশ্চয় অনেক বেশীমাত্রায় লাভ করিতে পারিতেন। আমি নিজেও ষোল বৎসর বয়স পর্যন্ত সমবয়সীদের সঙ্গ ও সাধারণ আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া নিঃসঙ্গভাবে লালিত হইয়াছিলাম। মিল যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, কৈশোরে আমারও ঠিক ঐরূপ অবস্থা মনে আসায় আমিও আত্মহত্যার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। আমার মনে হইয়াছিল—গতিবিজ্ঞানের নিয়মানুসারেই দেহ চালিত হইতেছে, ইচ্ছা বলিয়া কোন কিছু নাই, ইহা নিছক ভ্রান্তিমাত্র। এই চিন্তা দুশ্চিন্তার আকার ধারণ করিয়া আমার আত্মহত্যার বাসনা জাগাইয়াছিল। পরে সমবয়সীদের সঙ্গে মেলা-মেশা করার সময় বুঝিলাম, কাহারো সঙ্গে আমার মতের বনিবনা হয় না। আমার চিন্তা ও ভাবধারার পরিবর্তন হইয়াছে কিনা, কতদূরেই বা আমি আগের মতই আছি তাহা আমার পক্ষে বলা সম্ভবপর নয়।

সমবয়সীদের সঙ্গে মেলা-মেশার স্বপক্ষে সব রকম যুক্তি প্রয়োগ করা সত্ত্বেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, কতক বালকবালিকাকে স্কুলে পাঠান উচিত নয়। ব্যক্তিহিসাবে ইহাদের মধ্যে অসাধারণত্ব থাকিতে পারে। কোন বালকের যদি দৈহিক দুর্বলতার সঙ্গে অস্বাভাবিক (abnormal) মানসিক শক্তি থাকে তবে সে সাধারণ সঙ্গীদের সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে নাও পারে, হয়ত বা সঙ্গীরা ক্ষেপাইয়া উত্যক্ত করিয়া তাহাকে পাগল করিয়া দিতে পারে। অসাধারণ মানসিক শক্তি অনেক সময় পাগলামির পর্য্যায়ে পড়ে, এরূপক্ষেত্রে অস্বাভাবিক মনীষাসম্পন্ন বালকের জন্য পৃথক ব্যবস্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। প্রথমে বালকের অস্বাভাবিক অনুভূতিশীলতার কারণ অনুমান করিয়া ধৈর্য ও যত্নের সহিত ইহা নিরাময় করার চেষ্টা করিতে হইবে। বালক যাহাতে অত্যাচারিত না হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আমার মনে হয় শৈশবে শিশুর শিক্ষার ত্রুটির মধ্যে ইহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। শৈশবে কুশিক্ষার ফলে পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত অথবা স্নায়ুর বিকলতা ঘটা অসম্ভব নয়। শৈশবে যথোপযুক্তভাবে এবং বিজ্ঞতার সহিত লালন-পালন করিলে অধিকাংশ শিশুই সুস্থ, সবল, স্বাভাবিকরূপে বাড়িয়া উঠে, অন্য শিশুদের সঙ্গ তাহাদের দেহের এবং মনের শক্তিবিকাশে অনুকূল অবস্থাই সৃষ্টি করে। তবু খুব অল্প-সংখ্যক ক্ষেত্রে হয়ত ব্যতিক্রম দেখা দিতে পারে, যেমন দেখা যায় প্রতিভাবান-দের জীবনে। এরূপ অবস্থায় অসাধারণ বালককে বরং স্কুলে না পাঠাইয়া নিরিবিলিতে আত্মবিকাশের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া উচিত।

একাদশ অধ্যায়

স্নেহ ও মনোবেদনা

অনেকে মনে করিতে পারেন অকারণে আমি এ পর্যন্ত স্নেহ সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ করি নাই, অথচ শিশুর সুচরিত্রের ইহা একটি প্রধান উপাদান। ইহা স্বীকার্য যে, স্নেহ ও জ্ঞান যথাযোগ্য আচরণের জন্য একান্ত আবশ্যক কিন্তু উন্নতির শিক্ষার আলোচনা প্রসঙ্গে আমি স্নেহ বা ভালবাসা সম্বন্ধে কিছুই বলি নাই, তাহার কারণ আছে। আমার উদ্দেশ্য এই যে, শিশুকে যত্নের সঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষা দিলে তাহার ফলস্বরূপ স্নেহপ্রীতি আপনা আপনি বিকাশ লাভ করিবে, সচেতন চেষ্টা দ্বারা জোর করিয়া শিশুর কাছ হইতে ইহা আদায় করার কোন প্রয়োজন নাই। কি ধরণের স্নেহ বাঞ্ছনীয় এবং শিশুর ক্রমবিকাশের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে তাহার মন, প্রকৃতি কেমন থাকে তাহাও জানা দরকার। দশ-বারো বৎসর হইতে যৌবনাগম পর্যন্ত বালকের স্নেহপ্রীতি বিশেষ মোটেই থাকে না এবং প্রকৃতির উপর জোর করিয়াও কোন লাভ নাই।

বয়স্ক ব্যক্তি সমবেদনা দেখানোর যতখানি সুযোগ পায় তরুণ কিশোর ততখানি পায় না, কারণ ইহা প্রকাশের ক্ষমতা তাহাদের কম, তাহা ছাড়া অন্যের কথা বাদ দিয়া নিজেদের জীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার চেষ্টাতেই তাহারা থাকে বিভোর। এইসব কারণে অল্প বয়সে শিশুর মধ্যে অকালে এই গুণগুলির বিকাশ ঘটাইবার চেষ্টা না করিয়া আমাদের বরং বয়স্কব্যক্তিকে সহানুভূতিশীল ও স্নেহপরায়ণ করিয়া গড়িবার চেষ্টা করা উচিত।

বালকের মনে স্নেহবিকাশের সমস্যা চরিত্রের শিক্ষায় অন্যান্য সমস্যার মতই বিজ্ঞানসম্মত; ইহাকে মনস্তাত্ত্বিক গতিবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বলা যায়। শিশুর কাছে কর্তব্য হিসাবে স্নেহভালবাসার অস্তিত্ব নাই। পিতামাতাকে এবং ভাই-বোনকে ভালবাসা উচিত শিশুকে একথা বলা নিরর্থক। আদেশ করিলে বা উপদেশ দিলেই শিশু ভালবাসিতে সুরু করিবে না। যে পিতামাতা সন্তানের ভালবাসা চান তাঁহাদিগকে নিজেদের আচরণ দ্বারা পুত্রকন্যার অন্তরে ইহার উদ্বোধন করিতে হইবে। সন্তানদিগকে এমন দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য দানের চেষ্টা করিতে হইবে যাহা স্বাভাবিকভাবে তাহাদের মনে জনক-জননীর প্রতি প্রীতির ভাব জাগায়।

অপত্য-স্নেহের স্বরূপ :

শিশুদিগকে কখনই তাদের পিতামাতাকে ভালবাসিতে আদেশ করা উচিত হইবে না ; শুধু তাহাই নয়, এমন কিছু করা উচিত নয় যাহার উদ্দেশ্য একই, অর্থাৎ অপত্যস্নেহের প্রতিদানে পিতামাতার প্রতি সন্তানের প্রীতির বিকাশ। এইখানে অপত্যস্নেহের সঙ্গে যৌনভালবাসার পার্থক্য। যৌনভালবাসার ব্যাপারে একপক্ষের আবেদনে (প্রতিদানে) অন্যপক্ষের সাড়া একান্ত আবশ্যক ; ইহা স্বাভাবিক, জৈবিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ইহার প্রয়োজন। কিন্তু অপত্য-স্নেহের প্রতিদানে সন্তানের নিকট হইতে সাড়া পাওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই। বিশুদ্ধ অপত্যস্নেহ পিতামাতার মনে এমন একটি ভাব জাগ্রত করে যাহার ফলে তাঁহারা সন্তানকে নিজেদের একটি (বাহ্য) পৃথকীকৃত অংশ বলিয়া মনে করেন। আপনার পায়ের বুড়া আঙুল যদি আহত হয় আপনি নিজ-স্বার্থেই তাহার যত্ন পরিচর্যা করেন; বুড়ো আঙুলের নিকট হইতে প্রতিদানে কৃতজ্ঞতা আশা করেন না। আমার মনে হয় অসভ্য বন্য রমণী তাহার সন্তানের প্রতি ঠিক এমনি ভাব পোষণ করে। সে যেমন নিজের মঙ্গল চায় তেমনি চায় সন্তানের মঙ্গল, বিশেষ করিয়া যতদিন শিশু নিতান্ত ছোট থাকে। নিজ-দেহের যত্ন লওয়ার সময় যেমন সে আত্মত্যাগ (self-denial) করিতেছে বলিয়া ভাবে না, তেমনি সন্তানে যত্ন-পরিচর্যা করার সময়ও সন্তানের জন্য আত্মত্যাগ করা হইতেছে বলিয়া তাহার মনে হয় না ; কাজেই কোন প্রতিদানের আশা সে করে না। যতদিন শিশু অসহায় থাকে ততদিন যে সে জননীকে একান্তভাবে চায় ইহাই জননীর স্নেহের প্রতিদান। পরে, সে যখন ক্রমে বাড়িয়া উঠে, জননীর স্নেহ কমিয়া আসে এবং সন্তানের উপর প্রতিদানে কোন কিছুর দাবী বাড়িতে থাকে। জীবজন্তুর মধ্যে দেখা যায় সন্তান সাবালক হইলে অপত্যস্নেহ ফুরাইয়া যায় ; জনক-জননী সন্তানের উপর কোন দাবীও রাখে না কিন্তু মানুষের সমাজে, এমনকি আদিম মানুষের মধ্যেও, ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। পুত্র যখন সবল বলিষ্ঠ যোদ্ধাতে পরিণত হয় তখনও পিতামাতা কামনা করে যে তাহাদের বার্ধক্যে সে তাহাদিগকে ভরণ-পোষণ করিবে। মানুষের দূরদৃষ্টি বৃদ্ধির ফলে পিতামাতা অপত্যস্নেহ হইতেও কিছু লাভের আশা করিতে সুরু করে। বৃদ্ধ বয়সে তাহারা দুর্বল ও অক্ষম হইয়া পড়ে ; সন্তানকে সস্নেহে পালন করার প্রতিদানে তাহারা বার্ধক্যে যত্ন ও সাহায্য আশা করে। ইহা হইতেই জনক-জননীর প্রতি সন্তানের কর্তব্যের মূলনীতির উৎপত্তি ; মানুষের ধর্ম-শাস্ত্রেও এই নীতি স্থান পাইয়াছে। পরে ক্রমে যখন সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা গড়িয়া উঠে এবং মানুষ ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিকার ও ভোগ করিতে থাকে তখন বৃদ্ধ

জনক-জননীর অসহায় ভাব অনেকটা কমিয়া আসে, নিজের সম্পত্তি থাকিলে তাহাদিগকে তো বয়স্ক সন্তানের উপর ভরণপোষণের জন্য নির্ভর করিতে হইবে না। মানুষ যখন ইহা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে তখন পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যবোধও নীতিহিসাবে ক্রমে লোপ পায়। বর্তমান জগতে পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক লোকও আশী বৎসরের বৃদ্ধ পিতামাতার উপর আর্থিক দিক দিয়া নির্ভরশীল হইতে পারে, কাজেই এখনো পিতার প্রতি সন্তানের ভালবাসার চেয়ে সন্তানের প্রতি পিতার স্নেহই প্রধান হইয়া রহিয়াছে। ইহা অবশ্য বিত্তশালী লোকদের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। দিন মজুরদের জীবনে পিতাপুত্রের মধ্যে পূর্বের ভাবই এখনো বর্তমান আছে, তবে বৃদ্ধ বয়সে পেনসন বা ভাতার ব্যবস্থা থাকার ফলে এভাবও ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছে। পিতামাতার প্রতি সন্তানের স্নেহ ক্রমে গুণের তালিকা হইতে বাদ পড়িতেছে কিন্তু সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহ শিশুর জীবনে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের স্নেহের সম্পর্ক, কিন্তু মনঃসমীক্ষকগণ এ সম্বন্ধে কিছু নূতন তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। তবে এগুলি বিচারসহ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। পিতা বা মাতার প্রতি সন্তানের অত্যধিক অনুরাক্তিকে ইঁহারা যৌনবাসনার নবরূপ প্রকাশ বলিয়া মনে করেন।

পিতা বা মাতার প্রতি অত্যধিক অনুরাগ :

পিতা বা মাতার পক্ষে কোন বয়স্ক সন্তানকে, এমন কি কিশোরকেও এমনভাবে আবৃত করিয়া রাখা উচিত নয় যাহাতে সে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে বা অনুভব করিতে না পারে। জনক বা জননীর ব্যক্তিত্ব যদি সন্তানের চেয়ে প্রবলতর হয় তবে এরূপ সহজেই ঘটিতে পারে। দুই-একটি মনোবিকারগ্রস্ত রুগ্ন ব্যক্তির কথা বাদ দিলে আমি বিশ্বাস করি না যে, ছেলেদের মায়ের প্রতি এবং মেয়েদের পিতার প্রতি বিশেষ আকর্ষণের কোন যৌনগত গূঢ় কারণ আছে। যেখানে পিতামাতার অত্যধিক প্রভাব বিদ্যমান সেখানে পিতা বা মাতা যিনিই সন্তানের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিবেন তাঁহার প্রভাবই বেশী অনুভূত হইবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জননীই সন্তানের সংস্পর্শে বেশী আসেন এবং তাঁহার প্রভাবই সন্তানের উপর বেশী পড়ে—সন্তান পুত্র কি কন্যা তাহা বিচার করিয়া প্রভাবের মাত্রা কমবেশী হয় না। অবশ্য এমন হইতে পারে যে, কোন মেয়ে তাহার জননীকে পছন্দ করে না এবং পিতার সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায় না, সে হয়ত মনে মনে পিতাকেই আদর্শরূপে কল্পনা করিয়া লইতে পারে। এরূপ

ক্ষেত্রে পিতা কিন্তু নিজে কন্যার মনে প্রভাব বিস্তার করেন না, কন্যা নিজেই পিতাকে কল্পনার রঙে ও মায়াস্বপ্নের মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়া নিজের অন্তরে স্থাপিত করিয়াছে। একটি সুতা অবলম্বন করিয়া যেমন মিছরি দানা বাঁধিয়া উঠে, দেওয়ালের গায়ের একটি গোঁজার সঙ্গে যেমন জিনিস ঝুলাইয়া রাখা যায়, তেমনি কোন একটা খুঁটি অবলম্বন করিয়া মনের ভাব আদর্শরূপে গড়িয়া উঠে। খুঁটিটি ভাবের আরোপ-ক্ষেত্র মাত্র; ভাব বা আদর্শের প্রকৃতির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। এখানে পিতাকে ঘিরিয়া কন্যার মানসিক ভাব পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে মাত্র কিন্তু পিতা এজন্য মোটেই দায়ী নন। যেখানে পিতামাতার অপরিমিত প্রভাব বিস্তার করিয়া সন্তানকে আচ্ছন্ন রাখেন সেখানকার অবস্থা স্বতন্ত্র।

কোন বয়স্ক ব্যক্তি যদি শিশুর নিত্যসঙ্গীরূপে জীবন-বিকাশের প্রথম হইতে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকেন তবে পরবর্তীকালেও সে শিশুকে মানসিক দিক দিয়া দাসরূপে পরিণত করা তাঁহার পক্ষে সহজ। বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধি, প্রক্ষোভ অথবা উভয় কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হইয়া শিশু নিজের বয়স্ক জীবনেও নিজের সত্তাকে হারাইয়া ফেলিতে পারে। এরূপ অবস্থায় সে প্রভাববিস্তারকারী ব্যক্তির মানসদাসে পরিণত হয়। জন স্টুয়ার্ট মিল এ বিষয়ে একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁহার পিতার বুদ্ধিগত প্রভাব তাঁহার জীবনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছিল যে, পিতার চিন্তাধারায় যে কোথাও ভুল থাকিতে পারে তাহা তিনি ভাবিতেই পারিতেন না।

শৈশবে শিশুর পক্ষে অন্যের বুদ্ধিদ্বারা প্রভাবিত হওয়া কতকটা স্বাভাবিক; পিতামাতা বা শিক্ষক যে অভিমত পোষণ করেন ও প্রচার করেন তাহা হইতে মুক্ত থাকা বয়স্কব্যক্তির পক্ষেও কঠিন, অবশ্য যদি অন্য কোন উৎস হইতে বিরুদ্ধ মতবাদের স্রোত প্রবাহিত হইয়া তাহাদিগকে অন্যদিকে পরিচালিত করে, তাহা ত স্বতন্ত্র কথা। কাজেই ইহা বলা যাইতে পারে যে, লোকের পক্ষে অন্যের বুদ্ধিগত দাসত্ব বা প্রভাব অনুভব করা অস্বাভাবিক নয়; আমার মনে হয় ইহা নিবারণের উদ্দেশ্যে বিশেষ শিক্ষা দ্বারাই এ প্রভাব এড়ান যাইতে পারে; বর্তমানের দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে পূর্ব পুরুষদিগের চিন্তা ও ভাবধারাকে আঁকড়াইয়া থাকা বিপজ্জনক, কাজেই শিশুদিগকে পিতামাতার বুদ্ধিগত প্রভাবের দাসত্ব হইতে সযত্নে রক্ষা করা উচিত। এ সমস্যা বর্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত নয়। বর্তমানে কেবল প্রক্ষোভ ও চিন্তার দাসত্ব আলোচনা করিব।

পিতামাতা সন্তানকে ভালবাসেন; ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু অপত্যস্নেহের

প্রতিদানে তাঁহারা যখন পুত্র বা কন্যার নিকট হইতে প্রক্ষোভগত (emotional) সাড়া কামনা করেন তখনি অন্যায় অস্বাভাবিকতার সূত্রপাত হয়। মনঃ-সমীক্ষকগণ এই অবস্থাকে বলেন ইডিপাস্ গুঢ়ৈষা' অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন যৌনবাসনার বিকৃত রূপ। জনক-জননীর সঙ্গে পুত্রকন্যার আচরণের মধ্যে যৌন কামনার কোনরূপ প্রভাব আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। অল্প কিছুক্ষণ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বিশুদ্ধ অপত্যস্নেহ সন্তানের নিকট হইতে প্রক্ষোভ-গত প্রতিদান বা সাড়া কামনা করে না। সন্তান যদি খাদ্য ও প্রতিপালনের জন্য পিতামাতার উপর নির্ভর করে তবেই স্নেহ তৃপ্ত হয়। সন্তানের এই নির্ভরতা যখন কমিয়া আসে, পিতামাতার স্নেহও কমিয়া আসে। প্রাণী-জগতে ইহাই নিয়ম এবং ইতর প্রাণীর উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক। সেখানে দেখা যায়, পিতামাতা সন্তানদিগকে খাওয়ায় ও শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করে। সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতামাতা উদাসীন হইয়া পড়ে, সন্তানগণ পিতামাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজেদের আহার সংস্থান ও যৌন সম্বন্ধ স্থাপনে চেষ্টিত হয়। ইতিমধ্যে তাহাদের পিতামাতা আবার সন্তানলাভের আয়োজন করিতে থাকে। ইতর প্রাণিজগতে অপত্যস্নেহ এই সরল নিয়মের ধারা অনুসরণ করিয়া চলিতেছে কিন্তু মানুষের এই প্রবৃত্তি এত সরলভাবে প্রকাশ পায় না। অসভ্য বর্বর মানবসমাজে দেখা যায়, পিতা-মাতা আশা করেন বার্ধক্যে অক্ষম হইলে তাঁহাদের বলিষ্ঠ সন্তানগণ তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবে। সভ্য মানব সমাজে পিতামাতা কামনা করেন, উপার্জনশীল সন্তানগণ তাঁহাদের ভরণপোষণ করিবে। এই ভাবের কামনা হইতে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য কি তাহা নির্দিষ্ট হয় এবং তাহা পুত্রকন্যার বাঞ্ছিত গুণ বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকে। এখানে অপত্যস্নেহ অপপ্রয়োগের দুইটি মূল মনোবিজ্ঞান সম্মত কারণের আলোচনা করিব।

প্রথম কারণ ঘটে যখন প্রবৃত্তি হইতে কিরূপ আনন্দ লাভ হইবে তাহা বুদ্ধি বুঝিতে পারে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, প্রবৃত্তি এমন সুখকর কাজেই প্রেরণা দেয় যাহার ফল জীবদেহের পক্ষে প্রয়োজনীয়, কিন্তু এ ফল সুখকর না-ও হইতে পারে। খাদ্য গ্রহণ সুখকর, কিন্তু পরিপাক ক্রিয়া সুখকর নয়, বিশেষ করিয়া যদি অজীর্ণ রোগ থাকে। যৌন মিলন সুখকর কিন্তু সন্তান প্রসব সুখকর নয়; ছোট শিশুর নির্ভরতা সুখকর কিন্তু বলিষ্ঠ বয়স্ক পুত্রের স্বাধীনতা সুখকর নয়। অসভ্য আদিম জননীর প্রকৃতিবিশিষ্ট রমণী অসহায় সন্তানকে স্তন্য দিয়া পালন করিতেই সবচেয়ে বেশী আনন্দ পায়; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর অসহায় ভাব যখন কমিয়া আসে, মায়ের আনন্দও কমিতে

থাকে। কাজেই আনন্দলাভের জন্যই সন্তানের অসহায় অবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী করার প্রবণতা দেখা দেয়; সন্তান যখন পিতামাতার স্নেহ-পরিচর্যা ও নির্দেশের আওতার বাহিরে চলিয়া যাইবে সে সময়কে ঠেকাইয়া রাখার চেষ্টাও স্বাভাবিকভাবে দেখা দেয়। মায়ের আঁচল-ধরা ছেলে এই ধরণের প্রচলিত কথার মধ্যে মাতৃহৃদয়ের এ কামনার প্রকাশ স্বীকৃত হইয়াছে। ছেলেদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠানো ব্যতীত তাহাদিগকে এই কু-প্রভাব হইতে মুক্ত রাখা অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। মেয়েদের বেলায় ইহাকে কু-প্রভাব বলিয়া বিবেচনা করা হইত না; তাহাদিগকে অসহায় এবং অপরের উপর নির্ভরশীল করিয়া গড়িয়া তোলাই বাঞ্ছনীয় মনে হইত। আশা করা হইত যে, বিবাহের পূর্বে যে মেয়ে মায়ের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিত, বিবাহের পর সে স্বামীকেই একান্ত আশ্রয় বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু কার্যতঃ খুব কম ক্ষেত্রেই এরূপ ঘটে। কেহই বুঝিতে পারে নাই যে, বালিকাকে যদি পরনির্ভরশীল করিয়া গড়িয়া তোলা হয় তবে সে স্বাভাবিকভাবে মাতার উপরই নির্ভর করিবে; ইহার ফলে তাহার পক্ষে কোন পুরুষকে একান্ত আপনার জন ও সঙ্গীরূপে গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না, অথচ ইহাই সুখী দাম্পত্যজীবনের মূল উপাদান।

দ্বিতীয় কারণটি ফ্রয়েডিয় মতবাদের কাছাকাছি আসে। যৌন ভালবাসার কিছু উপাদান যখন অপত্যস্নেহের ভিতর প্রকাশ পায় তখনি ইহার উৎপত্তি। ইহার জন্য দুইজনের যে বিপরীত লিঙ্গ হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। এখানে কেবল কতকগুলি বাসনা ক্রিয়া করিতেছে। যৌন মনোবিজ্ঞানের যে অংশের ফলে মানবসমাজে এক-বিবাহ সম্ভবপর হইয়াছে তাহা মানুষের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করে যে সে, পৃথিবীতে অন্ততঃ একজন লোকের সুখবিধানের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং একান্ত বাঞ্ছিত ব্যক্তি। যেখানে দাম্পত্য-জীবনে এই ভাবটি প্রবল সেখানে অন্য কতকগুলি বিষয় অনুকূল থাকিলে স্বামী-স্ত্রীর জীবন সুখাবহ হয়। কোন না কোন কারণে সভ্যজগতে বহু বিবাহিত স্ত্রীলোকের যৌনজীবন অতৃপ্ত থাকে। এরূপ রমণীর পক্ষে নিজের সন্তানদের নিকট হইতে অবৈধ ও কৃত্রিম উপায়ে যৌন কামনা চরিতার্থ করার বাসনা জাগ্রত হইতে পারে, যে কামনা শুধু পুরুষই যথেষ্টভাবে এবং স্বাভাবিকভাবে পরিতৃপ্ত করিতে পারে। আমি স্পষ্টতঃ কিছু বুঝাইতেছি না; সন্তানের প্রতি মাতার আচরণে প্রক্ষোভগত আলোড়ন, কতক ভাবের তীব্রতা, চুম্বন ও আলিঙ্গনে আনন্দলাভের জন্য চুম্বন ও আলিঙ্গনের আতিশয্যের কথা বলিতেছি। স্নেহশীলা জননীর নিকট ইহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়াই বিবেচিত হইত। বস্তুত, কি ন্যায়সঙ্গত এবং কি ক্ষতিকর তাহার পার্থক্য বড়ই সূক্ষ্ম।

ফ্রয়েডিয় মতবাদের কতক সমর্থক মনে করেন যে পিতামাতার পক্ষে সন্তানকে চুম্বন করা এবং কোলে করিয়া আদর করা উচিত নয়; ইহা মোটেই সমর্থন করা চলে না। পিতামাতার আন্তরিক স্নেহ-প্রীতিতে সন্তানের অধিকার আছে; ইহা তাহাদের জীবনের প্রতি আনন্দোজ্জল দৃষ্টিভঙ্গী দান করে, মনের স্বাস্থ্য বিকাশের পক্ষেও ইহা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু পিতা মাতার এই স্নেহ সম্বন্ধে এমন ধারণা হওয়া দরকার যেন সে আকাশ ভরা আলো-বাতাসের মতই ইহা গ্রহণ করিতে শেখে, ইহার জন্য কোন প্রতিদান দিবার চিন্তা যেন তাহার মনে না আসে। সাড়া দেওয়ার প্রশ্নটিই এখানে আসল। স্নেহের প্রতিদানে শিশুর নিকট হইতে কতকগুলি স্বতঃপ্রবৃত্ত সাড়া পাওয়া যাইবে। ইহা সবই কাম্য। কিন্তু ইহা হইবে বালকবৎ সঙ্গীদের বন্ধুত্বের কামনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। পিতামাতার বিশুদ্ধ স্নেহপুষ্ট সন্তান স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া যে সাড়া দেয় তাহা দূষণীয় নয় কিন্তু মানসিক ডেঁপোমির ফলে সে যখন পিতা বা মাতার বন্ধুত্ব কামনা করে তখনই অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হয়। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া পিতামাতা হইবেন শিশুর জীবন-চিত্রের পটভূমি; তাহাদিগকে আনন্দ দিবার জন্য শিশুকে সক্রিয়ভাবে কোন কিছু করিতে উদ্বুদ্ধ বা প্ররোচিত করা উচিত হইবে না। তাহার বুদ্ধি এবং উন্নতিতেই পিতামাতার আনন্দ; সে স্বেচ্ছায় কোন সাড়া দিলে তাহা পিতামাতা অতিরিক্ত বিশুদ্ধ লাভ হিসাবে গ্রহণ করিবেন, যেন বসন্তকালে চমৎকার আবহাওয়া; কিন্তু এইরূপ সাড়া কাম্য প্রাপ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত নয়।

কোন স্ত্রীলোক যদি যৌন ব্যাপারে পরিতৃপ্ত না হন তবে তাঁহার পক্ষে আদর্শ জননী হওয়া কিম্বা ছোট ছোট শিশুদের আদর্শ শিক্ষিকা হওয়া অত্যন্ত কঠিন। মনঃসমীক্ষকগণ যাহাই বলুন না কেন, অপত্যস্নেহ যৌন প্রবৃত্তি হইতে মূলত পৃথক; যৌন বাসনা-উদ্ভূত প্রক্ষোভ ইহাকে ঘোলাইয়া তোলে। মনস্তত্ত্বের বিচারে কুমারী স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত করা সম্পূর্ণ ভুল। শিশুদের শিক্ষকতার জন্য এমন মহিলাই যোগ্য যিনি তাহাদের নিকট হইতে নিজের প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি কামনা করিবেন না। বিবাহিত জীবনে সুখী স্ত্রীলোক বিনা চেষ্টাতেই এ পর্যায়ে পড়িবেন কিন্তু অন্য স্ত্রীলোকের পক্ষে এজন্য অসাধারণ আত্মসংযমের প্রয়োজন হইবে। অবশ্য একই অবস্থায় পুরুষের পক্ষেও ঠিক এই কথাই খাটে; কিন্তু পুরুষের বেলায় এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা অনেক কম এই জন্য যে, তাহাদের অপত্যস্নেহ সাধারণতঃ খুব বেশী প্রবল নয় এবং খুব কম পুরুষেরই যৌনক্ষুধা অপরিতৃপ্ত থাকে।

পিতামাতার প্রতি সন্তানের আচরণ :

শিশুদের নিকট হইতে কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা করি সে সম্বন্ধেও আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। সন্তানের প্রতি জনক-জননীর স্নেহ যদি যথাযথ হয় তাহাদের আচরণও অনুরূপ হইবে। পিতামাতাকে দেখিলে সে খুশী হইবে, অন্য কোন আনন্দপ্রদ খেলা বা কাজে লিপ্ত না থাকিলে তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে দুঃখিত হইবে; দৈহিক বা মানসিক অস্বচ্ছন্দ বোধ করিলে তাঁহাদের সাহায্য কামনা করিবে; দুঃসাহসিক কাজে তাহাদের উত্তম আসিবে কেননা তাহারা উপলব্ধি করিবে পিতামাতার অফুরন্ত স্নেহ, এবং তাহাদের রক্ষার জন্য কল্যাণশক্তি সবদা তাহাদের জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে যদিও প্রকৃত বিপদের সময় ছাড়া শিশুর মনে এ চিন্তা আসিবে না। তাহারা আশা করিবে, পিতামাতা তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিবেন, তাহাদের জটিল সমস্যার সমাধান করিয়া দিবেন এবং কঠিন কাজে সাহায্য করিবেন। সন্তানগণ পিতা-মাতার নিকট হইতে খাদ্য ও আশ্রয় পায় ইহা চিন্তা করিয়া তাহারা জনক-জননীকে ভালবাসিবে না; পিতামাতার কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া এবং সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা শিশুদের স্বভাব নয়। তাহাদের সঙ্গে খেলিলে, তাহাদিগকে নূতন জিনিস দেখাইলে, তাহাদিগকে বিচিত্র পৃথিবীর গল্প শুনাইলে তাহারা পিতামাতাকে বেশী পছন্দ করিবে। তাহারা ক্রমে উপলব্ধি করিবে যে, তাহাদের উপর পিতামাতার স্নেহ বিদ্যমান রহিয়াছে; পৃথিবীর উপর যেমন চন্দ্রসূর্যের কিরণ বর্ষিত হয় জনকজননীর স্নেহও তদ্রূপ স্বাভাবিকভাবে বর্ষিত হইতেছে এই ধারণা সন্তানদের মনে আসা উচিত। পিতা-মাতার প্রতি তাহাদের ভালবাসা অপর শিশুদের প্রতি ভালবাসা হইতে পৃথক প্রকৃতির হইবে। পিতামাতা সন্তানকে পুরোভাগে রাখিয়া তাহার মঙ্গলের জন্য কাজ করিবেন, শিশুর কাজ হইবে আত্মবিকাশ ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানর চেষ্টা করা। এখানেই আসল পার্থক্য। পিতামাতার প্রতি শিশুর করণীয় বিশেষ কিছু নাই। জ্ঞানে, স্বাস্থ্যে ক্রমে পুষ্ট হইয়া উঠাই তাহার কাজ এবং ইহা দ্বারাই পিতৃমাতৃহৃদয়ের অপত্যস্নেহ প্রবৃত্তি পরিতৃপ্তি লাভ করে।

কেহ যেন মনে না করেন যে আমি পারিবারিক জীবনে স্নেহ এবং ইহার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ কমাইবার পক্ষপাতী। তাহা মোটেই নয়। আমি যাহা বলিতে চাই তাহা এই যে, বিভিন্ন প্রকারের স্নেহ আছে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে স্নেহ এক প্রকার, সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহ অন্যপ্রকার, পিতামাতার প্রতি সন্তানের স্নেহ আবার অন্য আর এক প্রকার। ক্ষতি তখনই সাধিত হয়

যখন বিভিন্ন প্রকার স্নেহ তালগোল পাকাইয়া ফেলা হয়। ফ্রয়েডিয়গণ এ সম্বন্ধে যে সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা আমি বিশ্বাস করি না, কারণ তাঁহারা বিভিন্ন স্নেহের প্রবৃত্তিগত পার্থক্য স্বীকার করেন না। ইহার ফলে পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে আচরণেও ইহারা বাধা নিষেধের কড়াকড়ি আরোপ করেন। কেননা তাঁহাদের মতে জনকজননী ও সন্তানের মধ্যে যে স্নেহ বিদ্যমান তাহা প্রচ্ছন্নভাবে যৌন ভালবাসারই নামান্তর। বিশেষ কোন দুর্ভাগ্য সূচক ক্ষেত্র ব্যতীত আমি এরূপ স্নেহ-কৃচ্ছতার সমর্থক নহি। যে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসেন এবং সন্তানদিগকে স্নেহ করেন তাঁহারা নিজেদের হৃদয়বৃত্তির নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিতে পারিবেন। সন্তানের মঙ্গলের জন্য যথেষ্ট চিন্তা ও জ্ঞানের প্রয়োজন হইবে কিন্তু এগুলি অপত্যস্নেহের ভিতর দিয়াই তাহারা লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। পরস্পরের নিকট হইতে তাঁহারা যাহা পান, তাহা সন্তানের নিকট হইতে কামনা করা তাঁহাদের পক্ষে কখনই সমীচীন হইবে না; তাঁহারা যদি পরস্পরকে ভালবাসিয়া সুখী হন তবে সন্তানের স্নেহ লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের মনে জাগ্রতই হইবে না। আবার পুত্রকন্যা যদি যথোচিত যত্নের সঙ্গে লালিত পালিত হয়, পিতামাতার প্রতি তাহাদের স্নেহ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রকাশ পাইবে; —তাহাদের স্বাধীনতার কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না। সন্তানের প্রতি যথোপযুক্ত আচরণ করিতে পিতামাতার আত্ম-কৃচ্ছ তার প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন হইল জ্ঞান ও বুদ্ধিদীপ্ত অপত্যস্নেহের সম্প্রসারণের।

আমার ছেলের বয়স যখন দুই বৎসর চার মাস তখন আমি আমেরিকায় গিয়া তিন মাস ছিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে সে বেশ সুখীই ছিল কিন্তু আমি ফিরিলে আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছিল। আমার জন্য সে অধীর ভাবে বাগানের প্রবেশ-পথে অপেক্ষা করিতেছিল; আমার হাত ধরিয়া সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এটা-সেটা দেখাইতে লাগিল। আমি তাহার কথা শুনিতে চাহিতেছিলাম, সে ও বলিতে চাহিতেছিল; আমার কিছু বলার ইচ্ছা ছিল না তাহার ও শোনার ইচ্ছা ছিল না। আবেগ বিপরীত মুখী হইলেও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। যখন গল্প বলার কথা উঠে, সে শুনিতে চায়, আমি বলিতে চাই। এখানেও সামঞ্জস্য রহিয়াছে। শুধু একবার এই অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। তাহার তিন বছর ছয়মাস বয়সের সময় আমার জন্মদিন পড়িয়াছিল। তাহার মায়ের নিকট সে শুনিয়াছিল যে, সেদিন আমাকে খুশী করার জন্যই সব কিছু করিতে হইবে। গল্প শোনা ছিল তাহার কাছে সবচেয়ে আনন্দ-দায়ক। সেদিন উৎসবের সময় সে বলিল যে আমাকে গল্প শুনাইবে। আনন্দের ব্যাপার সুরু

হইল। সে কোলে বসিয়া পর পর গোটা বারো গল্প শুনাইল তারপর 'আজকে আর নয়' এই বলিয়া লাফ দিয়া নামিয়া গেল। ইহার পর অনেকদিন পর্যন্ত সে আর গল্প শুনাইতে আসে নাই।

আমি এখন সাধারণভাবে স্নেহ ও সমবেদনা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পিতামাতা ও সন্তানের প্রীতি সম্পর্কের মধ্যে জটিলতার উদ্ভব হইতে পারে; কেননা জনকজননী কর্তৃক অপত্যস্নেহের অপব্যবহারের সম্ভাবনা আছে। এজন্যই প্রথমে অপত্যস্নেহের স্বরূপ কি তাহা আলোচনা করা হইল।

সমবেদনা :

শিশুকে জোর করিয়া স্নেহ প্রকাশ করা বা সমবেদনা বোধ করা অভ্যাস করানো যায় না। ইহার একমাত্র উপায় হইল কিরূপ অবস্থায় এই ভাবগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাগ্রত হয় তাহা লক্ষ্য করা এবং তারপর ঐরূপ অবস্থা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করা। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, সমবেদনা কতকটা সহজাত। শিশুগণ তাহাদের ভাইবোনকে কাঁদিতে দেখিলে উৎকণ্ঠিত হয় এবং নিজেরাও কাঁদিতে সুরু করে। ভাইবোনদের উপর কষ্টদায়ক কোন আচরণ করিতে দেখিলে তাহারা তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া বড়দের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। আমার ছেলের কনুইতে ঘা হইয়াছিল। ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিবার সময় সে চীৎকার করিতেছিল। পাশের ঘর হইতে তাহার ছোট বোন (বয়স আঠার মাস) কান্না শুনিয়া আকুল হইয়া উঠে এবং যতক্ষণ কান্না থাকে ততক্ষণ বারংবার বলিতে থাকে 'খোকন কাঁদছে, খোকন কাঁদছে'। অন্য একদিন তাহার পায়ে কাঁটা ফুটিয়াছিল; তাহার মা সূঁচ দিয়া তাহা বাহির করিয়া দিতেছিলেন। খোকন উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এতে লাগে না তো, না-মা?' এসব ব্যাপারে যে একটু কষ্ট সহ্য করিতে হয়, হৈ চৈ করিতে হয় না তাহা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তাহার মা বলিলেন, 'হ্যাঁ লাগেই তো'। খোকন বারে বারে জেদ করিতে লাগিল যে, কাঁটা বাহির করিতে ব্যথা লাগে না; তাহার মা বারে বারেই বলিতে লাগিলেন ব্যথা লাগে। অবশেষে খোকন ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল, যেন তাহার নিজের পায়ের কাঁটা বাহির করা হইতেছে! এরূপ ঘটনা সহজাত দৈহিক সমবেদনাবোধ হইতে ঘটে। ইহাকে ভিত্তি করিয়াই আরো ব্যাপক সমবেদনাবোধ জাগ্রত করা সম্ভবপর। এজন্য তাহাদিগকে উপলব্ধি করাইতে হইবে যে, মানুষ এবং অপরাপর জীবজন্তুরও দুঃখ কষ্ট বোধ করিতে পারে এবং ব্যথা দিলে তাহারাও ইহা অনুভব করে। শুধু ইহাই নয়, শিশুর সমবেদনাবোধ জাগাইতে হইলে কতকগুলি নিষেধাত্মক সর্ত পালন

করিতে হইবে ; শিশু যাঁহাকে শ্রদ্ধা করে তাঁহাকে যেন সে নির্দয় ব্যবহার বা কোন নিষ্ঠুর কাজ করিতে না দেখে। পিতা যদি গুলি করিয়া পাখী মারেন এবং মা যদি পরিচারিকার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করেন তবে শিশুর মধ্যেও এদোষ-গুলি সংক্রামিত হইবে।

অন্যায় অত্যাচার সম্বন্ধে জ্ঞান :

কখন এবং কিভাবে শিশুকে জগতে প্রচলিত অন্যায়, অনাচারের সঙ্গে পরিচিত করানো যায় তাহা একটি কঠিন প্রশ্ন। যুদ্ধ, অত্যাচার, দারিদ্র্য এবং প্রতিষেধ্য রোগ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকা শিশুদের পক্ষে অসম্ভব। কোন-না-কোন স্তরে (অবস্থায়) শিশুকে এসব বিষয় জানিতেই হইবে এবং জ্ঞানের সঙ্গে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস গড়িয়া উঠা আবশ্যক যে, যে-দুঃখের হাত এড়ানো সম্ভবপর তাহা ঘটানো বা ঘটিতে দেওয়া কখনই উচিত নয়। যে সকল লোক স্ত্রীজাতির সতীত্ব রক্ষা করিতে চান তাঁহাদের যে সমস্যা, শিশুর মনকে অন্যায়, অত্যাচার, দুঃখদাহনের বিরুদ্ধে জাগ্রত করিতে চান যাঁহারা তাঁহাদের সমস্যাও একইরূপ। পূর্বে স্ত্রীলোকের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ মনে করিতেন বালিকাদিগকে বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত যৌন বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রাখাই ইহার প্রধান উপায় ; কিন্তু এখন অজ্ঞতা জীয়াইয়া রাখার পরিবর্তে উপযুক্ত জ্ঞান-দানের পন্থা গ্রহণ করা হয়।

আমি কতক শান্তিবাদী লোকের কথা জানি, তাঁহারা মনে করেন যুদ্ধের কথা বাদ দিয়া ইতিহাস পড়ান উচিত ; যতদিন সম্ভব শিশুদিগকে জগতের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে অজ্ঞ রাখাই তাঁহাদের কামনা। কিন্তু আমি জ্ঞানের অভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত এই ধরণের কাচের ঘরে আড়াল করিয়া রাখা গুণের প্রশংসা করিতে পারি না। যখনই ইতিহাস পড়ান হইবে, সত্য কাহিনীই পড়ান উচিত। আমরা যে নীতি উপদেশ প্রচার করিতে চাই ঐতিহাসিক ঘটনা যদি তাহার প্রতিকূল হয় তবে বুঝিতে হইবে সে নীতিই ভ্রান্ত এবং উহা বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে অনেকে, এমন কি অনেক ধার্মিক ব্যক্তিও সত্য ঘটনাকে তাঁহাদের মতের পক্ষে অসুবিধাজনক বোধ করেন ; ইহা তাঁহাদের আদর্শের কিছুটা দুর্বলতারই পরিচায়ক। সত্যকারের বলিষ্ঠ নীতি জগতে বাস্তব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহা দ্বারাই পুষ্ট। শিশুদিগকে অজ্ঞতার মধ্যে গড়িয়া তুলিলে এই ফল হইতে পারে যে, তাহারা পরে যখন অন্যায়, অনাচার বা কদাচারের সন্ধান পাইবে তখন তাহার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে। এরূপ ঝুঁকি লওয়া উচিত না। নিষ্ঠুরতার প্রতি তাহাদের বিতৃষ্ণা

বা বিরূপ মনোভাব জাগাইতে না পারিলে ইহা হইতে শিশুদিগকে নিবৃত্ত করা কঠিন ; সমাজে নিষ্ঠুরতা বিদ্যমান আছে তাহা না জানিলেই বা ইহার প্রতি তাঁহাদের বিরাগ জাগ্রত হইবে কিরূপে ?

কিন্তু অন্যায় অত্যাচার সম্বন্ধে শিশুকে ওয়াকিবহাল করার সহজ উপায়টি বাহির করা বড় সহজ নয়। অবশ্য বড় শহরের বস্তীতে যাহারা বাস করে তাহারা মদ্যপানের ফলে মাতলামি, ঝগড়া, মারামারি, স্ত্রীকে প্রহার করা ও এই জাতীয় অনেক প্রকার অনাচার, অত্যাচার দেখিতে পায়, হয়ত ইহা তাহাদের উপর খুব গভীর প্রভাব বিস্তার করে না। কিন্তু কোন যত্নশীল পিতা সন্তানকে এইরূপ দৃশ্যের সঙ্গে পরিচিত করাইতে চাইবেন না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, এইসব বীভৎস দৃশ্য শিশুর মনে দারুণ ভীতি উৎপাদন করিয়া তাহার সমগ্র জীবনের উপরই গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। অসহায় শিশু যখন প্রথম বুঝিতে পারে যে, শিশুদের উপরও নিষ্ঠুর অত্যাচার হওয়া অসম্ভব নয় তখন সে ভীত না হইয়া পারে না। আবার বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর তখন আমি প্রথম 'ওলিভার-টুইস্ট (Oliver Twist) পড়ি ; ইহা আমার মনে এমন ভীতি সঞ্চার করিয়াছিল যে, ইহার চেয়ে কম বয়সে পড়িলে আমি হয়ত সহ্যই করিতে পারিতাম না। কিছুটা বয়স বেশী হওয়ার ফলে শিশুর মনে সাহস না জন্মান পর্যন্ত তাহাকে ভয়ংকর বা ভীতিউৎপাদক কিছু না জানানই ভাল। এইরূপ মানসিক ধৈর্য কোন শিশুর আগে আসে, কাহারো বা অন্যের চেয়ে পরে আসে। ভীরু বা কল্পনা প্রবণ শিশুদের মনে ভয়ংকর কোন দৃশ্য যেমন সহজে এবং গভীরভাবে রেখাপাত করিতে পারে, স্বাভাবিক সাহস সম্পন্ন অথবা শিশুদের মনে তেমন সহজে পারে না। শিশু যদি জানে যে তাহার পিতামাতার কল্যাণদৃষ্টি সর্ব্বদা তাহার উপর নিবদ্ধ আছে এবং বিপদে তাহার ভয়ের কোন কারণ নাই তবে স্বাভাবিকভাবে তাহার মনে নির্ভীকতার ভাব গড়িয়া উঠিবে। ইহা গড়িয়া না উঠা পর্যন্ত শিশুকে বাস্তব নিষ্ঠুরতার সঙ্গে পরিচিত করান উচিত নয়। কখন এবং কিভাবে এই পরিচয় সাধন করিতে হইবে সে সম্বন্ধে বাঁধাধরা কোন নিয়ম নাই ; এ বিষয়ে অভিভাবকের দক্ষতা এবং বিচার বুদ্ধির প্রয়োজন।

শিশুকে নিষ্ঠুরতার সহিত পরিচিত করাইবার উপায় :

এ সম্বন্ধে যে কতকগুলি সাধারণ নীতি আছে তাহা পালন করা উচিত। অবাস্তব কাহিনী যেমন, 'ব্লু বিয়ার্ড' ও দানবহত্যাকারী জ্যাকের গল্প, শিশুর মনে সত্যকারের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে কোন ভাব জাগায় না। সে এগুলিকে

সম্পূর্ণ কাল্পনিক উদ্ভট মনে করে, বাস্তব জীবনে যে ইহাদের অস্তিত্ব আছে তাহা সে মনে করে না। শিশুর ভিতরকার আদিম বন্য-প্রবৃত্তি নিষ্ঠুরতার কাহিনী শুনিয়া পরিতৃপ্ত হয় বলিয়াই সে আনন্দ লাভ করে; এই প্রবৃত্তি শক্তিহীন শিশুর খেলার আবেগরূপে প্রকাশ পায় বলিয়া ইহা দ্বারা কোন ক্ষতি সাধিত হয় না। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ প্রবৃত্তিও কমিয়া আসে।

শিশুকে যখন বাস্তব নিষ্ঠুরতার সহিত প্রথম পরিচিত করানো হয় তখন বিশেষ যত্নসহকারে এমন সমস্ত ঘটনার কাহিনী নির্বাচন করা উচিত যাহাতে সে অত্যাচারীর পক্ষ সমর্থন না করিয়া নিজেকে নির্যাতীতের দলে মনে করিবে। কোন গল্পে বর্ণিত অত্যাচারীর সঙ্গে নিজেকে মনে মনে মিশাইয়া দিতে পারিলে শিশুর ভিতরকার বর্বর মানুষটি উল্লাসিত হয়; এই ধরণের গল্প শিশুকে সাম্রাজ্যবাদীরূপে গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করে। কিন্তু আব্রাহাম কেমন করিয়া আইজ্যাককে বলি দেওয়ার আয়োজন করিয়াছিল অথবাএলিসাকর্তৃক অভিশপ্ত শিশুদিগকে স্ত্রী-ভালুক কেমন করিয়া হত্যা করিয়াছিল এই কাহিনী স্বাভাবিক-ভাবেই শিশুর মনে নির্যাতিত শিশুর প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করে। এইসব গল্প যদি বলা হয়, তবে এমনভাবে বলিতে হইবে যেন শিশুরা বুঝিতে পারে বহু যুগ আগে মানুষ কতখানি নিষ্ঠুরতার কাজ করিতে পারিত। বাল্যকালে একবার আমি এক ধর্মযাজককে প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা করিতে শুনিয়া-ছিলাম। তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে এলিসা শিশুদিগকে অভি-সম্পাত করিয়া ঠিক কাজই করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ আমার বয়স কিছু বেশী থাকায় সে ধর্মযাজককে আমি নেহাৎ নির্বোধ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া ছিলাম, নতুবা ভয়ে হয়ত আমি অভিভূত হইয়া পড়িতাম। আব্রাহাম ও এলিসা নিষ্ঠুরতার কাজ করিয়া ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন, গল্পের মারফৎ ইহাই যদি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হয় তবে এগুলি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা উচিত। নতুবা ইহা শিশুর নীতিজ্ঞানের মান নিকৃষ্ট করিয়া ফেলিবে। কিন্তু এগুলি যদি মানুষের অন্যায় অত্যাচারের ভূমিকারূপে বিবৃত হয় তবে ইহা হইতে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া সম্ভব, কারণ কাহিনী হিসাবে এগুলি জীবন্ত, বহু প্রাচীন এবং ভিত্তিহীন। কিং জন (king John) পুস্তকে বর্ণিত গল্পে হিউবার্ট কিভাবে বালক আর্থারের চোখ তুলিয়া ফেলিয়াছিল সে কাহিনী ও এই প্রসঙ্গে বলা চলে।

তারপর যুদ্ধবর্ণনা সহ ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যুদ্ধের কাহিনী শুনাইলে প্রথমদিকে শিশুর সহানুভূতি পরাজিতের পক্ষে

জাগ্রত করানো দরকার। আমি বরং প্রথমে এমন যুদ্ধের গল্প আরম্ভ করিতে চাই যেখানে শিশু স্বাভাবিকভাবে পরাজিতের প্রতিই সমবেদন বোধ করিবে—যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—ইংরাজ বালককে প্রথমে হেষ্টিংসের যুদ্ধকাহিনী শুনাইব। যুদ্ধের দরুন মানুষের যে দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি হয় তাহার উপরই বেশী জোর দিতে হইবে। পরে ক্রমে ক্রমে শিশুর এমন মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে যেন সে যুদ্ধের কাহিনী পড়িবার সময় নিজেকে কোন পক্ষভুক্ত মনে না করে, তাহার মনে যেন এই ধারণা জন্মে যে, উভয় পক্ষের লোকেরাই ছিল নির্বোধ, সাময়িকভাবে তাহাদের মেজাজ চটিয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের এমন পরিচারিকার প্রয়োজন ছিল যাহারা তাহাদিগকে শান্ত না হওয়া পর্যন্ত বিছানায় শোয়াইয়া রাখিতে পারিত। যুদ্ধকে আমি নার্সারি বা শিশুপালনাগারে শিশুদের ঝগড়ার সমপর্যায়ভুক্ত করিব। আমার বিশ্বাস, শিশুদিগকে এইভাবে যুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ জানান যায়। ইহা যে নির্বুদ্ধিতার কাজ তখন তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিবে।

শিশু যদি নির্দয় আচরণের কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় তবে বয়স্ক ব্যক্তি তাহাকে সে সম্বন্ধে সকল কথা বুঝাইয়া বলিবেন, শিশু যেন মনে মনে এই ধারণা করে যে, নির্দয় ব্যক্তিগণ জীবনের প্রথম হইতে ভালভাবে শিক্ষা পায় নাই বলিয়াই নিষ্ঠুর আচরণ করিয়া থাকে, তাহাদের হৃদয়ে কোমল সমবেদনা বোধ বিকাশ লাভ করিলে তাহারা এরূপ আচরণ করিত না। কাল্পনিক গল্প ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া শিশুগণ নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করে। ইহার পূর্বে তাহাদিগকে কোনরূপ সত্যকারের নৃশংসতার দৃশ্য দেখানো উচিত নয়। প্রথমতঃ কাল্পনিক কাহিনী, তারপর যুদ্ধবিগ্রহের ঐতিহাসিক গল্প এবং সর্বশেষ পারিপার্শ্বিক বাস্তব জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে শিশুকে ধীরে ধীরে অবহিত করাইতে হইবে। সকল ক্ষেত্রেই শিশুর মনে এই অনুভূতি জাগানো আবশ্যক যে, অন্যায় অত্যাচার প্রতিরোধ করা সম্ভবপর এবং কেবল আত্মসংযমের অভাব ও অশিক্ষা হইতেই ইহার উদ্ভব। তাহার মনে অত্যাচারীর প্রতি ক্রোধের উদ্রেক করা উচিত নয়, সে বরং নির্দয় ব্যক্তিকে যেন মনে করে আনাড়ি অপদার্থ লোক যে জানে না কি কাজ করিলে সকলের প্রকৃত সুখ হইতে পারে।

শিশুর ভিতর সহানুভূতির সহজাত বীজ (সুপ্ত) রহিয়াছে, এই প্রবৃত্তিটির যথাযথ বিকাশ ঘটাইয়া ব্যাপক সমবেদনা বোধ জাগ্রত করা প্রধানতঃ বুদ্ধিসুলভ ব্যাপার, ইহা করিতে হইলে যথার্থ দিকে শিশুর মনোযোগ চালিত করা আবশ্যক এবং যুদ্ধলিপ্সু ব্যক্তিগণ ও কর্তৃপক্ষ যে সকল ঘটনা গোপন

করিতে চান তাহা শিশুকে উপলব্ধি করানো দরকার। যেমন ধরুন, অস্টারলিজের যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পর নেপোলিয়ন যুদ্ধক্ষেত্রে সকল দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যে বীভৎস দৃশ্য দেখিয়াছিলেন টলস্টয় তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। যুদ্ধের ফলে উভয় পক্ষের লোক যে চরম দুঃখ-দুর্দশায় পতিত হয় তাহার বিবরণ পাঠক ও শ্রোতার মনে বেদনাবোধ জাগ্রত করে। অধিকাংশ ইতিহাসেই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থার বর্ণনা থাকে না; যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরবর্তী বারো ঘণ্টায় যুদ্ধক্ষেত্রে কি শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহা যদি ঐতিহাসিক বর্ণনা করেন তবে যুদ্ধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিনব চিত্র পাঠকের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে। ইহার জন্য ঘটনা গোপন করার প্রয়োজন নাই, বরং বেশী করিয়া প্রকাশ করা দরকার। যুদ্ধক্ষেত্র সম্বন্ধে যাহা খাটে, অন্য যে-কোন নিষ্ঠুরতা সম্পর্কেই তাহা প্রযোজ্য। এই সকল ক্ষেত্রে নীতি-উপদেশ প্রদান করা অনাবশ্যক; যথাযথভাবে গল্প বর্ণনাই যথেষ্ট। আপনি নিজে কোন উপদেশ দিয়া শিশুকে তাহা পালন করিতে বলিবেন না, ঘটনাগুলিকেই শিশুর মনে উপযুক্ত ভাব ও নীতিবোধ উন্মেষ করিতে সুযোগ দিন।

স্নেহ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। স্নেহ ও সহানুভূতির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে; সহানুভূতি-বোধ ব্যাপক, ইহার ক্ষেত্র বিস্তৃত বহু-জনের প্রতি ইহার প্রয়োগ হইতে পারে কিন্তু স্নেহ সকলের জন্য নয়। নির্বাচিত কতকের জন্যই কেবল শিশুর মনে স্নেহ বা ভালবাসার উদ্রেক হয়। পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে যে স্নেহ বিদ্যমান সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে; এখন সমবয়সীদের মধ্যে স্নেহ সম্বন্ধ কেমন তাহাই বলা হইতেছে।

স্নেহ সৃষ্টি করা যায় না; হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে ইহাকে কেবল যুক্ত করা যায়। এক প্রকার স্নেহ আছে যাহার মূল অংশতঃ ভয়ের মধ্যে নিহিত। পিতামাতার প্রতি সন্তানের ভালবাসায় এই ধরণের স্নেহের কিছু মিশ্রণ আছে। পিতামাতা সন্তানকে পালন করেন, বিপদ হইতে রক্ষা করেন। জনকজননীর স্নেহচ্ছায়া হইতে বঞ্চিত হইলে সন্তান নিশ্চয়ই সুখী হয় না; কাজেই পিতা-মাতার প্রতি ভালবাসার মধ্যে কিছু পরিমাণে ভয় মিশ্রিত থাকে। শৈশবেও অন্য শিশুর প্রতি ভালবাসায় কিন্তু এই ধরণের ভীতির মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমার ছোট মেয়ে তার ভাইয়ের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত, যদিও তাহার জগতে সেই একমাত্র ব্যক্তি যে তাহার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করে না। সমান বয়সীদের মধ্যে ভালবাসাই সবচেয়ে ভাল; যেখানে সুখ এবং ভীতিশূন্যতা আছে সেখানেই ইহা থাকা সম্ভব। ভয়—তাহা সংজ্ঞাত (Conscious) হউক কিংবা অজ্ঞাতই (Unconscious) হউক—ভীত ব্যক্তির মনে তীব্র ঘৃণা ও শত্রু-

তার উদ্রেক করে, কারণ যাহাকে ভয় করা যায়, সর্বদা মনে হয় সে কোনরূপ ক্ষতি সাধন করিতে পারে। নিজের ক্ষতির আশংকা ভীত ব্যক্তির মনে আত্মরক্ষার উপায় স্বরূপ ঘৃণা ও শত্রুতা জাগাইয়া রাখে। অধিকাংশ লোকের জীবনে দেখা যায় ঈর্ষা স্নেহ বিস্তারের পক্ষে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। সুখভোগ ব্যতীত ঈর্ষা দমন করার অন্য কোন উপায় আছে বলিয়া আমি মনে করি না; নৈতিক শৃঙ্খলা ঈর্ষা বোধের অন্তঃপ্রবাহিত ফল্গুধারা রোধ করিতে পারে না। আবার যে সুখ ও স্বস্তিবোধ ঈর্ষাকে প্রতিরোধ করে তাহাই প্রধানতঃ ভয় কর্তৃক দমিত হয়। ভয় অনেক সময় অনেকের উৎফুল্ল জীবনকেও বিষময় করিয়া তোলে। পিতা মাতা ও তথাকথিত 'বন্ধুগণ' আনন্দোজ্জল কিশোর কিশোরীর মনে ভয় সঞ্চার করিয়া বিষাদের ছায়াপাত করেন; নৈতিক কারণেই তাঁহারা এরূপ করেন, মনে ভাবেন; কিন্তু আসলে ঈর্ষা তাঁহাদিগকে একাজে প্ররোচিত করে। বলিতে পারেন—কিসের ঈর্ষা? করিবেই বা কেন? মানব-মনের গহনে নিত্যই নানা ভাবের আলোড়ন চলিতেছে। সকলেই সুখী হইতে চায়, আত্মসুখই প্রধান কাম্য। কিন্তু ইহা যখন সহজ লভ্য হয়না তখন অন্যে যে ইহা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিবে তাহাও মন সহ্য করিতে পারে না। অপরকে যে নিজের চেয়ে বেশী ভাগ্যবান মনে করে তাহার প্রতিই ঈর্ষা জাগ্রত হয়, তা সে ব্যক্তি শিশুই হোক কিংবা কিশোরই হউক। ঈর্ষা কিন্তু তখন খাঁটি ঈর্ষার আকারে আত্ম-প্রকাশ করে না; ভদ্রতার মুখোশ পরিয়া, নৈতিক উপদেশের শুভ্র পোষাকে সাজিয়া ইহা ছলনা করিতে বাহির হয়। তরুণ কিশোরগণ যদি যথেষ্ট পরি-মাণে নির্ভীক হয় তবে এই আশংকাবাদীদের কথায় কর্ণপাত করিবে না, নচেৎ তাহাদিগকে ঈর্ষান্বিত নীতি-উপদেষ্টার দলভুক্ত হইয়া দুঃখময় জীবন বরণ করিতে হইবে।

আমরা যে চরিত্রের শিক্ষা দানের পরিকল্পনা করিতেছি তাহার উদ্দেশ্য হইল শিশুর জীবনে সুখ এবং সাহস উৎপাদন করা; এ শিক্ষা শিশুর হৃদয়স্থিত স্নেহের উৎস-মুখ খুলিয়া দেয়। ইহার চেয়ে বেশী কিছু করা সম্ভবপর নয়। প্রথমেই বলা হইয়াছে স্নেহ সৃষ্টি করা যায় না, শুধু ইহার বহির্গমনের পথ করিয়া দেওয়া যায় মাত্র। আপনি যদি শিশুদিগকে স্নেহশীল হইতে উপদেশ দেন, তবে কতকগুলি ভণ্ড ও প্রতারক সৃষ্টি করিতে পারেন কিন্তু তাহাদিগকে যদি মুক্ত পরিবেশে সুখী রাখিতে পারেন, যদি তাহাদিগকে সদয় আচরণে ঘিরিয়া রাখিতে পারেন তবে দেখিতে পাইবেন স্বতঃপ্রবৃত্তভাবেই তাহারা সকলের প্রতি বন্ধুর মত ব্যবহার করিতেছে। ইহার ফল স্বরূপ প্রায় সকলেই তাহাদের প্রতি প্রীতিপূর্ণ আচরণ করিয়া সদ্ব্যবহারের প্রতিদান দিবে। কিন্তু

এবং প্রীতিস্নিগ্ধ স্বভাবের বিশেষ সার্থকতা আছে ; ইহা কিশোর কিশোরীর চরিত্রে কমনীয় মাধুর্য দান করে এবং অপরের নিকট হইতে যেরূপ স্নেহ-মধুর আচরণ ও সাড়া কামনা করা হয় তাহাই সৃষ্টি করে। যথার্থ চরিত্রগঠনের শিক্ষার ইহা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় সুফল।

দ্বাদশ অধ্যায়

যৌন শিক্ষা

যৌন সম্পর্কিত বিষয় এত কুসংস্কার এবং নিষেধের বেড়াজালে ঘেরা যে, অত্যন্ত শংকার সঙ্গে এ সম্পর্কে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতেছি। ভয় হয়, পাছে যে-সব পাঠক এ পর্যন্ত আমার শিক্ষানীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারাও এ ক্ষেত্রে প্রয়োগের সময় তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁহারা হয়ত বিনা দ্বিধায় স্বীকার করিয়াছেন যে, নির্ভীকতা এবং স্বাধীনতা শিশুর পক্ষে মঙ্গলজনক; তথাপি যৌন ব্যাপারে তাঁহারাই হয়ত এ নীতির বিরোধিতা করিয়া শিশুদের উপর অকারণ ভীতি ও দাসত্ব প্রয়োগ করার পক্ষপাতী হইতে পারেন। যে-নীতি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া আমি বিশ্বাস করি, তাহা আমি কোনক্রমেই সংকুচিত করিতে রাজী হইব না; মানব চরিত্রের অন্যান্য আবেগ, যেমন খেলা, নূতন কিছু গঠন করা, ভয়, স্নেহ প্রভৃতির বিকাশ বা নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যেরূপ অবস্থা অবলম্বন করিয়াছি, যৌন ব্যাপারেও আমি ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করার পক্ষপাতী।

যৌনভাব ও ফ্রয়েডিয় মতবাদ :

নানারূপ বাধানিষেধ আরোপ ও ঢাকঢাক-গুড়গুড় ছাড়াও যৌনভাবের একটি বিশেষত্ব এই যে, এ প্রবৃত্তি দেরীতে পরিপক্ক হয়। মনঃসমীক্ষকগণ সত্যই দেখাইয়াছেন যে, শৈশবেও যৌনপ্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে; তবে ইঁহাদের অভিমতের মধ্যে অনেকখানি অতিরঞ্জন আছে।

যৌন প্রবৃত্তির শিশুসুলভ প্রকাশ বয়স্ক ব্যক্তিদের আচরণ হইতে পৃথক, ইহার বেগও যথেষ্ট কম। বয়স্ক ব্যক্তির মত যৌনব্যাপারে লিপ্ত হওয়া শিশুর পক্ষে দৈহিক দিক দিয়াই অসম্ভব। প্রথম যৌবনাগম কিশোর কিশোরীর মনে এক প্রক্ষোভময় বিষয় আলোড়ন সৃষ্টি করে; পাঠ্য-জীবনের মাঝখানে বয়ঃসন্ধিক্ষণের রঙিন উন্মাদনা স্বাভাবিক শিক্ষা গ্রহণের পথে বিঘ্ন উপস্থিত করে, এগুলি অপসারণ করিয়া সুস্থ স্বাভাবিক জীবন বিকাশের পথে কিশোরকে পরিচালিত করা শিক্ষাব্রতীর বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়; এরূপ সমস্যার অধিকাংশ সম্বন্ধেই কোন আলোচনার চেষ্টা করিব না; কেবল যৌবনাগমের পূর্বে কি করা কর্তব্য তাহাই হইবে আমার আলোচ্য বিষয়। এই সম্পর্কে শিক্ষা সংস্কারের

আবশ্যকতা অত্যন্ত বেশী, বিশেষতঃ বাল্যকালের শিক্ষায়। যদিচ ফ্রয়েডিয় মনোবিজ্ঞানীদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে আমার মতের অনৈক্য ঘটিয়াছে তবু আমার মনে হয় একটি বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছে: তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, বাল্যে যৌন সংক্রান্ত ব্যাপারে শিশুদের প্রতি যথাযথ আচরণ না হওয়ার ফলে পরবর্তীকালে স্নায়বিক বিকলতার উদ্ভব হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে তাঁহাদের কাজে যথেষ্ট সুফল প্রদান করিয়াছে কিন্তু এখনও বহু পুঞ্জীভূত কুসংস্কার দূর করা প্রয়োজন। শিশুর যৌনভাব সংক্রান্ত কুসংস্কারগুলি দূর করার একটি প্রধান অন্তরায় হইল তাহার জীবনের প্রথম কয়েক বৎসর তাহার লালন-পালনের ভার সম্পূর্ণ অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদের উপর ন্যস্ত করা। ইহার ফলে অনেক ক্ষেত্রে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যাহা সোজাসুজি বর্ণনা করিলে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হইতে হইবে বলিয়া বিশেষত পর্যবেক্ষক পণ্ডিতগণ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহার বিবরণ দিয়া থাকেন। মূর্খ পরিচারিকাগণ এ সম্বন্ধে কিছুই জানে না; তাহাদের পক্ষে বিশেষজ্ঞগণের সিদ্ধান্ত বিশ্বাস করার কোন প্রশ্নই উঠে না।

করমৈথুন:

শিশুর যৌন সমস্যাগুলিকে ক্রম অনুসারে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই জননী ও পরিচারিকাকে বিব্রত করে যে সমস্যা তাহা হইল শিশুর করমৈথুন। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, দুই হইতে তিন বৎসর বয়সের সকল বালক-বালিকাই এরূপ করিয়া থাকে এবং কিছুদিন পরে আপনা হইতেই ইহা বন্ধ হইয়া যায়। কখনো কখনো দৈহিক কণ্ডুয়নের ফলে এই বিব্রতকর কাজটি বেশী হয় কিন্তু ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ইহার কারণ দূর করা যায়। (কি ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত তাহা আমার বিবেচ্য বিষয় নয়)। কিন্তু এরূপ কারণ ব্যতিরেকেই সাধারণতঃ শিশুরা করমৈথুন করিয়া থাকে। এই ব্যাপারে অভিভাবকগণ শংকান্বিত হইয়া উঠেন এবং ইহা বন্ধ করিবার জন্য ভীতি প্রদর্শন করিতে থাকেন। কার্যতঃ ভীতিপ্রদর্শনে কোন উপকার হয় না কিন্তু ফল হয় এই যে, ভয় শিশুর মানস স্তরে প্রবেশ করে এবং দমিত হইয়া তাহাই পরে শিশুর জীবনে দুঃস্বপ্ন, স্নায়বিক দুর্বলতা, ভ্রান্ত এবং অহেতুক ভীতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। শিশুর করমৈথুন দূর করার চেষ্টা না করিলেও কোন ক্ষতি নাই; তাহার স্বাস্থ্য এবং চরিত্রের উপর ইহার কোন কুফল দেখা যায় না। খুব কম ক্ষেত্রেই ইহা সামান্য অনিষ্ট করে কিন্তু ইহা সহজেই নিরাময় করা সম্ভব; এ অভ্যাসটি আঙুল চোষার চেয়ে বেশী গুরুতর বা অপকারী

নয়। স্বাস্থ্য ও চরিত্রের উপর কর-মৈথুন যে কুফল লক্ষ্য করা গেছে এই অভ্যাস বন্ধ করার চেষ্টা হইতেই তাহার উদ্ভব। কর-মৈথুন শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর হইলেও ভয় দেখাইয়া এই কুৎসিত অভ্যাস ত্যাগ করানো না গেলে শুধু নিষেধ করা বিজ্ঞোচিত কাজ হইবে না। কেননা নিষেধ করিলেই যে শিশু এ অভ্যাস হইতে বিরত হইবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। আপনি যদি বন্ধ করার কোন চেষ্টা না করেন তবে সম্ভবত ইহা আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যাইবে কিন্তু এ বিষয়ে চেষ্টা করিলেই বরং নানা মানসিক জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। কাজেই প্রতিক্রিয়ার ফলাফল বিবেচনা করিয়া শিশুকে এ সম্বন্ধে স্বাধীনতা দেওয়াই ভাল। অবশ্য আমি একথা বলিতেছি না যে, নিষেধ করা ব্যতীত অন্য কোন সম্ভাব্য উপায় গ্রহণ করা হইতেও বিরত থাকিতে হইবে। যাহাতে শিশু বেশীক্ষণ বিছানায় জাগিয়া না থাকে সেজন্য ঘুম ধরিলে তাহাকে শুইতে দিবেন। যাহাতে তাহার মন অন্য কোন দিকে আকৃষ্ট হয় সেজন্য তাহার প্রিয় কতকগুলি খেলনা বিছানায় রাখিতে দিবেন; এরূপ প্রক্রিয়ায় কোন অপকার হয় না। ইহাতে যদি কোন উপকার না হয় তবে শিশুকে বাধা দিবেন না, বা একটি খারাপ অভ্যাস করিতেছে বলিয়া সেদিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন না, স্বাভাবিকভাবে শিশুকে অন্য বিষয়ে মনোযোগী করিতে পারিলে আপনা হইতেই সে ইহাতে ক্ষান্ত হইবে। এ চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও দুশ্চিন্তার কারণ নাই; শিশুর কর-মৈথুন অভ্যাস বেশীদিন থাকে না।

সাধারণতঃ শিশুর তৃতীয় বৎসরে যৌন কৌতূহল সুরু হয়। পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীলোকের, বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে শিশুর দৈহিক পার্থক্য প্রথমে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শৈশবে এই কৌতূহলের আর কোন বিশেষত্ব নাই, ইহা তাহার সাধারণ কৌতূহলের অন্তর্গত। শুধু যেখানে ব্যাপারটিকে রহস্যাবৃত করিয়া রাখিবার রীতি, সেখানেই শিশুদের মধ্যে ডেঁপোমির ভাব দেখা যায়। যেখানে কোন রহস্য নাই সেখানে কৌতূহল তৃপ্ত হইলেই আগ্রহ কমিয়া যায়। প্রথম হইতেই শিশুকে তাহার মা বাবা, ভাই বোনকে মাঝে মাঝে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখিতে দিতে হইবে। বস্ত্র পরিবর্তনের সময় অন্য কখনো স্বাভাবিক অবস্থায় শিশুর সম্মুখে ক্ষণিকের জন্য নগ্নদেহ হইলেও আচরণে কোনরূপ ভাবান্তর দেখানো উচিত নয়; বয়স্ক ব্যক্তি বা শিশু কাহারই ইহাতে কিছু মনে করিবার নাই; নগ্নতা সম্বন্ধে বয়স্ক ব্যক্তিদের যে বিশেষ কোন মনোভাব আছে তাহা শিশু না জানিলেই হইল। (পরে অবশ্য তাহাকে জানিতে হইবে)। দেখা যাইবে শিশু অতি সহজেই তাহার পিতা ও মাতার দৈহিক

পার্থক্য লক্ষ্য করিবে এবং তাহার মাতা ও ভগিনীর দৈহিক পার্থক্যও যে অনুরূপ ধরণের তাহা বুঝিতে পারিবে। এতটুকু পর্যন্ত বুঝিতে পারিলে দৈহিক পার্থক্য সম্বন্ধে আগ্রহ যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া যাইবে, আলমারী বা টেবিলের দেরাজ মাঝে মাঝে খোলা থাকিলে তাহার সম্বন্ধে শিশুর কৌতূহল যেমন বিশেষ থাকে না তেমনি। এই সময়ে শিশু যৌন বিষয় সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন করিলে অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নের মতই তাহারও উত্তর দিতে হইবে।

যৌন বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্নের উত্তরদান যৌন শিক্ষার একটি প্রধান অংশ। এ প্রসঙ্গে দুইটি নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। প্রথম সর্বদা সত্য উত্তর দিন ; দ্বিতীয় যৌন-জ্ঞানকে অন্য যে-কোন জ্ঞানের মত বিবেচনা করুন। যদি কোন শিশু আপনাকে চন্দ্র, সূর্য, মেঘ, মোটরগাড়ি বা এঞ্জিন সম্বন্ধে বুদ্ধির পরিচায়ক কোন প্রশ্ন করে তবে আপনি খুশী হন এবং সে যতটুকু বুঝিতে পারে সেই অনুপাতে প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকেন। কিন্তু সে যদি যৌনবিষয় সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন করে আপনি হয়ত বলিবেন, 'চুপ চুপ'। আপনি যদি জানেন যে, এরূপ বলা উচিত নয় তবু হয়ত সংক্ষেপে এবং শুষ্কভাবে ইহার উত্তর দিবেন ; আপনার আচরণে বিব্রত হওয়ার ভাব প্রকাশ পাইতে পারে, শিশু তৎক্ষণাৎ আপনার আচরণের সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ্য করিবে এবং বুঝিবে সে প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে কোন কিছু গুপ্ত রহস্য জড়িত আছে। রহস্যাবৃত বিষয়ের প্রতিই শিশুর কৌতূহল বেশী জাগ্রত হয়। যৌন-বাসনা ও যৌন-জীবন সম্পর্কেও এই-ভাবে শিশু আকৃষ্ট হইতে পারে। কখন যেন মনে করিবেন না যে, যৌন আচরণে ভীতিকর অন্যায় এবং অপবিত্র কোন ভাব আছে। আপনি যদি এরূপ মনে করেন শিশু ইহা বুঝিতে পারিবে। সে তবে স্বভাবতই ভাবিবে যে, তাহার পিতামাতার সম্পর্কের মধ্যে গোপনীয়, নোংরা কোনরকম আচরণ আছে, পরে সে সিদ্ধান্ত করিবে যে, জনকজননী তাহা জন্মদান ক্রিয়াকে অশোভন ও কুৎসিৎ বলিয়া মনে করেন। ইহার ফলে সে নিজেকে সর্বদা অপবিত্র এবং পাপকর্মের ফল বলিয়া বোধ করিতে থাকিবে। এইরূপ ভাব বিদ্যমান থাকিলে কিশোর কিশোরীর, এমন কি যুবক যুবতীর পর্যন্ত প্রবৃত্তি এবং মানসিক আবেগগুলির সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ প্রায় অসম্ভব হইয়া ওঠে।

শিশুর যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার মত বয়স হইয়াছে যেমন ধরুন তিন বছর বয়সের পর—তখন যদি তাহার ভাই বা বোন জন্মগ্রহণ করে তবে তাহাকে বলুন যে, শিশুটি তাহার মায়ের দেহের মধ্যে ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিয়াছে ;

ঠিক এইভাবে সে নিজেও যে বাড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাও বলুন। বালককে ছোট্ট শিশুর মাতৃস্তন্য পান করা দেখিতে দিন, তাহাকে বলুন সে নিজেও এমনিভাবে স্তন্যপান করিয়াছিল। যৌন-জীবন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের মত এ বিষয়ও শিশুকে সহজ সরলভাবে বুঝাইয়া দিবেন। ইহার মধ্যে গুরু-গাম্ভীর্য আনিবার কোন প্রয়োজন নাই। মাতৃত্বের পবিত্র এবং রহস্যঘন কর্তব্য সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই। সমস্ত বিষয়টি হওয়া উচিত সহজ এবং বস্তুনিষ্ঠ।

যে বয়সে শিশুর প্রথম যৌন কৌতূহল জাগ্রত হয় তখন যদি পরিবারে কোন সন্তানের জন্ম না হয় তাহা হইলেও এ প্রশ্নের অবতারণা করা যায়। তখন বলিতে হয়—'তোমার জন্মের পূর্বে এ ঘটনাটি ঘটিয়াছিল'। ইহা হইতেই প্রশ্নোত্তর সুরু হইতে পারে। আমার ছেলের বেলায় দেখি—সে যে এক সময় বর্তমান ছিল না তাহা বোঝাই তাহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। কখন পিরামিড তৈয়ার করা হইয়াছিল বা এই জাতীয় প্রাচীন কোন কাহিনী বলিতে গেলেই সে জিজ্ঞাসা করে তখন সে কি করিত। যদি বলি—তখন সে জন্মায় নাই, তাহার অস্তিত্ব ছিল না তবে সে বড়ই হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে। দুইদিন আগে হউক আর পাছে হউক 'জন্মানো' মানে কি তাহা সে জানিতে চাহিবে; তখন আমরা তাহাকে বলিব।

শিশু যদি পশুপালন ক্ষেত্রে বাস করে তবে সন্তানের জন্মদান ব্যাপারে পিতার অংশ কি স্বাভাবিক অবস্থায় সে প্রশ্ন তাহার মনে উঠিবে না। কিন্তু শিশু যাহাতে এই জ্ঞান পিতামাতা বা শিক্ষকের নিকট হইতে পায় সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা না হইলে কুশিক্ষাপ্রাপ্ত কুৎসিৎ স্বভাবের ছেলেদের নিকট হইতেই সে ইহা শিখিবে। আমার বয়স যখন বারো বৎসর তখন অন্য একটি ছেলে আমাকে কি বুঝাইয়াছিল তাহা আমার স্পষ্ট মনে আছে; সমস্ত বিষয়টি অশ্লীলতাপূর্ণ এবং গোপন হাসিঠাট্টার উপকরণ বলিয়া মনে করা হইত। আমাদের সে যুগের ছেলেদের ইহাই ছিল স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা। ইহার ফল হইত যে, অধিকাংশ লোক সারাজীবন ধরিয়া যৌন ব্যাপারটিকে নোংরা হাসিঠাট্টার বিষয় মনে করিত এবং যে স্ত্রীলোক যৌন-সংস্পর্শে আসিত তাহারা তাহাদের সন্তানের জননী হইলেও তাহাদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত না। সন্তানের যৌন শিক্ষার ব্যাপারে পিতামাতা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিত, যদিও পুরুষগণ জানিত কিভাবে নিজেরা যৌনসম্পর্কিত প্রথম জ্ঞান লাভ করিয়াছিল! কুসঙ্গ হইতে বালকদের যৌনশিক্ষা লাভ করার ব্যবস্থা কিরূপে যে সুস্থ নীতিবোধ গঠনে সহায়তা করিত তাহা আমি কল্পনা করিতে

পারি না। যৌনজীবন স্বাভাবিক, শোভন এবং প্রীতিপদ—প্রথম হইতেই শিশুর মনে এই বোধ জন্মাইতে হইবে। ইহার অন্যথা করিলে স্ত্রী এবং পুরুষের সম্পর্ক, পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক বিষময় করিয়া তোলা হইবে। পিতা মাতা যখন পরস্পরকে ভালবাসেন এবং সন্তানদিগকে ভালবাসেন তখন তাঁহাদের মধ্যে যৌনজীবনের মধুর প্রকাশ। পিতামাতার পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের বিষয় বালককে অশ্লীল কিশোরদের নোংরা হাবভাব ও কুৎসিৎ ইঙ্গিত হইতে শিক্ষা করিতে না দিয়া পিতামাতার নিজেদেরই এ ভার গ্রহণ করা উচিত। ছেলে-মেয়ের মনে যদি এই ধারণা জন্মে যে, তাহাদের পিতামাতার যৌনজীবনের সম্পর্ক দূষণীয় গোপন ব্যাপার তবে তাহার ফলও ভাল হয় না।

যদি কোন পরিবারের শিশুর অন্য বালকদের খারাপ সঙ্গ হইতে যৌন-জ্ঞান শিক্ষার কোন আশংকা না থাকে তবে যতদিন সে স্বাভাবিক কৌতূহলের বশে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন না করে ততদিন অপেক্ষা করা চলে। কিন্তু যৌবনা-গমের পূর্বেই তাহাকে এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান দিতে হইবে। ইহা অবশ্য করণীয়। যৌবনারম্ভে যে দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন আসে সে সম্বন্ধে বালক বালিকাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ করিয়া রাখিলে তাহাদের উপর এক রকম নিষ্ঠুরতা দেখানো হয়; যৌবন-সূচনায় কিশোরী অকস্মাৎ যে দৈহিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হয় সে সম্পর্কে আগে হইতে তাহাকে অবহিত না করিলে কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া সে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িতে পারে। ইহা ছাড়া যৌনবিষয়টি কিশোরদের কাছে এমন উন্মাদনাকর যে, শৈশবে এ বিষয়ে আলোচনা তাহারা যেরূপ বিজ্ঞানসম্মত মনোভাবের সহিত গ্রহণ করিত, যৌবনের রঙিন আবেশ দেহমনে ছড়াইয়া পড়িলে আর তেমনভাবে পারে না। কাজেই যৌন-জীবন সম্বন্ধে কুৎসিৎ আলোচনা করার সম্ভাবনা বাদ দিলেও বালক বা বালিকাকে যৌবনারম্ভের পূর্বেই যৌন কাজের প্রকৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

কখন শিক্ষা দিতে হইবে?:

যৌবনাগমের কতদিন পূর্বে এ শিক্ষা দেওয়া উচিত তাহা কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করিবে। অনুসন্ধিৎসু এবং সক্রিয় বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুকে জড়-প্রকৃতির শিশু অপেক্ষা আগে এ শিক্ষা দিতে হইবে। কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। অনুসন্ধিৎসু বালকের কৌতূহলের অন্ত নাই; কৌতূহলের বশবর্তী হইয়াই সে এদিকে অল্পবুদ্ধি বালকের চেয়ে আগে আকৃষ্ট হইবে। কখনো কোন অবস্থাতেই শিশুর কৌতূহল অপরিতৃপ্ত রাখা উচিত হইবে না।

শিশু বয়সে যত ছোটই হউক, সে যদি জানিতে চায় তাহার কৌতূহল মিটাইতেই হইবে। কিন্তু সে যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন প্রশ্ন না করে তবু পাছে সে কুসংসর্গ হইতে খারাপভাবে কিছু জানিয়া ফেলে, সে দোষ নিবারণের জন্য দশ বৎসর বয়সের পূর্বেই তাহাকে যৌন-জীবন সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে গাছপালার বংশ বৃদ্ধি ও প্রাণীর প্রজনন সম্বন্ধে আলোচনার ভিতর দিয়া স্বাভাবিকভাবে তাহার কৌতূহল উদ্দীপ্ত করা বাঞ্ছনীয়। এজন্য কোনরূপ আড়ষ্টভাব বা গুরুগম্ভীর ভূমিকার প্রয়োজন নাই, খানিক কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া 'শোন খোকন, এ বয়সে তোমার যে বিষয়টি জানা বিশেষ প্রয়োজন তাই এখন বলছি' এই ধরণের মুখবন্ধসহ প্রসঙ্গ উত্থাপনের আবশ্যকতা নাই। বিষয়টি অতি সাধারণভাবে দৈনন্দিন ব্যাপারের প্রসঙ্গে তুলিতে হইবে। এই জন্যই প্রশ্নের উত্তর হিসাবে ইহার আলোচনা হইলেই ভাল হয়।

বালক ও বালিকাদের প্রতি যে একইরূপ আচরণ করা দরকার এবং তাহাদিগকে যে সমভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত সে সম্বন্ধে বর্তমান যুগে কোন যুক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। আমাদের বাল্যকালে 'ভাল ভাবে লালিত পালিত মেয়ের পক্ষে বিবাহ সম্বন্ধে কোন কিছু না জানিয়াও বিবাহিত হওয়া রেওয়াজ ছিল; স্বামীর নিকট হইতে সে যৌন-জীবন সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিত। কিন্তু অধুনাকালে এরূপ ঘটিতে শুনি নাই। আমার মনে হয়, এখন অধিকাংশ লোকই মনে করে অজ্ঞতার উপর যে গুণের ভিত্তি, তাহার কোন মূল্য নাই এবং বালিকাদেরও বালকের মত জ্ঞানলাভের অধিকার আছে। যাঁহারা ইহা মানেন না তাঁহারা হয়ত এ পুস্তক পাঠ করিবেন না; কাজেই তাঁহাদের সঙ্গে কোন যুক্তি-তর্কের অবতারণার প্রশ্ন উঠে না।

যৌননীতিজ্ঞানের শিক্ষা আমি সংকীর্ণ অর্থে আলোচনা করিতে চাই না। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন অভিমত আছে। খৃষ্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের পার্থক্য, মধ্যযুগীয়দের সঙ্গে স্বাধীন চিন্তাবাদীদের পার্থক্য রহিয়াছে। পিতামাতা যে যৌননীতিবিজ্ঞানে বিশ্বাস করেন, নিজেদের সন্তানদিগকেও তাঁহারা সেইমত শিক্ষা দিতে চান; এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা আমি পছন্দ করি না। কিন্তু এ সব জটিল বিতর্কসংকুল প্রশ্ন বাদ দিলেও সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য এমন অনেক বিষয় আছে।

যৌনবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যনীতি :

প্রথমেই বলা যাইতে পারে স্বাস্থ্যনীতির কথা। যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনার সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেই যুবকদের এ সম্বন্ধে জানা উচিত।

তাহাদিগকে এ সম্বন্ধে যথাযথ শিক্ষা দিতে হইবে; কতকলোক নীতি-উপদেশ দানের উদ্দেশ্যে যৌনব্যাধির কথা অতি রঞ্জিত করিয়া প্রচার করিয়া থাকে; এরূপ করা অনাবশ্যক। কেমন করিয়া যৌনরোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব এবং কেমন করিয়াই বা ইহা হইতে আরোগ্য লাভ করা যায় তাহাও শিখাইতে হইবে। কেবল সৎপ্রকৃতির সংযত ব্যক্তিদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাদান করিয়া অন্য সকলের দুর্ভোগকে পাপের উপযুক্ত শাস্তি মনে করা ভুল। তাহা হইলে মোটর চালনায় যে ব্যক্তি আহত হইয়াছে তাহাকেও কোন প্রকার সাহায্য না করিতে পারি এই বলিয়া যে, অসতর্ক অবস্থায় মোটর চালানো অন্যায়, অতএব পাপ। ইহা ছাড়া যৌনব্যাধির ক্ষেত্রে যেমন, মোটর চালানার ক্ষেত্রেও তেমনি নিরাপরাধ ব্যক্তির উপর শাস্তি পড়িতে পারে; একজন অসতর্ক মোটর চালক যদি কোন লোককে চাপা দেয় তাহাতে যেমন আহত ব্যক্তির কোন অপরাধ নাই, তেমনি কোন শিশু যদি সিফিলিস রোগ লইয়াই জন্মগ্রহণ করে তবে তাহাকেও দোষী বা পাপী মনে করা উচিত নয়।

যুবক-যুবতীদিগকে বুঝান দরকার যে, শিশুর জন্মদান একটি গুরুতর ব্যাপার এবং সন্তানের স্বাস্থ্য ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের সম্ভাবনা আছে কিনা তাহা বিবেচনা না করিয়া সন্তানোৎপাদন না করাই সঙ্গত। প্রাচীন গতানুগতিক ধারণা ছিল—বিবাহের পর সন্তানোৎপাদন সর্বদাই সমর্থনযোগ্য এমন কি ঘন ঘন বেশীসংখ্যক সন্তান হওয়ার ফলে প্রসূতীর স্বাস্থ্য যদি নষ্ট হইয়া যায়, সন্তানগণ যদি রুগ্ন এবং বিকৃত মস্তিষ্ক হয়, সকলের যদি যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যের সংস্থান না-ও হয় তবু ইহাতে দোষ নাই। হৃদয়হীন অদৃষ্টবাদীরাই কেবল এই অভিমত পোষণ করে; তাহাদের ধারণা মানুষের দুঃখদৈন্য অসম্মান ভগবানের মহিমার পরিচায়ক। শিশুদের প্রতি যাহাদের প্রীতি আছে, অসহায়ের উপর দুঃখের বোঝা যাঁহারা চাপাইয়া দিতে চান না তাঁহারাই এই নিষ্ঠুর নীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা এবং শিশুদের জীবনের প্রতি মমত্ববোধ নৈতিক শিক্ষার একটি অপরিহার্য অংশ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত।

মেয়েদিগকে একদিন সন্তানের জননী হইতে হইবে; এজন্য তাহাদের পক্ষে তৎকালে প্রয়োজনে লাগিতে পারে এমন কতক জ্ঞান মোটামুটি অর্জন করা উচিত। অবশ্য বালক ও বালিকা উভয়কেই শারীর-বিদ্যা ও স্বাস্থ্যনীতি কিছু কিছু শিখিতে হইবে। কিশোর-কিশোরীকে ইহা স্পষ্টভাবে বুঝাইতে হইবে যে অপত্যস্নেহ ব্যতীত কেহ ভাল পিতা বা মাতা হইতে পারে না; শুধু তাহাই নয়, অপত্যস্নেহের সঙ্গে অনেকখানি জ্ঞানেরও প্রয়োজন। শিশুর সহিত

আচরণে প্রবৃত্তি ব্যতীত জ্ঞান এবং জ্ঞান ব্যতীত প্রবৃত্তি উভয়ই সমান অকেজো। জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা যতই অনুভূত হইবে ততই বেশীসংখ্যক বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক মাতৃত্বের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। বর্তমানে অনেক উচ্চশিক্ষিতা মহিলা ইহাকে অবজ্ঞা করেন ; তাঁহাদের ধারণা বুদ্ধি প্রয়োগের সুযোগ ইহার ভিতর নাই। বুদ্ধিমতী উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের পক্ষে মাতৃত্ব লাভ হইতে বিরত থাকা সমাজের পক্ষে বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়। কারণ এদিকে তাঁহাদের চিন্তা নিয়োজিত হইলে তাঁহারা উৎকৃষ্ট জননী হইতে পারেন।

যৌনপ্রেম ও হিংসা :

যৌন ভালবাসা সম্বন্ধে শিক্ষাপ্রসঙ্গে আরো একটি বিষয়ে বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন। প্রেমের ব্যাপারে জোর জবরদস্তি বা হিংসা স্বভাবত হয় না ; বরং দুঃখ ও অশান্তি সৃষ্টি করে। স্থূলপ্রেম যখন মূর্ত হইয়া উঠে অর্থাৎ প্রেমের বস্তুর উপর যখন অধিকার বিস্তারের বাসনা জাগে তখনই প্রেমের স্বাধীনতা লোপ পায় ; ব্যক্তিত্বের অবসান ঘটে ; যেখানে এরূপ কড়াকড়ি নাই সেখানে আছে নিবিড় আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। পূর্ববর্তী যুগে পিতা-মাতা সন্তানদের নিকট হইতে কর্তব্য হিসাবে ভালবাসা আদায় করিতে চেষ্টা করিয়া সন্তান-সন্ততির সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক তিক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এখনও অনেক স্বামী-স্ত্রী এই একই প্রকার ভুল পন্থা অবলম্বন করিয়া পরস্পরের মধ্যেকার প্রীতির সম্পর্ক ধ্বংস করিয়া ফেলেন। ভালবাসাকে কর্তব্য বলিয়া গণ্য করা যায় না, কেননা ইহা ইচ্ছার বশ নহে। ইহা একটি শ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় দান। ইহা মুক্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত হইলে সৌন্দর্য ও আনন্দের শতদল বিকশিত করিয়া তোলে কিন্তু খাঁচায় ভরিয়া রাখিলে প্রেমের অপমৃত্যু ঘটে। এখানেও ভয় শত্রু। জীবনে আনন্দের উপাদান হারাইবার ভয়ে যে ব্যক্তি ভীত হয় এবং ইহাকে আষ্টেপিষ্টে আঁকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করে তাহার ভাগ্যে কখনও সুখ-প্রাপ্তি ঘটে না। অন্যান্য ব্যাপারে যেমন যৌনপ্রেমের ব্যাপারেও তেমনি নির্ভীকতাই বুদ্ধি ও বিজ্ঞতার মূল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নার্সারি স্কুল

কিরূপ অভ্যাস গঠিত হইলে তাহা শিশুর পক্ষে সুখদায়ক এবং তাহার পরবর্তী জীবনে প্রয়োজনীয় হইতে পারে সে সম্বন্ধে আগের অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই সদভ্যাস গঠনের শিক্ষা পিতামাতা দিবেন কিংবা ইহার জন্য নির্ধারিত কোন বিদ্যালয় থাকিবে সে প্রশ্ন আলোচিত হয় নাই। আমার মনে হয় কেবলমাত্র দরিদ্র, অশিক্ষিত এবং অতিরিক্ত কর্মভার প্রপীড়িত জনকজননীর সন্তানদের জন্যই নয়, সকল শিশুদের জন্যই বিশেষ করিয়া সহরের শিশুদের জন্য নার্সারি স্কুল বা শিশুপালনাগার একান্ত আবশ্যক। আমি বিশ্বাস করি যে, যে-কোন অবস্থাপন্ন লোকের পুত্রকন্যা অপেক্ষা ডেপ্টফোর্ডে (Deptford) শ্রীমতী ম্যাকমিলান কর্তৃক পরিচালিত নার্সারি স্কুলের শিশুরা ভাল শিক্ষা পাইতেছে। এইরূপ সুশিক্ষার ব্যবস্থা ধনী-দরিদ্র সকল শিশুদের জন্যই প্রসারিত হউক, ইহাই আমি কামনা করি। কোন একটি বিশেষ নার্সারি স্কুলের বিষয় বর্ণনা করার পূর্বে কি কি কারণে এরূপ বিদ্যালয় বাঞ্ছনীয় তাহা আলোচনা করা যাক।

প্রথমেই বলা যায়—শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক গুণগুলি বিকাশের পক্ষে শৈশবকাল অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর দেহ ও মনের বিকাশ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় : ভয় শিশুর শ্বাসপ্রশ্বাসের ত্রুটির কারণ হইয়া দাঁড়ায় এবং দোষপূর্ণ শ্বাসপ্রশ্বাসের অভ্যাস নানাপ্রকার রোগ সৃষ্টি করে। ভয় মানসিক ব্যাপার কিন্তু শিশুর দেহের উপরও ইহার প্রক্রিয়া রহিয়াছে। এইরূপ পরম্পরাবদ্ধ সম্বন্ধ এত বেশী যে, চিকিৎসা সংক্রান্ত কিছুটা জ্ঞান ব্যতীত শিশুর চরিত্রগঠনে আশানুরূপ ফললাভ সম্ভবপর নয়, তেমনি শিশুর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান না থাকিলে কেহ শিশুকে স্বাস্থ্যবান করিয়া গড়িয়া তোলার আশাও করিতে পারেন না। শিশুর দেহ ও মন উভয়দিকের পুষ্টিসাধনের জন্য যেরূপ জ্ঞান প্রয়োজনীয় তাহার অধিকাংশই নূতন; প্রাচীন চিরাচরিত প্রথার সহিত ইহাদের মিল নাই। উদাহরণস্বরূপ শিশুকে শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে অভ্যাস করানো প্রশ্নটি ধরুন। শিশুর সহিত কোন দ্বন্দ্বে অর্থাৎ আপনি তাহাকে যেরূপভাবে চলিতে, যেরূপ আচরণ করিতে বলেন তাহা যদি সে না মানিয়া চলে এরূপ অবস্থায় প্রধান নীতি হইল : আপনি নত হইবেন না বা পরাজয় স্বীকার করিবেন না কিন্তু শিশুকে শাস্তি

দিয়া বাধ্য করিতে বা জোরজবরদস্তি করিতে চেষ্টাও করিবেন না। সাধারণ পিতামাতা ইহার বিপরীত পন্থাই গ্রহণ করেন ; নির্ঝঞ্ঝাট ও শান্ত জীবন কামনা করিয়া অনেক পিতামাতা পুত্রকন্যার সঙ্গে এরূপ কোন দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হন না, আবার কখনও বা শিশুদের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া শাস্তি দিয়া থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে কৃতকার্য হইতে হইলে পিতামাতার চরিত্রেও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তাহা হইলে ধৈর্য এবং নীরবে প্রভাব বিস্তার করার মত চারিত্রিক শক্তি। এই তো গেল শিশুর ক্রমবিকাশ ব্যাপারে অভিভাবকের মনস্তত্ত্বসম্মত আচরণের কথা। এবার ধরুন শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে মুক্ত বায়ুর প্রভাবের কথা। বুদ্ধি প্রয়োগ এবং সতর্কতা অবলম্বন করিলে দিবারাত্রি সর্বদাই মুক্ত বাতাস এবং কম পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত থাকা শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী কিন্তু সতর্কতা এবং বুদ্ধির অভাবে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগার ফলে শিশুর অপকার হওয়ার সম্ভাবনাও আছে।

পিতামাতার পক্ষে শিশুদিগকে মানুষ করার উপযুক্ত নূতন জ্ঞান ও কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান বা সেগুলি প্রয়োগ করার অবসর নাও থাকিতে পারে। অশিক্ষিত পিতামাতার বেলায় এ প্রশ্ন উঠে না ; প্রকৃত উপায় তাঁহারা জানেন না, বুঝাইয়া দিলেও বিশ্বাস করেন না। আমি সমুদ্রের ধারে একটি কৃষিপ্রধান জেলায় বাস করি ; এখানে টাট্‌কা খাদ্যদ্রব্য সহজে মেলে, শীত বা গ্রীষ্মের আধিক্যও বেশী নয়। শিশুদের স্বাস্থ্যের পক্ষে চমৎকার বলিয়াই আমি এ স্থান পছন্দ করিয়াছিলাম। তথাপি এখানকার কৃষক এবং দোকানীদের প্রায় সব ছেলেমেয়ের মুখ দেখি রোগা ফ্যাকাশে; কাজেকর্মে তাহারা অলস, কেবল খেলাধূলায় পটু। সমুদ্রের তটে তাহারা কখন যায় না কারণ তাহাদের ধারণা পা ভিজানো স্বাস্থ্যের পক্ষে ভয়ানক খারাপ ; গৃহের বাহিরে গেলেই তাহারা পশমের মোটা কোট পরিয়া থাকে, এমন কি গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমের দিনেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। খেলার সময় যদি হৈ-চৈ করে তাহাদের আচরণ 'ভদ্র' করার চেষ্টা করা হয়। অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাহারা বাড়ির বাহিরে থাকিলে কোন আপত্তি করা হয় না, খাদ্যের ব্যাপারে কোন বাধা নিষেধ নাই; বয়স্ক ব্যক্তিদের উপযোগী ছোটদের পক্ষে অপকারী সব রকম খাদ্যই তাহারা গ্রহণ করে। তাহাদের পিতামাতারা বুঝিতে পারে না আমার ছেলে মেয়েরা ঠাণ্ডায় এতদিন মরিয়া যায় নাই কেন। কিন্তু চোখের সম্মুখে উদাহরণ দেখিয়াও তাহারা বিশ্বাস করে না যে, তাহাদের সন্তান-মানুষ-করার প্রণালীতে অনেক গলদ আছে। তাহারা দরিদ্র নয়, সন্তানের প্রতি স্নেহহীনও নয় কিন্তু কুশিক্ষার ফলে নিদারুণভাবে অজ্ঞ। সহরবাসী গরীব ও কর্মক্লান্ত পিতামাতার পক্ষে এইরূপ অশিক্ষার কুফল

আরো বেশী। কিন্তু যে পিতামাতা উচ্চশিক্ষিত, সন্তানের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন এবং অতিরিক্ত কর্মব্যস্ত নন তাঁহারাও শিশুদের পক্ষে যে পরিমাণ যত্ন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার এবং যে পরিমাণ শিক্ষা তাহারা নার্সারি স্কুলে পায় সেরূপ বাড়িতে দিতে পারেন না। শিশুদের ক্রমবিকাশের অনুকূল যে সর্বপ্রধান ব্যবস্থা অর্থাৎ সমবয়সী শিশুদের সঙ্গ তাহা বাড়িতে দুর্লভ। পরিবার যদি ছোট হয়—আজকাল ইহা হইয়াছে রীতি—তবে শিশুরা বয়স্কদের দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ করে। প্রায় সর্বদা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। ইহার ফলে শিশুরা ডেঁপো ও ইঁচড়েপাকা হইয়া উঠে। ইহা ছাড়া অনেক শিশুর সংস্পর্শে আসার ফলে শিশু যে বাস্তব শিক্ষা পায় পিতামাতা তাহা দিতে পারেন না। ধনীব্যক্তিরাই কেবল শিশুদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ফাঁকা জায়গা এবং খেলার সরঞ্জামের ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু ইহারও কুফল আছে। যে শিশুদের এরূপ বিশেষ বন্দোবস্ত থাকে তাহাদের মনে ইহার জন্য গর্ববোধ হয় এবং তাহারা নিজেদিগকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। নৈতিক শিক্ষা হিসাবে ইহা বড়ই ক্ষতিকর। এইসব কারণে আমার মনে হয়, কাছাকাছি নার্সারি স্কুল থাকিলে অবস্থাপন্ন এবং উচ্চশিক্ষিত পিতামাতাও দুই বৎসর বয়সের সময় হইতেই শিশুকে সেখানে পাঠাইলে উপকারই পাইবেন।

বর্তমানে পিতামাতার অবস্থানুযায়ী সন্তানদের শিক্ষার জন্য বিলাতে দুই রকম শিশু-বিদ্যালয় আছে: ফ্রয়বেল স্কুলে এবং মন্তেসরি স্কুলে ধনী লোকদের ছেলেমেয়েদের জন্য, গরীবলোকদের সন্তান সন্ততির জন্য আছে অল্পসংখ্যক নার্সারি স্কুল। নার্সারি স্কুলগুলির জন্য শ্রীমতী ম্যাকমিলানের বিবরণ সন্তানের মঙ্গলকামী প্রত্যেক ব্যক্তিরই পড়া উচিত। আমার মনে হয় ধনী-ব্যক্তির ছেলেমেয়েদের জন্য পরিচালিত কোন স্কুলই শ্রীমতী ম্যাকমিলানের স্কুলের মত এত ভাল নয়, কারণ এখানে ছাত্রসংখ্যা বেশী; তাহা ছাড়া মধ্যবিত্ত পরিবারের অভিভাবকগণ যেমন অল্পতেই হৈ-চৈ করিয়া শিক্ষককে বিব্রত করিয়া তোলেন এখানে সেরূপ হয় না। শ্রীমতী ম্যাকমিলান সম্ভবপর হইলে শিশুকে এক বছর হইতে সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁহার স্কুলে রাখেন যদিও শিক্ষাকর্তৃপক্ষ শিশুদিগকে পাঁচ বৎসর বয়সে সাধারণ প্রাথমিক স্কুলে পাঠাইবার পক্ষপাতী। শিশুরা সকাল আটটায় স্কুলে আসে এবং সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত থাকে; তাহারা সবাই স্কুলে খাবার খায়। যতক্ষণ সম্ভব তাহারা ঘরের বাহিরেই কাটায়, ঘরেও প্রচুর মুক্ত বাতাসের বন্দোবস্ত আছে। শিশুকে ভর্তি করার পূর্বে তাহাকে ডাক্তারী পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় এবং কোন অসুখ থাকিলে চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করান হয়। অতি অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হইলেও ভর্তির পর

সাধারণতঃ সুস্থ থাকে। স্কুলে একটি বড় মনোরম উদ্যান আছে; এখানে অনেক সময় আনন্দে খেলাধূলায় অতিবাহিত হয়। মন্তেসরি প্রণালীতে শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে। দুপুরে খাওয়ার পর সকল শিশু ঘুমাইয়া পড়ে। যদি রাত্রিতে এবং রবিবারে শিশুদিগকে নিরানন্দ জীর্ণ বাসগৃহে অনেক সময় মাতাল পিতামাতার সঙ্গে একই কুঠরীতে ঘুমাইতে হয় তবে দেহে এবং বুদ্ধিতে এই শিশুগণ মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুদের মতই যোগ্যতা অর্জন করে। শ্রীমতী ম্যাকমিলান তাঁহার বিদ্যালয়ের সাতবৎসর বয়স্ক বালকবালিকার কথা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন:

'তাহারা প্রায় সকলেই দীর্ঘ ও ঋজু। সকলেই দীর্ঘ না হইলেও ঋজু সবাই; বেশীর ভাগেরই দেহ সুগঠিত, পরিষ্কার ত্বক, উজ্জ্বল চোখ এবং রেশম কোমল চুল। উচ্চ মধ্যবিত্তশ্রেণীর সাধারণ ছেলেমেয়ে অপেক্ষা ইহারা প্রায় সবাই উন্নত ধরণের। এই গেল দৈহিক আকৃতি ও গঠনের কথা। মানসিক দিক দিয়াও ইহারা তীক্ষ্ণ অনুভূতি-সম্পন্ন, অপরের সঙ্গে মিলিতে ইচ্ছুক, নানা কাজের ভিতর দিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে উৎসুক। ভাল লিখিতে পারে এবং অনায়াসে বলিতে পারে। এরূপ যে-কোন ছাত্র ভাল ইংরাজি এবং ফরাসী ভাষাও বলে। সে কেবল নিজের যত্ন নিজে লইতেই শেখে নাই, কয়েক বছর ধরিয়া অন্যান্য ছোট ছেলেমেয়েদিগকে সাহায্যও করিয়াছে; সে গণিতে পারে, ওজন করিতে পারে, নক্সা আঁকিতে পারে; বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি তাহার হইয়াছে। তাহার প্রথম কয়েক বৎসর শান্ত ও প্রীতিপূর্ণ পরিবেশে কৌতুক ও আমোদের ভিতর দিয়া অতিবাহিত হইয়াছে, শেষের দুই বৎসর হইয়াছে নানা গবেষণা ও আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। বাগান সম্বন্ধে তাহার ধারণা হইয়াছে; সে নিজে চারাগাছ পুঁতিয়াছে, তাহাতে জলসেচন করিয়াছে, গাছপালা এবং প্রাণীর যত্ন পরিচর্যা করিয়াছে। সাত বছর বয়সের বালকবালিকা নাচিতে পারে, গান করিতে পারে এবং অনেক খেলা জানে। এই রকম হাজার হাজার ছেলেমেয়ে নিম্ন প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির জন্য উপস্থিত হইবে। ইহাদিগকে লইয়া কি করা যায়? আমি প্রথমেই উল্লেখ করিতে চাই যে, সমাজের নিম্নস্তর হইতে এইরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সবল সুস্থ ছেলেমেয়ে স্কুলে ভীড় করিলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাজ বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। হয় নার্সারি স্কুল ব্যর্থ হইয়া একটি বাজে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে, আর না হয় ইহার প্রভাব শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও পড়িবে। ইহা নূতন ধরনের শিক্ষার্থীদল প্রস্তুত করিবে এবং দুই দিন আগেই হোক আর পাছেই হোক শুধু সব রকম স্কুলই নয় সামাজিক

জীবন, শাসনব্যবস্থা, আইন-কানুন এবং আমাদের সহিত অন্য জাতির সম্পর্কের উপর পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিবে।'

নার্সারি স্কুলের সুফল স্বরূপ যাহা আশা করা হইয়াছে তাহার মধ্যে অতিরঞ্জন আছে বলিয়া আমি মনে করি না। নার্সারি স্কুল যদি সার্বজনীন করা যায় তবে ইহা এক প্রজন্মকালের মধ্যে (in one generation) অর্থাৎ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে বর্তমান সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতর শিক্ষাগত যে গভীর পার্থক্য রহিয়াছে তাহা দূর করিতে সমর্থ হইবে; সকল নাগরিকের মানসিক ও দৈহিক উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হইবে, যাহা বর্তমানে কেবল অল্পসংখ্যক ভাগ্যবান এই সুবিধা ভোগ করিতেছেন; যে রোগ অপচিকীর্ষা এবং অজ্ঞতার গুরুভার মানুষের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে তাহা দূর করিতে পারিবে। ১৯১৮ সনের শিক্ষাআইন অনুসারে সরকারী অর্থে নার্সারি স্কুলের উন্নতি সাধনের কথা ছিল কিন্তু পরে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে সুবিধা লাভের আশায় যুদ্ধ জাহাজ এবং সিঙ্গাপুর জাহাজ-ঘাট (Dock) নির্মাণ করাই অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট বর্তমানে কেবল এই খাতেই বার্ষিক সাড়ে ছয় লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিতেছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের সন্তানদিগকে রোগ দুর্দশা এবং অশিক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করা হইয়াছে অথচ সাম্রাজ্য রক্ষার্থে যুদ্ধের আয়োজনে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ টাকা খরচ করা হয় তাহা নার্সারি স্কুলের বাবদ ব্যয় করিলে জনসাধারণকে এই দুর্ভোগের কবল হইতে রক্ষা করা সম্ভব। মহিলাগণ এখন ভোটের অধিকার পাইয়াছেন। তাঁহারা কি নিজেদের পুত্রকন্যার মঙ্গলকামনায় একদিন ইহা প্রয়োগ করিতে শিখিবেন?

নার্সারি শিক্ষার বৃহত্তর দিকটি ছাড়াও অন্য একটি বিষয় বিবেচনা করিবার আছে: শিশুদের উপযুক্ত যত্ন ও তত্ত্বাবধান বাবদ কাজ রীতিমত শিক্ষাসাপেক্ষ; পিতামাতার নিকট হইতে ইহা আশা করা যায় না এবং পরবর্তীকালের বিদ্যালয়ে শিক্ষা হইতেও ইহা পৃথক। শ্রীমতী ম্যাকমিলানের কথা আবার উধৃত করি:

> নার্সারিতে প্রতিপালিত শিশুর স্বাস্থ্য ভাল। তুলনায় সে কেবল বস্তীর ছেলেমেয়ে হইতেই উৎকৃষ্ট নয়, ভাল জেলার মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুও তাহার সমকক্ষ নয়: ইহা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, শিশুকে মানুষ করিতে অপত্যস্নেহ এবং পিতামাতার দায়িত্ববোধ হইতেও বেশী কিছু আবশ্যক। শাসন এবং জোরজবরদস্তি ব্যর্থ হইয়াছে; জ্ঞানবিহীন অপত্য-স্নেহ ব্যর্থ হইয়াছে কিন্তু শিশুর স্বভাব পরিবর্তিত হয় নাই। শিশুকে গড়িয়া তোলার চিন্তা বিশেষ শিক্ষা এবং কৌশলসাপেক্ষ।

তিনি আরো বলিয়াছেন :

নার্সারি স্কুলের একটি বড় সুফল হইল এই যে শিশুরা বর্তমানে প্রচলিত পাঠ্যক্রম দ্রুত শেষ করিতে পারিবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-জীবনের অর্ধেক কিংবা দুই-তৃতীয়াংশ কাল শেষ হইতেই তাহারা উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্য হইয়া উঠিবে।...মোট কথা, পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুকে কেবল তদারক করার আগড় না হইয়া নার্সারি স্কুল যদি প্রকৃতই শিশুর দৈহিক ও মানসিক শিক্ষার নিকেতন হয় তবে অল্প-দিনেই ইহা আমাদের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন আনয়ন করিবে। ইহা নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে শুরু করিয়া সকল প্রকার শিক্ষায়তন ছাত্রদের জ্ঞান ও সংস্কৃতির মান উন্নত করিবে। বর্তমানে যে রোগ ও দুঃখদুর্দশার প্রকোপের ফলে শিক্ষকের চেয়ে চিকিৎসকের প্রয়োজন বেশী অনুভূত হয় তাহা দূর করা সম্ভবপর হইবে। বর্তমানের বিদ্যালয় ইহার বিরাট প্রাচীর, প্রকাণ্ড প্রবেশ পথ, শক্ত খেলার মাঠ, আলোহীন বড় বড় শ্রেণীকক্ষ তখন দানবীয় ভবন বলিয়া মনে হইবে। নার্সারি স্কুল শিক্ষকদের প্রতিভা বিকাশের এক নূতন সুযোগ আনিয়া দিবে।

বাল্যের চরিত্রগঠনের শিক্ষা এবং পরবর্তীকালে বিদ্যালয়ে নিয়মিত শিক্ষা-দান এই দুই অবস্থার মধ্যবর্তীকালীন শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে নার্সারি স্কুল। নার্সারি স্কুল-এ উভয় দায়িত্বই পালন করে, শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদান কার্যে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এইরূপ বিদ্যায়তনেই শ্রীমতী মন্তেসরি তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর সার্থক প্রয়োগ করিয়াছিলেন। রোমে একটি বিরাট বাড়ির একটি বড় কক্ষে তিনি তিন হইতে সাত বৎসর বয়সের শিশুদের এক 'শিশুনিকেতন' পরিচালনা করেন। ডেপ্টফোর্ডে যেমন এখানেও তেমনি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরাই আসিত; ডেপ্টফোর্ডের মত এখানেও দেখা গিয়াছিল যে বাল্যকাল হইতে যত্ন লইলে শিশুদিগকে গৃহের কুফল এবং অসুবিধা হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদের যথোপযুক্ত দৈহিক ও মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটানো সম্ভবপর।

ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, (সেগুঁই-এর পর হইতে) শিশুদের শিক্ষায় যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে তাহা সবই হইয়াছে বুদ্ধিহীন এবং দুর্বলচিত্ত লোকদের পরীক্ষার ফল হইতে। জড়প্রকৃতি, দুর্বল মানসিকশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকেও মানসিক শক্তির বিষয়ে শিশু বলা যাইতে পারে। ইহাদের ক্ষীণ মননশক্তি বা বুদ্ধিহীনতা দূষণীয় মনে করা হইত না, বা শাস্তি দিয়া ইহা দূর করা যাইবে এমন ধারণাও করা হইত না। এই জন্যই ইহাদের বৈশিষ্ট্য এবং প্রতিকারের উপায়

চিন্তা করা হইয়াছিল। ডক্টর আর্নল্ড যেমন মনে করিতেন যে, চাবুক মারাই 'কুড়েমি দূর করার একমাত্র ঔষধ তাঁহার পরবর্তীকালের শিক্ষাবিদ্‌গণ সেরূপ মনে করিতেন না। এইজন্য ক্রোধের বশবর্তী হইয়া নয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই তাঁহারা এরূপ ছাত্রদের অবস্থা পর্যালোচনা করিতেন; কেহ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলে ক্রুদ্ধ শিক্ষক তাহাদিগকে বলিতেন না যে, বুদ্ধি-হীনতার জন্য তাহাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। বয়স্ক ব্যক্তিরা যদি শিশুদের প্রতি ধমক ও উপদেশ বর্ষণের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিতে পারিত তবে দুর্বল মননশক্তিসম্পন্ন লোকদিগকে পরীক্ষা না করিয়া তাহারা বুদ্ধিহীন শিশুদের শিক্ষার উপায় নির্ধারণ করিতে সক্ষম হইত। নৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে ধারণাই বহু অন্যায়ের জন্য দায়ী। দুইটি বালকের কথা কল্পনা করুন—একজন সৌভাগ্যক্রমে নার্সারি স্কুলে শিক্ষা পাইয়াছে। অন্যজন বস্তী-জীবনের মধ্যে লালিতপালিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বালকের যদি দৈহিক এবং মানসিক বিকাশ প্রথম বালকের চেয়ে হীনতর হয় তবে সে কি নিজেই ইহার জন্য 'নৈতিক দিক দিয়া দায়ী'? যে অজ্ঞতা ও উদাসীনতার জন্য তাহার পিতামাতা তাহার যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিল না সেজন্য তাহার পিতামাতা কি নৈতিকভাবে দায়ী? পাব্লিক স্কুলে পড়িবার সময় ধনীব্যক্তিদের মনে স্বার্থপরতা এবং কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা সঞ্চারিত করা হয় এবং ইহার ফলেই তাহারা নিজেদের একটি পৃথক সমাজ সৃষ্টি করিয়া সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ভোগবিলাসে মগ্ন হয়; এজন্য ধনীরাই কি 'নৈতিকভাবে দায়ী'? সকলেই অবস্থার দাস; বাল্যে তাহাদের চরিত্রের বুনন শুরু হইয়াছে, স্কুলে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ লাভ করে নাই। ইহার জন্য নৈতিক দায়িত্ব তাহাদের ঘাড়ে চাপাইয়া কোন লাভ নাই; তাহারা অন্যের মত চরিত্রগঠনের পক্ষে অনুকূল বাল্যকাল এবং বুদ্ধিবিকাশের পক্ষে অনুকূল বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে না পারিলে তাহাদের দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া অথবা তাহাদিগকে তিরস্কারে লাঞ্ছিত করিয়া কোন উপকার হইবে না।

জাগতিক ব্যাপারের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, শিক্ষাক্ষেত্রেও তেমনি উন্নতির একটিমাত্র পথই আছে; তাহা হইলে প্রেম কর্তৃক বিধৃত বিজ্ঞান। বিজ্ঞান ব্যতীত প্রীতি শক্তিহীন; প্রীতি-হীন বিজ্ঞান ধ্বংসকারী। শিশুদের শিক্ষাদান প্রণালীর যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে তাহা সম্ভব হইয়াছে এমন লোকদের চেষ্টায় যাঁহারা শিশুদিগকে ভালবাসিতেন; উন্নততর প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে এমন লোকদের দ্বারা যাঁহারা শিশুর ক্রমবিকাশ ও মনঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য অবগত ছিলেন। ইহা স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষালাভের একটি সুফল। আগেকার

দিনে শিশু-প্রীতি এবং বিজ্ঞানের একত্র মিলন ঘটে নাই। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান শিশুদের মন গড়িয়া তোলার মত যে ক্ষমতা আমাদের হাতে দিয়াছে তাহা বড়ই নিদারুণ; এই ক্ষমতার মারাত্মক অপব্যবহার সম্ভবপর। ভ্রান্ত লোকে ইহা প্রয়োগ করিয়া পশুরাজ্য অপেক্ষাও নিষ্ঠুর নির্দয় মানব-সমাজ গড়িয়া তুলিতে পারে। শিশুদিগকে ধর্ম, স্বদেশপ্রীতি এবং সাহস কিংবা কম্যুনিজম, শ্রমিকতন্ত্রবাদ এবং বিপ্লববাদ শিক্ষা দেওয়ার অজুহাতে সংকীর্ণ-মনা, যুদ্ধপ্রিয় এবং হৃদয়হীন পশুরূপে গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। শিশুদের প্রতি ভালবাসা দ্বারা তাহাদের শিক্ষাদান অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত; শিশুদের অন্তরে প্রীতিবোধ জাগানো ইহার উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে বিজ্ঞানের উন্নতি শিশুদের অপকার করার ক্ষমতাই ক্রমে বাড়াইয়া দিবে।

শিশুর প্রতি ভালবাসা কার্যকরী শক্তি হিসাবে মানবসমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে; শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস এবং শিশুর শিক্ষা-প্রণালীর উন্নতিই ইহার প্রমাণ। এই শিশু-প্রীতি এখন পর্যন্ত অত্যন্ত দুর্বল বলিয়াই আমাদের রাজ-নীতিকগণ অত্যাচার ও রক্তপাতের পথে নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অগণিত শিশুর জীবন বলি দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তথাপি শিশুর প্রতি মানষের প্রীতি আছে এবং ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। যে সকল ব্যক্তি শিশু-দিগের প্রতি স্নেহশীল তাঁহারাই আবার এমন ভাব মনে পোষণ করেন যাহার ফলে শিশুরা পরবর্তীকালে যুদ্ধবিগ্রহে মৃত্যুবরণ করিতে অনুপ্রাণিত এবং বাধ্য হয়, যুদ্ধকে বলা যায় বহু লোকের সম্মিলিত পাগলামি। শিশুদের প্রতি ভালবাসা ক্রমে বয়স্ক ব্যক্তির জীবন পর্যন্ত প্রসারিত হোক—ইহা কি আশা করা চলে না? শিশুদিগকে যাঁহারা ভালবাসেন তাঁহারা তাঁহাদের অপত্যস্নেহ ও অনুরাগ কি শিশুদের পরবর্তী বয়স্ক জীবনেও বিস্তৃত করিতে পারেন না? শিশুদিগকে সবল দেহ ও বলিষ্ঠ মনে ভূষিত করিয়া তুলিয়া আমরা কি তাহাদিগকে তাহাদের শক্তি ও উদ্যমকে নূতন উন্নততর জগৎ গড়িয়া তোলার কাজে নিয়োগ করিতে দিব, না তাহারা একাজে প্রবৃত্ত হইলে আমরা ভয়ে পিছাইয়া গিয়া তাহাদিগকে পুনরায় দাসত্ব ও গতানুগতিক অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করিব? শিশুদের মঙ্গল করা এবং অমঙ্গল করা দুই ব্যাপারেই বিজ্ঞান আমাদের প্রধান সহায়। কোন পথ আমরা অবলম্বন করিব তাহা নির্ভর করে আমরা শিশুদিগকে ভালবাসি না ঘৃণা করি তাহার উপর। কিন্তু দেখা যায় নৈতিক আদর্শের ধ্বজাধারিগণ শিশুদের প্রতি ঘৃণাকেই নানা আপাত-শোভন নামের আবরণে ঢাকিয়া অনুরাগের সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং কাম্য আদর্শ বলিয়া প্রচার করেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

সাধারণ নীতি

আমরা এ পর্যন্ত শিশুর চরিত্রগঠনের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এ শিক্ষা প্রধানতঃ বাল্যের শিক্ষা। ঠিকমত পরিচালিত হইলে শিশুর ছয় বৎসর বয়সের মধ্যেই ইহা সম্পূর্ণ হইবে। আমি একথা বলি না যে, ছয় বৎসর বয়সের পর বালকের চারিত্রিক গঠন আর পরিবর্তিত হইতে পারে না; এমন কোন বয়স নাই যখন প্রতিকূল ঘটনা বা পরিবেশ ক্ষতি করিতে না পারে। আমার বক্তব্য এই যে, বাল্যে উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে ছয় বৎসর বয়সের মধ্যে বালক বা বালিকার এমন বাসনা ও অভ্যাস গঠিত হয় যে, তাহা ঠিক পথেই চালিত হয়, কেবল পরিবেশের প্রতি অভিভাবকের কিছুটা দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ছয় বৎসর পর্যন্ত উপযুক্ত বাল্যশিক্ষাপ্রাপ্ত বালক-বালিকা যে বিদ্যালয়ে পড়ে সেখানকার কর্তৃপক্ষ যদি অবিবেচক না হন তবে সেখানে নৈতিক উপদেশ-দানের বিশেষ কোন প্রয়োজন হইবে না, কেন না ছাত্রদের নিকট হইতে আর যে সব গুণের বিকাশ আশা করা হইবে তাহা বুদ্ধিমূলক শিক্ষার ফলস্বরূপ আপনা হইতে বিকশিত হইবে। ইহাই যে একমাত্র নীতি এবং ইহার কোন ব্যতিক্রম নাই একথা আমি বলিতেছি না; নৈতিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই স্কুলের কর্তৃপক্ষকে শুধু এই কথাটিই মনে রাখিতে হইবে। এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই যে, ছয় বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশু চরিত্রগঠনের শিক্ষা পাইলে স্কুল কর্তৃপক্ষের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত কেবল বুদ্ধিমূলক শিক্ষার সুব্যবস্থা করা; কারণ ইহার মাধ্যমেই শিশুর চরিত্রের অন্যান্য বাঞ্ছিত গুণগুলি পরিপূর্ণতা লাভ করিবে।

অবাঞ্ছনীয় বিষয়ের প্রতি কৌতূহল :

শিক্ষাদান যদি নৈতিক বিবেচনা দ্বারা প্রভাবিত হয় তবে তাহা বুদ্ধির পক্ষে এবং শেষ পর্যন্ত চারিত্রের পক্ষে হানিকর হইয়া দাঁড়ায়। ইহা মনে করা উচিত নয় যে, কতক জ্ঞান ক্ষতিকর এবং কতক বিষয়ে অজ্ঞতা ভাল। শিক্ষার জন্যই শিক্ষাদান করা উচিত, কোন নৈতিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রমাণ করার জন্য নয়। ছাত্রের তরফ হইতে বিবেচনা করিলে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—তাহার কৌতূহল নিবৃত্ত করা এবং এমন দক্ষতা আয়ত্ত করানো যাহার

ফলে সে নিজেই নিজের কৌতূহল মিটাইতে সক্ষম হয়। শিক্ষকের তরফ হইতেও কতক ফলদায়ক কৌতূহল জাগ্রত করা উচিত। স্কুলের শিক্ষা-বিষয়ের বহির্ভূত কোন কিছুর প্রতি ছাত্রের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইলেও তাহাকে নিরুৎসাহ করা উচিত নয়। এ কৌতূহল পরিতৃপ্ত করার জন্য স্কুলের পাঠ্যবিষয়ে কোনরূপ ব্যতিক্রম বা বিঘ্ন সৃষ্টি করার প্রয়োজন নাই, তাহাকে বরং প্রশংসনীয় কৌতূহলের জন্য উৎসাহিত করিয়া স্কুলের সময়ের পরে, অন্য উপায়ে—যেমন পাঠাগার হইতে বই লইয়া, কিভাবে সে তাহার কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারিবে সে সম্বন্ধে উপদেশ ও নির্দেশদান করা উচিত। এই বিষয়ে যেরূপ তর্ক উঠিতে পারে আগেই তাহার আলোচনা করা যাক। ছাত্রের কৌতূহলকে উৎসাহিত করিতে হইবে বলা হইয়াছে কিন্তু এ কৌতূহল যদি বিকৃত হয় তবে কি করা হইবে? বালক যদি অশ্লীলতা অথবা নিষ্ঠুরতার প্রতি কৌতূহলী হয় তবে কি করা হইবে? অন্যে কি করে কেবল তাহা জানিতেই যদি তাহার কৌতূহল হয় তবে কি করা হইবে? এরূপ কৌতূহলেও কি তাহাকে উৎসাহ দিতে হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাদিগকে একটি পার্থক্যের কথা মনে রাখিতে হইবে। কখনই আমাদের এরূপ আচরণ করা উচিত নয় যাহাতে বালকের কৌতূহল কেবল একই বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু অবাঞ্ছনীয় বিষয়ের প্রতি কৌতূহলের উদ্রেক হইয়াছে বলিয়াই বালককে অপরাধী মনে করার কিংবা তাহার নিকট হইতে ঐ সব বিষয়ের জ্ঞান লুকাইয়া রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রায় সকল ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব বিষয় বালকের নিকট হইতে গোপন রাখার ফলেই ইহাদের প্রতি সে আকৃষ্ট হয়; কতক ক্ষেত্রে মানসিক রোগ এজন্য দায়ী এবং এই রোগের চিকিৎসা করানো আবশ্যক। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই বাধা নিষেধ ও নৈতিক ভীতি প্রদর্শন ইহার নিরাময় করার উপযুক্ত উপায় নয়। অশ্লীলতার প্রতি কৌতূহলের উদাহরণটি লওয়া যাক; সাধারণভাবে এটি ব্যাপক আকারে দেখা যায়।

অশ্লীলতার প্রতি কৌতূহল :

যে বালক বা বালিকার কাছে যৌন বিষয়ের জ্ঞান অন্যান্য বিষয়ের মতই অতি সাধারণ, অর্থাৎ কোনরূপ বাধানিষেধ বা গোপনতা অবলম্বনের ফলে ইহার প্রতি যাহার কোন আকর্ষণ সৃষ্টি হয় নাই তাহার নিকট ইহার কোন মোহ বা কৌতূহল থাকিতে পারে না। যে বালক কোন অশ্লীল ছবি সংগ্রহ করে সে ইহা সংগ্রহ করার কৌশলের জন্য এবং ছবির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তাহার অন্য সঙ্গীদের চেয়ে বেশী কিছু জানে ইহা ভাবিয়া গর্ব বোধ করে। তাহাকে যদি

যৌন বিষয় সম্বন্ধে খোলাখুলিভাবে আগেই বলা হইত তবে সে এরূপ ছবিতে বিশেষ কোন কৌতূহল বোধ করিত না। ইহা সত্ত্বেও যদি কোন বালক এরূপ ছবির প্রতি এবং যৌনজীবনের প্রতি কৌতূহল দেখাইতে থাকে তবে আমি বিশেষজ্ঞের দ্বারা তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিব। চিকিৎসার পদ্ধতি হইবে এইরূপ : প্রথমে বালককে তাহার মনের সব চিন্তা ও বাসনা তাহা যতই অশ্রাব্য বা অকথ্য হোক না কেন প্রকাশ করিয়া চলিতে উৎসাহ দিতে হইবে ; এ সম্বন্ধে তাহাকে আরো অনেক বেশী বিষয় জানানো হইবে, এইভাবে তাহাকে যৌনজীবনের বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি জানাইলে ইহার প্রতি তাহার কৌতূহল নিবিয়া আসিবে। সে যখন বুঝিবে যে, এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানিবার নাই এবং যাহা জানা হইয়াছে তাহাও চমকপ্রদ নয় তখন সে এই মানসিক ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভ করিবে। এ বিষয়ে বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, যৌনজ্ঞান দোষের কিছু নয়, কেবল কোন কিছু সম্বন্ধে সর্বদা চিন্তায় তন্ময় হইয়া থাকাই ক্ষতিকর। জোর করিয়া মনকে অন্য কোন বিষয়ে নিবদ্ধ করিলে এইরূপ তন্ময়তার ঝোঁক নিবারণ করা যায় না, মানসিক ব্যাধিও নিরাময় হয় না, ইহার জন্য বরং দরকার সেই বিষয়েই তাহাকে আরো বেশী করিয়া ভাবিবার এবং জানিবার সুযোগ দেওয়া। এই উপায়ে তাহার অস্বাভাবিক এবং অসুস্থ মনের পরিচায়ক বাসনাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা চলে। ইহা করা হইলে তখন সে-কৌতূহল আর অপকারক হয় না বা মনকে কেবল একই দিকে সর্বক্ষণ নিবদ্ধ করিয়া রাখে না। আমার বিশ্বাস, ইহাই কোন সংকীর্ণ এবং অস্বাভাবিক কৌতূহল দমন করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। নিষেধ করিয়া বা নৈতিক শাস্তির ভয় দেখাইয়া ইহা নিবৃত্ত করিতে গেলে বিপরীত ফলের সম্ভাবনাই বেশী।

চরিত্রের উন্নতিসাধন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য নয়, তবু মানব-চরিত্রের কতক-গুলি বাঞ্ছিত গুণ আছে, জ্ঞান অর্জনের জন্য যেগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহাদিগকে বুদ্ধিমূলক গুণ বলা যাইতে পারে। বুদ্ধিমূলক শিক্ষার ফল-স্বরূপ ইহাদের বিকাশ সাধিত হওয়া উচিত ; গুণ হিসাবে পৃথকভাবে ইহা-দিগকে আয়ত্ত করার প্রশ্ন উঠে না, জ্ঞান অর্জনের সাধনায় স্বাভাবিকভাবেই এগুলি আয়ত্ত হওয়া প্রয়োজন। এইরূপ গুণগুলির মধ্যে আমার কাছে প্রধান মনে হয় : কৌতূহল, মুক্ত মনোভাব, জ্ঞান অর্জন কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয় এই ধারণা, ধৈর্য, অধ্যবসায়, একাগ্রতা এবং সঠিকতা (exatness)। ইহাদের মধ্যে কৌতূহলই মূল, যেখানে কৌতূহল খুব প্রবল এবং ঠিক পথে পরিচালিত সেখানে অন্যগুলি আপনা হইতেই আসিবে। কিন্তু কৌতূহল হয়ত এত সক্রিয়

নয় যে সমগ্র বুদ্ধিমূলক জীবনের ভিত্তিস্বরূপ হইতে পারে। কোন কঠিন কিছু কাজ করিবার বাসনাও থাকা উচিত; যে জ্ঞান অর্জন করা হইবে তাহা শিক্ষার্থীর নিকট কৌশল বলিয়া বোধ হইবে, যেমন কৌশল আয়ত্ত হয় খেলায় বা দৈহিক ক্রীড়া প্রদর্শনে। প্রথম দিকে স্কুলের কৃত্রিম কাজ আয়ত্ত করার ভিতর দিয়াই কৌশল অর্জন করিতে হইবে, ইহার ব্যতিক্রম করা কঠিন, কিন্তু স্কুলের কাজের বাহিরের কোন কাজে কৌশল আয়ত্ত করার বাসনা ছাত্রের মনে জাগাইতে পারিলে প্রকৃত উপকার করা হইবে। শিক্ষাকে জীবনের সহিত সম্পর্কশূন্য করা শোচনীয় ব্যাপার; কিন্তু স্কুল-জীবনে ইহা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা যায় না। যেখানে পরিহার করা একান্তই অসম্ভব সেখানে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন যে জ্ঞান আয়ত্ত করার প্রশ্ন উঠে, ব্যাপক অর্থে তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার; ছাত্র যেন বুঝিতে পারে তাহার বর্তমান জীবনের সঙ্গে সেরূপ জ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সংযোগ না থাকিলেও তাহারও প্রয়োজনীয়তা আছে এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাহা কাজে লাগিতে পারে। ইহা ছাড়াও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ কৌতূহলের জন্য আমি অনেকটা স্থান দিব, ইহা ব্যতীত অনেক মূল্যবান জ্ঞান কখনই মানুষের আয়ত্ত হইত না—উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—বিশুদ্ধ গণিতের কথা (Pure Mathematics)। এমন অনেক শিক্ষণীয় বিষয় যাহা অন্য কোন প্রয়োজনে না লাগিলেও কেবল জ্ঞানের জন্যই আমার কাছে মূল্যবান মনে হয়। যে-কোন রকম জ্ঞান অর্জন করিতে হইলেই ছাত্রগণ তাহা হইতে কিছু লাভের আশা করুক অথবা কোন উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হউক ইহা আমি চাই না। উদ্দেশ্য বা লাভ নিরপেক্ষ কৌতূহল শিশুদের পক্ষে স্বাভাবিক, ইহা একটি মূল্যবান গুণ। যেখানে এইরূপ কৌতূহল উদ্দীপ্ত করা যায় না সেখানেই কেবল দক্ষতা অর্জনের বাসনা জাগাইবার চেষ্টা করিব যে দক্ষতা কাজে প্রকাশ করা যায়। শিক্ষার্থীর জীবনে প্রত্যেকটি উদ্দেশ্যেরই প্রয়োজনীয়তা আছে—জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বিষয়ের প্রতি কৌতূহলের যেমন আবশ্যকতা আছে উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ কৌতূহলেরও তেমনি মূল্য আছে। ইহাদের একটির প্রতি বেশী জোর দিতে গিয়া অন্যটিকে উপেক্ষা করা উচিত হইবে না।

শিক্ষার্থীর জ্ঞানলাভের বাসনা যদি অকৃত্রিম হয় তবে তাহার মনও থাকে উন্মুক্ত। 'যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহা সবই জানিয়াছি' এই বিশ্বাসের সঙ্গে যখন আরো অন্য কামনা একত্রে তালগোল পাকাইয়া যায় তখনই আমাদের খোলা মন আর থাকে না, কোন নির্দিষ্ট অভিমত আমাদের মনে স্পষ্ট হইয়া উঠে। এইজন্য বাল্যে এবং প্রথম যৌবনে আমাদের মন যতখানি উন্মুক্ত এবং

অন্যের নিকট হইতে ভাব গ্রহণের জন্য বা বিচার করিয়া দেখিবার জন্য প্রস্তুত থাকে শেষ বয়সে ততখানি থাকে না। কোন বিষয় সম্বন্ধে বয়স্ক ব্যক্তিরা যে অভিমত পোষণ করেন তাহার সহিত তাঁহাদের কার্যকলাপ ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। ধর্মযাজক ধর্মের অনুশাসন সম্বন্ধে অথবা সৈনিক যুদ্ধ সম্পর্কে উদাসীন হইতে পারেন না। আইনজীবী বলিবেন অপরাধীর শাস্তি হওয়া উচিত, তবে আসামীপক্ষে নিযুক্ত হইলে তিনি তাহার শাস্তি না দেওয়ার পক্ষেই যুক্তি প্রদর্শন করিবেন। স্কুল শিক্ষক যেরূপ শিক্ষাব্যবস্থার জন্য ট্রেনিং লইয়াছেন এবং যাহার ভিতর কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন তাহাই সমর্থন করিবেন। যে রাজনৈতিক দলে থাকিলে উচ্চপদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা রাজনীতিক সে-দলের মতবাদ না মানিয়া পারেন না। উপজীবিকা হিসাবে একজন যখন কোন কাজ নির্বাচন করিয়া লয় তখন ইহা আশা করা যায় না যে, সে সর্বদা এই চিন্তা করিবে যে অন্য কোন পেশা গ্রহণ করিলেই ভাল হইত। অতএব দেখা যায়, পরবর্তী জীবনে খোলা মনে কোন বিষয়ে অভিমত প্রকাশ বা পোষণ করায় নানা প্রতিবন্ধক আছে কিন্তু শিশু ও কিশোরের জীবনে উইলিয়াম জেমসের কথায় 'জোর করিয়া চাপানো' মত গ্রহণ করার অবস্থা বেশী ঘটে না, এজন্যই সহজে কোন কিছু বিশ্বাস করার প্রবণতাও কম থাকে। বয়স্ক ব্যক্তিরা কর্মজীবনে শিশুদের মত খোলা মন রাখিতে পারে না। ইহা স্বাভাবিক, কেন না চিন্তা অভিজ্ঞতা ও পারিপার্শ্বিক ঘটনা এবং অবস্থার চাপে তাহাদিগকে কোন বিষয় সম্বন্ধে অভিমত গ্রহণ করিতে হয়। তাহাদিগকে অনেক সময় নিজেদের বিবেকের নির্দেশসম্মত না হইলেও স্বার্থের যাহা অনুকূল এমনভাবেই মতামত গড়িয়া তুলিতে হয়। তরুণদিগকে উৎসাহ দেওয়া উচিত যাহাতে তাহারা প্রত্যেকটি প্রশ্ন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া নিজেদের বিচার বুদ্ধিমত অভিমত প্রদান করিতে পারে। এই চিন্তার স্বাধীনতার অর্থ এ নয় যে, স্বেচ্ছামত যে-কোনরূপ আচরণ করার অধিকারও তাহাদের থাকিবে। কোন লোকের সমুদ্রে বীরত্ব প্রদর্শনের কাহিনী শুনিয়াই যে বালকগণ সমুদ্রে ঝাঁপাইতে যাইবে তাহাদিগকে এতখানি স্বেচ্ছাচারী হইতে দেওয়া ঠিক হইবে না। তবে তাহাদের ছাত্রাবস্থায় তাহারা যদি এরূপ রোমাঞ্চকর অভিযানের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং মনে করে যে অধ্যাপক হওয়ার চেয়ে জলদস্যু হওয়া বেশী বাঞ্ছনীয় তবে তাহাকে এরূপ চিন্তার স্বাধীনতা দিতে কোনরূপ আপত্তি করা উচিত নয়।

একাগ্রতা :

মনোবিকাশের ক্ষমতা বা একাগ্রতা একটি অতি মূল্যবান মানসিক গুণ কিন্তু শিক্ষাব্যতীত ইহা অর্জন করা যায় না। ইহা অবশ্য সত্য যে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে একাগ্রতা স্বভাবতই বাড়িতে থাকে, শিশুরা কোন বিষয়েই কয়েক মিনিটের বেশী মনোনিবেশ করিতে পারে না কিন্তু বয়স যত বাড়িতে থাকে তাহাদের চঞ্চলমতিত্বও তত কমিতে থাকে। তথাপি বহুদিনব্যাপী বুদ্ধিগত শিক্ষা ব্যতীত তাহারা যথোপযুক্ত পরিমাণে মানসিক একাগ্রতা অর্জন করিতে পারে না। পূর্ণাঙ্গ একাগ্রতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে : ইহা হইবে তীব্র, দীর্ঘদিন স্থায়ী এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। একাগ্রতা কতখানি নিবিড় এবং গভীর হইতে পারে আর্কিমিডিসের কাহিনীই তাহার প্রমাণ. একটি অঙ্কের সমস্যায় তিনি এমন তন্ময় হইয়াছিলেন যে, রোমান সৈন্যগণ কখন সায়রাকিউজ দখল করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল তিনি তাহা কিছুই জানিতে পারেন নাই। কোন কঠিন কাজ সম্পন্ন করিতে এবং এমন জটিল ও সূক্ষ্ম সমস্যার সমাধান বাহির করিতে একই কাজে গভীর একাগ্রতার প্রয়োজন। কোন বিষয়ের প্রতি অনুরাগ থাকিলে স্বাভাবিকভাবেই এরূপ তন্ময়তা আসে। অনেকেই কোন যান্ত্রিক হেঁয়ালি বা ধাঁধাঁর মধ্যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত মনোনিবেশ করিতে পারে কিন্তু ইহার বিশেষ মূল্য নাই। একাগ্রতা যখন ইচ্ছা দ্বারা চালিত হইবে তখনই বলা যায় যথার্থ মূল্যবান। ইহা বলার উদ্দেশ্য এই যে, কতক জ্ঞানের বিষয় স্বভাবতই নীরস, তবু ইচ্ছাশক্তির বলে লোকে তাহাতেও নিরবচ্ছিন্নভাবে মনোনিবেশ করিতে পারে। আমার মনে হয় উক্ত শিক্ষার ফলেই লোকে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করিয়া এরূপ একাগ্রতা লাভ করিতে পারে। এই একটি ব্যাপারে প্রাচীন প্রণালীর শিক্ষা প্রশংসনীয়; স্বেচ্ছায় কোন নীরস কাজে আগ্রহের সঙ্গে মনোনিবেশ করাইতে বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী প্রাচীনের মত এতখানি সফলতা লাভ করে কিনা সন্দেহ। যাই হোক বর্তমান শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে এই দোষ বিদ্যমান থাকিলেও তাহা অসংশোধনীয় নহে। প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী শিক্ষার্থীর মনঃপ্রবৃত্তির উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করিত না। কোন শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থীর নিকট সরস কি নীরস মনে হইবে তাহার বিচার না করিয়া তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইত। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক ছাত্রকে তাহা শিক্ষা করিতেই হইত। ইহার ফলে অনেক নীরস বিষয়বস্তুর প্রতিও নিবিষ্টভাবে মনোনিবেশ করিতে হইত। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হইবে।

ধৈর্য ও অধ্যবসায় সুশিক্ষার ফলস্বরূপ বিকশিত হয়। পূর্বে মনে করা হইত যে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বাহিরের কর্তৃপক্ষের শাসনের ফলে যে সদভ্যাস গঠিত হয় কেবল তাহা দ্বারাই এ গুণগুলি অর্জন করা সম্ভব। কঠোর শাসনের ভিতর দিয়া প্রথমে ঘোড়াকে বাগ মানাইতে হয়; ইহা দেখিয়া মনে হয় এরূপ শাসনে সংযত করার ও সদভ্যাস গঠন করানোর প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু ইহার জন্য জোরজবরদস্তি না করিয়া ছাত্রকে প্রথমে সহজ একটি কাজে সাফল্যলাভ করিতে দিয়া তাহাকে ক্রমে কঠিনতর বিষয়ে কৃতকার্যতা অর্জনের উচ্চাকাঙ্খায় উৎসাহিত করা যায়। ধৈর্য ও নিষ্ঠার ফলে সাফল্য অর্জিত হইলে তাহা ছাত্রকে পুরস্কার লাভের আনন্দময় অভিজ্ঞতা দান করে; পরে ক্রমে ধৈর্য ও চেষ্টার পরিমাণ বৃদ্ধি করা চলে। জ্ঞান অর্জন কঠিন হইলেও অসম্ভব নয়—এই বিশ্বাসও ঠিক অনুরূপভাবে শিক্ষার্থীদের মনে সঞ্চার করা যায়: এজন্য তাহার দ্বারা প্রথমে সহজ হইতে শুরু করিয়া ক্রমে কঠিন সমস্যা সমাধান করাইয়া তাহার আত্মবিশ্বাস জন্মাইয়া লইতে হয়।

ইচ্ছামত যে-কোন নীরস বিষয়েও মনোনিবেশের শক্তির মতই নির্ভুলতার প্রতিও শিক্ষা-সংস্কারকগণ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না। ডক্টর ব্যালার্ডের মতে বিলাতের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি অনেক বিষয়ে পূর্বের চেয়ে যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে কিন্তু ছাত্রদের লিখিত উত্তরের নির্ভুলতা আগের চেয়ে অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে। তিনি বলেন:

> ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই শতকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে বার্ষিক পরীক্ষায় যে প্রশ্ন দেওয়া হইত তাহার উত্তর বিবেচনা করিয়া বিদ্যালয়ের আর্থিক সাহায্য বরাদ্দ করা হইত। এরূপ বহু প্রশ্ন এখনও রক্ষিত আছে। বর্তমানের ছাত্রছাত্রীদিগকে এই একই প্রশ্ন উত্তর করিতে দিলে ফল হয় পূর্বের চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট। ইহার কারণ যাহাই বলি না কেন, এ বিষয়ে যে অবনতি ঘটিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সমগ্রভাবে ধরিলে—আমাদের বিদ্যালয়ের কাজ অন্ততঃ পক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ, পঁচিশ বৎসর পূর্বে যেমন ছিল এখন তাহার চেয়ে অনেক কম নির্ভুল হয়।'

এই বিষয় ডক্টর ব্যালার্ডের আলোচনা এমন চমৎকার যে, ইহার উপর আমার আর বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তাঁহার উপসংহারে কথা কয়েকটি উদ্ধৃত করি:

> 'যতকিছুই বলা হউক না কেন, নির্ভুলতা বা কোন কাজ সঠিকভাবে করার অভ্যাস এখনো একটি মহৎ এবং প্রেরণাদায়ক আদর্শ বলিয়া

পবিগণিত। ইহাকে বুদ্ধির সততা বলা যায়। আমাদের চিন্তায়, বাক্যে এবং কর্মে আমরা কি পরিমাণ সঠিক তাহা দ্বারাই আমাদের সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।'

আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর সমর্থকগণ মনে করেন শিক্ষা শিশুর নিকট আনন্দপ্রদ করিতে পারাই মস্তবড় লাভ ; কোন বিষয় নিখুঁতভাবে শিক্ষা দিতে গেলে যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিতে হয় তাহার ফলে ছাত্রের মনে অবসাদ আসিতে পারে। এজন্য আধুনিক প্রণালী সমর্থনকারীগণ জ্ঞানের নিখুঁততার উপর বেশী জোর দেন নাই। এখানে ছাত্রের মানসিক অবসাদ কি ধরণের হইতে পারে তাহা একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। শিক্ষক যদি জোর করিয়া কোন কিছু ছাত্রের উপর চাপাইয়া দেন এবং তাহার ফলে যদি সে অবসাদ বোধ করে তবে তাহা নিশ্চয়ই অপকারী, কিন্তু নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য ছাত্র স্বেচ্ছায় যে কঠোর পরিশ্রমের কাজে আত্মনিয়োগ করে তাহা মাত্রা অতিক্রম করিয়া না গেলে সত্যই বিশেষ মূল্যবান। যে সকল বাসনা পূরণ করা রীতিমত কষ্টসাধ্য তাহা সাধন করিতে ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করা শিক্ষার অঙ্গ হওয়া উচিত, যেমন বীজগণিতের জটিল অঙ্ক কষা, হোমারের কাব্য পাঠ করা, ভাল বেহালা বাজানো এই রকম নানা ধরণের কাজে ছাত্রদিগকে দেওয়া চলে। ইহার প্রত্যেকটি কাজে উৎকর্ষ অর্জন করিতে নিখুঁতভাবে তাহা জানা দরকার। যোগ্য বালকবালিকা উৎসাহিত হইলে এইরূপ কাজে নিপুণতা অর্জনের জন্য অপরিসীম ধৈর্য ও সহনশীলতা দেখাইতে পারে। কাজে দক্ষতা অর্জনের যোগ্য স্বাভাবিক ক্ষমতা না থাকিলেও কতক ছাত্র শিক্ষকের নিকট হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া উৎসাহের সঙ্গে কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারে। শিক্ষাব্যাপারে শিক্ষার্থীর নিষ্ঠা, অনুরাগ এবং শিখার বাসনাই প্রধান শক্তি যোগায়, শিক্ষকের কর্তৃত্ব অনিচ্ছুক ছাত্রকে জোর করিয়া শিক্ষাগ্রহণে বাধ্য করিতে পারে না ; পিপাসা না থাকিলে যেমন ঘোড়াকে জল খাওয়ানো যায় না তেমনি। কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই যে, প্রত্যেক স্তরেই শিক্ষা হইবে কোমল, সহজ এবং সুখদায়ক। কোন বিষয়ে সঠিকতা অর্জনের প্রশ্নে একথা বলা চলে। নিখুঁতভাবে কিছু শিক্ষা করিতে গেলে যথেষ্ট পরিশ্রম ও ধৈর্য দরকার কিন্তু ইহা ছাড়া জ্ঞানে বা বিদ্যায় উৎকর্ষ লাভ করা সম্ভবপর নয়। শিশুদিগকে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া যায়। আধুনিক প্রণালী এই বিষয়ে অনেকটা অকৃতকার্য হইয়াছে। কারণ প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর কঠোরতার বিরুদ্ধে যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অতিরিক্ত শিথিলতা দেখা দিয়াছে, ইহার স্থানে নূতন শাসন বিধান গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং এই

শৃঙ্খলা বাহিরের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চাপানো শাসন হইবে না, মনোবিজ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া শিক্ষার্থীর মনের দিক হইতে ইহা গড়িয়া তুলিতে হইবে। প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীতে বাহিরের কর্তৃপক্ষ শাসন ও শৃঙ্খলা আরোপ করিয়া শিক্ষার্থীকে সংযত রাখিতেন, কাজে নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য করিতেন। তাহাতে শিক্ষার্থীর মনের স্বাভাবিক স্ফূর্তি থাকিত না; আধুনিক প্রণালীর শিক্ষার্থীর উপর এরূপ জবরদস্তি করার পক্ষপাতী নয় কিন্তু 'শৃঙ্খলা ব্যতীত শিক্ষা কখনই সম্ভব হইতে পারেনা; এ শৃঙ্খলাবোধ শিশুর মনে জাগ্রত করিতে হইবে এবং আচরণে ইহার প্রকাশ দেখা যাইবে। কাজে নিখুঁততা অর্জন হইবে এইরূপ নূতন শৃঙ্খলার পরিচায়ক।

অনেক প্রকার নিখুঁততা আছে, ইহাদের প্রত্যেকটিই প্রয়োজনীয়। প্রধান কয়েকটি হইল -মাংসপেশী সঞ্চালনে নিপুণতা, সৌন্দর্য ও রস সৃষ্টিতে সূক্ষ্ম নিপুণতা, কোন বিষয় সম্পর্কে যথার্থতা, যুক্তিতর্কে নিখুঁততা। প্রত্যেক বালকবালিকাই চলা-ফেরা করিতে মাংসপেশীর শোভনভাবে সঞ্চালনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারে, দেহের ভারসাম্য ও সুষ্ঠু গতিভঙ্গীর জন্য ইহা আবশ্যক। স্বাস্থ্যবান শিশু দেহের এই স্বচ্ছন্দ গতির জন্য নিজের অজ্ঞাতে প্রস্তুত হইতে থাকে। বিভিন্ন ভঙ্গীতে দৌড়ানো, লাফানো, মই বাহিয়া উপরে উঠা-নামা প্রভৃতির ভিতর দিয়া সে দেহ সঞ্চালনের কৌশল আয়ত্ত করে; এই ভাবে সে পরবর্তীকালের খেলাধূলার জন্য প্রস্তুত হয়। খেলা-ধূলা সংক্রান্ত দৈহিক উৎকর্ষ এবং মাংসপেশীর সুষ্ঠু সঞ্চালন ছাড়াও স্কুল-জীবনে শিক্ষণীয় অন্যপ্রকার নিপুণতা আছে, যেমন স্পষ্ট উচ্চারণ, সুন্দর হস্তাক্ষর, বাদ্যযন্ত্র বাদনে দক্ষতা ইত্যাদি। এই বিষয়গুলি শিশু প্রয়োজনীয় মনে করিবে কিনা তাহা নির্ভর করিবে তাহার পরিবেশের উপর।

সৌন্দর্য বা রসসৃষ্টির নিখুঁততা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝান মুস্কিল; ইহার উদ্দেশ্য আনন্দের অনুভূতি সঞ্চার করা। সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য প্রভৃতিতে খুঁত থাকিলে তাহা যে রসভঙ্গ করে এবং পরিপূর্ণ আনন্দ দান করে না তাহা ছাত্রদিগকে বুঝান সহজ। সেকস্‌পীয়রের [অথবা রবীন্দ্রনাথের] কোন কবিতা মুখস্থ করান; আবৃত্তি করিবার সময় কোথাও ভুল করিলে সে স্থান তাহাকে নিজের কথায় পূরণ করিতে বলুন এবং মূলের সঙ্গে পার্থক্য দেখাইয়া দিন। সে নিজেই বুঝিতে পারিবে মূল রচনার সহিত তুলনায় তাহার নিজের দেওয়া কথাগুলি কবিতার অঙ্গহানি করিয়াছে। এইভাবে সংগীত ও নৃত্যেও কোথাও ভুল হইলে তাহা অশোভন হয় এবং তাহার ফলে মানুষেরা সূক্ষ্ম রসবোধ তৃপ্তি লাভ করে না। আবৃত্তি, সংগীত এবং নৃত্য ছাত্রদিগকে নিখুঁততা

শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অংকনও শিশুদিগকে নিখুঁত কাজের উৎসাহ দেয় কিন্তু রসোপলব্ধির উপাদান হিসাবে ইহার মূল্য খুব বেশী নয়।

মডেল দেখিয়া অংকনও ছাত্রের নিখুঁতত্তা শিক্ষার উপাদান হিসাবে কাজে লাগানো চলে কিন্তু ইহার মূল্য খুব বেশী নয়; কারণ সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য প্রভৃতি যেমন নিখুঁত হইলে আনন্দ দান করে এবং ছাত্র ইহার মাধ্যমে নূতন সৃষ্টির আনন্দ বোধ করে অংকনের ক্ষেত্রে তেমন নয়; একটি নির্দিষ্ট বস্তু দেখিয়া ঠিক অনুরূপ করিয়া আঁকায় নূতন সৃষ্টির আনন্দ নাই। এই হিসাবে সংগীত, নৃত্য আবৃত্তি অংকনের চেয়ে ছাত্রকে নিখুঁতত্তা অর্জনে বেশী আনন্দ দেয়। ইহা সত্য যে, কোন মডেল দেখিয়া আঁকিতে গেলে মামুলি এবং বাধাধরা উপায়ই গ্রহণ করিতে হয়, নূতন সৃষ্টির আনন্দ তাহার মধ্যে নাই কিন্তু মডেলটি প্রথম যখন সৃষ্ট হয় তখন উহার মূলে ছিল সৌন্দর্য সৃষ্টির উন্মাদনা। মডেল ভাল বলিয়াই ইহার নকল আঁকা হয়, যে কোন জিনিসের নকল করাই যে ভাল তাহা নয়।

ইতিহাসের সন তারিখ এবং ভূগোলে উল্লিখিত স্থানের নাম প্রভৃতি যথা যথ মনে রাখা অত্যন্ত বিরক্তিকর ব্যাপার। ইংলণ্ডের রাজাদের রাজত্বের তারিখ এবং প্রধান জেলাগুলির নাম মুখস্থ করা বিলাতের ছেলেমেয়েদের কাছে এক ভয়াবহ বিষয় ছিল। আমি অন্তরীপগুলির নাম মনে রাখিতে পারিতাম না কিন্তু আট বছর বয়সে আমি ভূ-গর্ভস্থ রেল লাইনের প্রায় সবগুলি স্টেশনের নাম বলিতে পারিতাম। ছেলেমেয়েদিগকে যদি সিনেমার ছবিতে দেশের উপকূল দিয়া জাহাজ চালানো ছবি দেখানো যায় তবে তাহারা শীঘ্রই অন্তরীপগুলি চিনিয়া ফেলিবে। এগুলি শেখা যে একান্তই কর্তব্য তাহা আমি বলি না; আমি বলিতে চাই যে, ইহা শিখানোর প্রকৃষ্ট পন্থা হইল চলচ্চিত্রে ইহা দেখানো। সিনেমার মারফৎ সমগ্র ভূগোল শিক্ষা দেওয়া উচিত; ইতিহাসও প্রথমে এই ভাবে শিখানো উচিত। ইহার জন্য প্রাথমিক খরচ পড়িবে খুব বেশী কিন্তু গভর্নমেন্টের পক্ষে ইহা খুব বেশী নয়। ইহার ফলে এ বিষয়গুলি শিখানো সহজ হইয়া আসিবে।

যুক্তিতর্কের নিখুঁতত্তা এবং বিচারবুদ্ধি কিঞ্চিৎ বেশী বয়সে অধিগত হয়; শিশুদের নিকট হইতে ইহা আশা করা উচিত হইবে না। নামতার ছক মুখস্থ করিয়া গুণফল মুখে মুখে বলায় নিখুঁতত্তা আছে বটে কিন্তু প্রথমে শিশু ইহা না বুঝিয়াই মুখস্থ করে পরে সে ইহার ভিতরকার যুক্তি বুঝিতে পারে। যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির উন্মেষের জন্য অঙ্কশাস্ত্রই স্বাভাবিক পন্থা কিন্তু ইহা যদি

কতকগুলি নীরস এবং পূর্বনির্দিষ্ট কানুন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় অর্থাৎ ইহার মধ্যে যে যুক্তির প্রয়োগ রহিয়াছে তাহা লক্ষ্য করা না হয় তবে এ শিক্ষা ব্যর্থ। নিয়মকানুনগুলি অবশ্যই শিখিতে হইবে কিন্তু এক সময়ে শিশুর কাছে ইহার মূলে যে যুক্তি রহিয়াছে তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে, নতুবা অঙ্কের কোন শিক্ষা-মূল্য নাই।

এখানে একটি প্রশ্ন আলোচনা করা যাক: শিক্ষাদান সকল অবস্থাতে আনন্দপ্রদ করা সম্ভব কিনা কিংবা বাঞ্ছনীয় কিনা। পূর্বে ধারণা ছিল ইহার বেশীর ভাগই নীরস, কেবল কর্তৃপক্ষের কঠোর শাসনে শিশু ইহা গ্রহণ করিত। (বেশীরভাগ মেয়েই অজ্ঞ থাকিত) আধুনিক শিক্ষাবিদগণের অভিমত এই যে, শিক্ষা আগাগোড়া আনন্দদায়ক করা চলে। আধুনিকদের অভিমতের প্রতিই আমার সহানুভূতি বেশী, তথাপি আমার মনে হয়, শিক্ষার সকল স্তরেই বিশেষ করিয়া উচ্চশিক্ষায় ইহা সর্বদা সম্ভবপর হয় না।

শিশু মনোবিজ্ঞানের আধুনিক লেখকগণ সকলেই এই কথাটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন যে, খাওয়া বা ঘুমানোর জন্য শিশুকে পীড়াপীড়ি করা অনুচিত: শিশু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই ইহা করিবে, এজন্য তোষামোদ বা জোর করার কোন প্রয়োজন নাই। আমার নিজের অভিজ্ঞতা এই অভিমতের সত্যতা প্রমাণ করিয়াছে। প্রথমে আমরা শিশু-শিক্ষার এই নূতন প্রণালী জানিতাম না বলিয়া প্রাচীন পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলাম। এই প্রণালী সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল কিন্তু নূতন প্রণালীতে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করি। কেহ যেন ইহা মনে না করেন যে, আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী প্রয়োগ করিতে গিয়া আধুনিক পিতামাতা সন্তানের খাওয়া বা ঘুমানোর জন্য কিছুই করেন না; পক্ষান্তরে শিশুর সদভ্যাস গঠনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়া থাকে। নিয়মিত খাবার সময়ে খাদ্য আসে, শিশু ভোজন করুক বা না করুক খেলাধূলা বাদ দিয়া তখন তাহাকে অন্যের সঙ্গে একত্র বসিতেই হইবে। নিয়মিত সময়ে তাহাকে ঘুমাইতে যাইতে হইবে। বিছানার মধ্যে সে কোন খেলনা প্রাণী আদর করিবার জন্য কাছে রাখিতে পারে কিন্তু এমন কোন খেলনা রাখা চলিবে না যাহা টিপিলে শব্দ করে, স্প্রীং কষিয়া দিলে যাহা ছুটাছুটি করে কিংবা অন্য কোন প্রকারে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। শিশুকে বরং বলা যায়—'পোষা প্রাণীটি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাকে ঘুম পাড়াও। তারপর তাহাকে একা থাকিতে দিন, শীঘ্রই সে ঘুমাইয়া পড়িবে। কিন্তু শিশুকে কখনই বুঝিতে দিবেন না যে, তাহার খাওয়া বা ঘুমানোর জন্য আপনি উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন; ইহা বুঝিতে পারিলে সে মনে করিবে আপনি তাহার নিকট একটু অনুগ্রহ চাহিতেছেন;

নিজের শক্তি সম্বন্ধে সে সচেতন হইয়া উঠিবে এবং ক্রমেই বেশী বেশী আদর আপ্যায়ন বা শাস্তি দাবী করিতে থাকবে। সে যেন বুঝিতে পারে যে আপনাকে খুশী করিবার জন্য নয়, তাহার নিজের তাগিদেই খাওয়া এবং ঘুমানো প্রয়োজন।

মনোবিজ্ঞানের এই নীতি শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা চলে। আপনি যদি শিশুকে জোর করিয়া শিখাইতে চান, সে মনে করিবে আপনাকে খুশী করিবার জন্য সে কিছু অপ্রীতিকর কাজ করিতে বাধ্য হইতেছে। এই মনোভাবের ফলে তাহার মনে একপ্রকার প্রতিবোধ দানা বাঁধিয়া উঠে। অন্যের তাগিদে কোন কাজ করিতে গেলে তাহাতে তাহার স্বাভাবিক প্রাণের আবেগ থাকে না মনের ভিতর বরং একটি বিরুদ্ধ ভাব জাগিতে থাকে। শিশুর প্রথম জীবনে এইরূপ ভাব সঞ্চারিত হইলে, তাহা বরাবর থাকিবে, পরবর্তীকালে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার বাসনায় সে পড়াশুনায় মন দিবে বটে কিন্তু জ্ঞানলাভের বাসনায় নহে। পক্ষান্তরে আপনি যদি প্রথমে শিশুর জ্ঞানলাভের স্পৃহা জাগাইতে পারেন এবং তাহার প্রতি অনুগ্রহ হিসাবে যে শিক্ষা লাভ করিতে সে উন্মুখ তাহা দান করেন, তবে অবস্থা ভিন্নরূপ ধারণ করিবে। বাহিরের শাসনের বিশেষ প্রয়োজন হইবে না এবং শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করা সহজ হইবে। এই বিষয়ে কৃতকার্য হইতে হইলে কতকগুলি সর্ত আবশ্যক। শ্রীমতী মন্তেসরী ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই অবস্থা সাফল্যের সঙ্গে সৃষ্টি করিয়াছেন। শিশুর জন্য নির্দিষ্ট কাজগুলি সহজ এবং চিত্তাকর্ষক করিতে হইবে। প্রথম অবস্থায় অন্য শিশুদিগকে কাজ করিতে দেখিয়া সে উৎসাহিত হইবে। সে সময় যেন অন্যত্র শিশুর পক্ষে অধিকতর আকর্ষণের কোন বস্তু না থাকে। শিশু কাজে লাগাইতে পারে এমন অনেকগুলি জিনিস থাকিবে; যেটি ইচ্ছা সেটি লইয়া সে কাজ করিতে পারিবে। এইরূপ অবস্থায় প্রায় সকল শিশুই আনন্দে থাকে এবং বাহিরের কোন প্রকার চাপ না থাকিলেও পাঁচ বৎসর বয়সের পূর্বেই পড়িতে ও লিখিতে শেখে।

এই প্রণালী বয়স্ক শিশুদের উপর কতদূর প্রয়োগযোগ্য তাহা তর্কের বিষয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের মনও অন্যান্য বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তখন শিক্ষার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ই যে আনন্দপ্রদ করিতে হইবে এমন কোন আবশ্যকতা নাই। কিন্তু শিক্ষালাভের জন্য শিশুরাই আগ্রহান্বিত হইবে এই মূল নীতি শিশুর যে-কোন বয়স পর্যন্ত চালু রাখা যায়। এমন পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে শিশু নিজেই যেন শিক্ষার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ প্রকাশ করে, শিক্ষাগ্রহণ কাজে ব্যাপৃত না থাকিলে

তাহাকে যেন নিঃসঙ্গ অবস্থায় অবসাদের মধ্যে সময় কাটাইতে হয়। শিক্ষা-লাভ করিতে আনন্দ আছে, পরিশ্রমও আছে কিন্তু ইহার বিকল্প অবস্থায় শিশু যেন আনন্দ না পায়; তাহা হইলে সে নিঃসঙ্গভাবে অবসন্ন হইয়া সময় কাটানোর পরিবর্তে শিক্ষা গ্রহণের কাজই পছন্দ করিবে। কিন্তু কোন শিশু যদি কখনও এই বিকল্প অবস্থাই পছন্দ করে তাহাকে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিতে দিতে হইবে, পরে নিজের ভুল সে নিজেই বুঝিবে। শিশুর ব্যক্তিগতভাবে কাজ করার নীতি সম্প্রসারণ করা চলে যদিও প্রথম কয়েক বৎসর পর সমবেত-ভাবে কাজ করানো অত্যাবশ্যক। কোন বালক বা বালিকাকে যদি শিক্ষাগ্রহণে বাধ্য করার প্রয়োজন হয় অর্থাৎ সে যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইহাতে উৎসুক না হয় তবে তাহার দেহ বা মনের স্বাস্থ্যগত কোন কারণ না থাকিলে, বুঝিতে হইবে যে, শিক্ষকের দোষই ইহার জন্য দায়ী কিংবা শিশুর বাল্যশিক্ষা খারাপ হইয়াছে। পাঁচ বা ছয় বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর শিক্ষানুরাগ উদ্দীপ্ত করিতে পারেন।

ইহা সম্ভব হইলে সুবিধার অন্ত নাই। শিক্ষক তখন ছাত্রের শত্রু নন তিনি তাহার বন্ধু। শিক্ষক তাহার সঙ্গে সহযোগিতা করেন বলিয়া সে দ্রুত শিখিতে থাকে, সে পরিশ্রান্ত হয় কম, কারণ অনিচ্ছুক মনকে জোর করিয়া কোন অপ্রীতিকর কাজে আটকাইয়া রাখার কোন প্রশ্ন এখানে নাই। ছাত্র স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কাজ করার আনন্দ বোধ করে, শিক্ষকের পক্ষ হইতে তাহাকে শিক্ষাগ্রহণে বাধ্য করার প্রয়োজন হয় না। অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রে যদি ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় তবে সেরূপ ছাত্রদিগকে পৃথক করিয়া তাহাদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিতে হয়। তবে আমার মনে হয়, শিশুর বুদ্ধি অনুযায়ী উপযুক্ত শিক্ষাপ্রণালী অনুসরণ করিলে এরূপ ছাত্রের সংখ্যা খুব কমই হইবে।

শিক্ষায় বিশেষ নিপুণতা অর্জন করিতে হইলে শিক্ষার সকল স্তরই আনন্দদায়ক করা সম্ভব হয় না। কোন বিষয় ভাল করিয়া শিখিতে গেলে ইহার কতক অংশ নীরস মনে হইবেই। কিন্তু আমার মনে হয়, এইরূপ নীরস অংশও আয়ত্ত করার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিলে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশে বালক-বালিকা আগ্রহের সঙ্গেই ইহাতে ব্রতী হইবে। নির্দিষ্ট কাজের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ দেখিয়া কাজের প্রশংসা করিয়া বা তাহার দোষ দেখাইয়া দিয়া ছাত্রকে উৎসাহিত করিতে হইবে। এই নীরস অংশের গুরুত্ব শিক্ষক ছাত্রের নিকট সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিবেন। এ প্রণালী ব্যর্থ হইলে ছাত্রকে কমবুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে। তখন তাহাকে অন্যান্য সাধারণ ছাত্রের শ্রেণী হইতে

পৃথক করিয়া পৃথকভাবে শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করিতে হইবে কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে এ ব্যবস্থাকে সে যেন শাস্তি বলিয়া গ্রহণ না করে।

শিশুর চার বৎসর বয়সের পর পিতা বা মাতার পক্ষে তাহার শিক্ষার ভার নিজহাতে রাখা উচিত নয় (অবশ্য খুব কমক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম সমর্থন করা চলে)। শিক্ষাদানের কৌশল বিশেষ শিক্ষাসাপেক্ষ কিন্তু বেশীরভাগ পিতা-মাতাই শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া বা কৌশল সম্বন্ধে কিছু শিখিবার সুযোগ পান না। শিশুর বয়স যত কম থাকে, তাহাকে শিখাইবার কৌশলও তত বেশী দরকার। ইহা ছাড়া শিশু সর্বদা পিতামাতার সঙ্গলাভ করে; কাজেই তাহাদের আচরণ ও অভ্যাস সম্পর্কে তাহার মনে কতকগুলি ধারণা স্পষ্ট হইয়া থাকে কিন্তু মামুলি শিক্ষার কাজ আরম্ভ হইলে শিক্ষার প্রতি সে যেরূপ আচরণ করিত পিতামাতার প্রতি সেরূপ করে না। অধিকন্তু পিতা হয়ত নিজের সন্তানের পাঠোন্নতির জন্য অতিরিক্ত আগ্রহশীল হন। শিশু বুদ্ধির পরিচয় দিলে তাঁহার আনন্দের অবধি থাকে না, আবার বোকামির পরিচয় দিলে ক্রোধে হিতাহিতজ্ঞানহীন হইয়া পড়েন। চিকিৎসক যে কারণে নিজের পরিবারের লোকজনের চিকিৎসা করেন না, পিতামাতার পক্ষেও নিজ সন্তানের শিক্ষার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ না করার অনুরূপ যুক্তি আছে। কিন্তু আমি এ-কথা বলি না যে, তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে যাহা সম্ভব সন্তানকে সেরূপ শিক্ষাও দেওয়া উচিত নয়, আমার বক্তব্য এই যে, অন্যের ছেলেমেয়ের পক্ষে ভাল শিক্ষক হইলেও পিতামাতা সাধারণতঃ নিজেদের সন্তানের বিদ্যালয়ের পাঠ শিখানোর পক্ষে সর্বোত্তম নন।

শিক্ষার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমগ্র শিক্ষাকাল ব্যাপিয়া ছাত্রের মনে এই ধারণা জীয়াইয়া রাখিতে হইবে যে, সে যেন বুদ্ধিমূলক রোমাঞ্চকর অভিযানে প্রবৃত্ত হইয়াছে—ইহার উদ্দেশ্য জানার ভিতর দিয়া অজানাকে জয় করা। এই বিশ্বজগতে বহু জটিল বিষয় আছে, যেগুলি একনিষ্ঠ চেষ্টার দ্বারা বুঝিতে পারা যায়; জটিল এবং কঠিন বিষয় বুঝিতে পারায় মানসিক উল্লাস আছে। প্রত্যেক যোগ্য শিক্ষক ছাত্রকে ইহা উপলব্ধি করাইতে পারেন। মন্তেসরি বিদ্যালয়ের শিশুরা যখন প্রথম দেখে যে, তাহারা লিখিতে শিখিয়াছে তখন তাহাদের যে কিরূপ বিপুল উল্লাস হয় তাহা শ্রীমতী মন্তেসরি বর্ণনা করিয়াছেন। আমি যখন প্রথম মাধ্যাকর্ষণ সংক্রান্ত নিউটন-লিখিত কেপলারের দ্বিতীয় সূত্র (Kepler's Second Law) পাঠ করি তখন আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলাম। এরূপ বিশুদ্ধ এবং প্রয়োজনীয় আনন্দ খুব কমই আছে। নিজের চেষ্টা এবং ব্যক্তিগত উদ্যম ছাত্রকে নূতন আবিষ্কারের আনন্দ দান করে

এবং এইভাবেই তাহার বুদ্ধিগত রোমাঞ্চকর অভিযান সার্থক এবং জয়যুক্ত হয়। যেখানে সব কিছুই কেবল ক্লাসে শিখানো হয়, ছাত্রকে স্বচেষ্টায় কোন-বিষয় অধিগত করিতে উৎসাহিত করা হয় না, সেখানে এই মানসিক আনন্দ বোধের সুযোগও কম। যেখানেই সুযোগ পাওয়া যায় সেখানেই ছাত্রকে এই বুদ্ধির অভিযানে উৎসাহিত করুন; ইহাতে সে নিষ্ক্রিয় না থাকিয়া সক্রিয় হইয়া উঠিবে। ইহাই শিক্ষাকে শিশুর কাছে কষ্টদায়ক না করিয়া আনন্দময় করিবার অন্যতম উপায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

চৌদ্দ বৎসরের পূর্বে বিদ্যালয়ের পাঠক্রম

কি শিক্ষা দেওয়া হইবে ? এবং কেমন করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইবে ? এ প্রশ্ন দুইটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও যোগসূত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, কারণ শিক্ষার জন্য উন্নত-ধরণের প্রণালী অবলম্বন করিলে বেশী শিক্ষা করা সহজসাধ্য। শিক্ষণীয় বিষয় যদি ছাত্রের নিকট নীরস মনে না হয় এবং সে যদি স্বেচ্ছায় শিক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে তবে বেশী পরিমাণ শিখানো সম্ভবপর হয়। শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে পূর্বে মোটামুটি বলা হইয়াছে, পরবর্তী অধ্যায়ে আরো বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইবে। এখন ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে, উন্নত শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে, কি শিক্ষা দেওয়া উচিত তাহাই এই অধ্যায়ে আলোচিত হইতেছে।

বয়স্ক ব্যক্তিদের পক্ষে কি জানা উচিত তাহা বিবেচনা করিলে বোঝা যায় এমন কতক বিষয় আছে যাহা প্রত্যেকের জানা প্রয়োজন এবং কতক অল্পসংখ্যক লোকের ভাল করিয়া শেখা দরকার, সকলের জানা না থাকিলেও চলে। কতক লোককে ভাল করিয়া চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের পক্ষেই শারীরবিদ্যা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মোটামুটি বিষয় ও নিয়ম গুলি জানা থাকলেই যথেষ্ট। কতককে উচ্চ গণিত শিক্ষা করিতে হইবে কিন্তু যাহাদের নিকট ইহা মোটেই প্রীতিপদ নয় তাহার গণিতের সাধারণ মৌলিক বিষয় জানিলেই চলে। কতককে ট্রমবোন (জয়ঢাকের মত বাদ্যযন্ত্র) বাজানো শিখিতে হইবে কিন্তু সকল ছাত্রেরই ইহা অভ্যাস করিবার আবশ্যকতা নাই। চৌদ্দ বৎসর বয়সের পূর্বে প্রধানতঃ এমন জিনিসই শিক্ষা দেওয়া উচিত যাহা সকলেরই শিক্ষা করা প্রয়োজন. অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রের কথা বাদ দিলে, কোন বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা সাধারণতঃ পরবর্তীকালে দিতে হইবে। তবে এই সময়েই অর্থাৎ চৌদ্দবছরের পূর্বেই বালক বা বালিকার কোন বিষয় শেখার দিকে বেশী প্রবণতা আছে তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে যাহাতে পরবর্তী কালে তাহার বিকাশ সাধন সম্ভবপর হয়। এ জন্য প্রথম অবস্থায় প্রত্যেকের পক্ষেই শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা উচিত, কোন বিষয় কাহারো ভাল না লাগিলে পরবর্তীকালে উচ্চশিক্ষার স্তরে তাহার জের টানিবার প্রয়োজন নাই।

প্রত্যেক বয়স্কব্যক্তির কে কোন্ বিষয় শিক্ষা করা উচিত তাহা নির্ধারিত হইলে প্রথমে ঠিক করিতে হইবে কোন্‌টি আগে এবং কোন্‌টি তাহার পর পর শিখাইতে হইবে। এখানে নীতি হইবে, সহজটি আগে শিখাইতে হইবে কঠিন বিষয়গুলি পরে ক্রমে ক্রমে আসিবে। ছাত্রদের বিদ্যালয় জীবনের প্রথমদিকে এই নীতিই শিক্ষাক্ষেত্রে অবলম্বিত হয়।

আমি ধরিয়া লইব যে, শিশুর পাঁচ বৎসর বয়স হইতে হইতেই সে পড়িতে এবং লিখিতে শিখিয়াছে। মন্তেসরি স্কুল কিম্বা ইহার চেয়ে অন্য উন্নত ধরণের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইলে সেখানে শিশুর এই প্রাথমিক শিক্ষার গোড়াপত্তন হইবে। মন্তেসরি স্কুলে বিভিন্ন খেলনা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে শিশুর নানা জিনিসের আকৃতি, আয়তন, পরিমাণ, ওজন প্রভৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা জন্মে; অংকন, সংগীত ও নৃত্যশিক্ষারও সূত্রপাত হয়; অপর শিশুর মধ্যে থাকিয়াও শিক্ষামূলক কোন বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার অভ্যাসও এই সময় গঠিত হয়। অবশ্য পাঁচ বৎসর বয়সে শিশুর এই গুণগুলি পরিপূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হইবে না; পরে আরো কিছুদিন তাহাকে এই সকল বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। আমার মনে হয় শিশুকে সাত বৎসর বয়সের পূর্বে কোনরূপ গুরুতর মানসিক পরিশ্রমের কাজে নিযুক্ত করা উচিত নয় তবে বিশেষ দক্ষতা প্রয়োগ করিলে শিশুর অসুবিধাগুলি অনেক পরিমাণে লাঘব করা যায়। ছেলেবেলায় গণিত একটি ভয়ের বিষয়; মনে পড়ে গুণনের নামতা মনে রাখিতে না পারিয়া বাল্যকালে আমি বহুদিন কাঁদিয়াছি। গুণনের ছক ধীরে ধীরে উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় শিশুকে আয়ত্ত না করাইলে ইহা দুরূহ রহস্য বলিয়া বোধ হয় এবং তাহার মনে গভীর নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে। কিন্তু মন্তেসরি স্কুলে যেমন সরঞ্জামের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে এবং যত্নের সঙ্গে ইহা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে এইরূপ ভীতি বা নৈরাশ্যের কোন কারণ ঘটে না। তবে অঙ্ক কষা ভাল করিয়া শিখিতে হইলে শিশুকে নিয়ম মুখস্থ করার অপ্রীতিকর ও নীরস কাজটি করিতেই হইবে। শৈশবের শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যক্রম যখন শিশুদের কাছে আনন্দদায়ক করার চেষ্টা হয় তখন এই বিষয়টি সেখানে স্থান দিলে কিছুটা বিসদৃশ হয় বটে কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরেই ইহা করিতে হয়। ইহা ছাড়া গণিত শিশুর মনকে স্বাভাবিকভাবেই সঠিকতার জন্য প্রস্তুত করে: কোন অঙ্কের উত্তর শুধু 'ঠিক' কিংবা 'ভুল' হইতে পারে, ইহা বলা চলে না যে, উত্তরটি খুব 'আনন্দদায়ক' কিম্বা 'ভাবপূর্ণ' হইয়াছে। গণিতের ব্যবহারিক উপযোগিতা তো আছেই, তাহা ছাড়া সঠিকতা শিক্ষার সহায়ক বলিয়া বাল্যশিক্ষায় ইহার গুরুত্ব অনেকখানি। প্রথম হইতেই অঙ্ক যাহাতে শিশুর কাছে

ভীতিজনক বলিয়া মনে হইতে না পারে সেজন্য কঠিনত্ব অনুসারে ইহার ক্রম নির্ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে সহজ হইতে কঠিনের দিকে আগাইয়া যাইতে হয়; একসঙ্গে খুব বেশী সময় শিশুকে এ বিষয়ে নিয়োজিত রাখা উচিত নয়।

আমাদের বাল্যকালে ভূগোল ও ইতিহাস পড়ানো হইত সবচেয়ে খারাপ। ভূগোলের প্রতি আমার বিশেষ ভীতি ছিল, ইতিহাসের প্রতি আমার গভীর অনুরাগ ছিল বলিয়া ইহার পাঠ কোন রকম সহ্য করিয়াছি। এ দুটি বিষয়ই শিশুদের নিকট আনন্দদায়ক করা যায়। আমার ছেলেটি এখনো ভূগোলের পাঠ গ্রহণ করে নাই, তবু সে তাহার পরিচারিকার চেয়ে ভূগোলের বিবরণ বেশী জানে। অন্যান্য বালকের মতই তাহার যে রেলগাড়ী ও ষ্টীমারের প্রতি আকর্ষণ আছে তাহারই ভিতর দিয়া সে জ্ঞান অর্জন করিয়াছে। তাহার কল্পনার জাহাজ কোন্ পথে চলিবে সে তাহা জানিতে চায় এবং আমি যখন চীনদেশে যাওয়ার পথের বর্ণনা দিই তখন সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাহা শোনে। তখন সে যদি দেখিতে চায় তবে আমি তাহাকে পথে বিভিন্ন দেশের ছবি দেখাই। সময় সময় সে বড় ভূচিত্রাবলীখান টানিয়া লইয়া তাহাতে দেশ ভ্রমণের পথ দেখিতে চায়। আমরা প্রতি বৎসর দুইবার করিয়া লণ্ডন যাই। লণ্ডন ও কর্নওয়ালের মধ্যে ট্রেনে ভ্রমণে খোকা যারপরনাই আনন্দিত হয় এবং যেখানে যেখানে ট্রেন থামে অথবা যেখানে গাড়ী জুড়িয়া দেওয়া হয় সে সব জায়গার নাম তাহার মুখস্থ। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু তাহাকে মুগ্ধ করে কিন্তু সে ভাবিয়া পায় না পূর্ব মেরু ও পশ্চিম মেরু নাই কেন! কোন্ দিকে ফ্রান্স ও স্পেন দেশ এবং কোন্ দিকে আমেরিকা তাহা সে জানে; ঐসব দেশে কি কি দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও মোটামুটিভাবে অনেক কিছু জানে। এসব বিষয় তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য শিখানো হয় নাই, কৌতূহলের বশে প্রশ্ন করিয়া করিয়া সে এসব শিখিয়াছে। ভ্রমণের সঙ্গে সংযুক্ত হইলে ভূগোল শেখার আগ্রহ প্রায় সকল শিশুরই হয়। শিশুকে ভূগোল শিখানোর উপায় স্বরূপ ছবি এবং ভ্রমণকারীদের গল্প বলা চলে কিন্তু প্রধান উপায় হইল বিভিন্ন দেশে ভ্রমণকারী কি দেখিতে পায় তাহা চলচ্চিত্রে ছাত্রদিগকে দেখানো। এমনি কতকগুলি ভৌগোলিক বিষয়ের জ্ঞান কাজে লাগিতে পারে কিন্তু ইহার বুদ্ধিমূলক কোন মূল্য নাই। কিন্তু ছবির সাহায্যে ইহা যখন শিশুর মনে স্পষ্ট ও জীবন্ত হইয়া উঠে তখন ইহা শিশুকে কল্পনার খোরাক যোগায়। পৃথিবীতে যে গরম দেশ ও শীতল দেশ আছে, শ্বেতকায় লোকের মত কৃষ্ণকায় লোক, পীত লোক, বাদামী বর্ণের লোক এবং লোহিত বর্ণের লোকও যে আছে শিশুর পক্ষে তাহা জানা ভাল। ইহা জানা থাকায় পরিচিত ভৌগোলিক পরিবেশ শিশুর

মন ও কল্পনার উপর চাপিয়া বসিয়া তাহার মনের সতেজটা নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে না এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য দেশ যে সত্য সত্যই আছে—এই বোধ জন্মাইতে সাহায্য করে; নতুবা দেশ ভ্রমণ ব্যতীত অন্যান্য দেশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট বিশ্বাস বা অনুভূতি লাভ করা বড় কঠিন। এই সব কারণে অতি অল্প বয়সেই শিশুদিগকে আমি ভূগোল শিখাইবার পক্ষপাতী; তাহারা ইহাতে আনন্দবোধ না করিলে আমি বিস্মিত হইব। কিছুদিন পরে আমি শিশুদিগকে ছবিযুক্ত বই, মানচিত্র দিব এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে মোটামুটি বিবরণ জানাইব; এই প্রসঙ্গে আমি তাহাদিগকে বিভিন্ন দেশের সম্বন্ধে মোটামুটি বিবরণ জানাইব; এই প্রসঙ্গে আমি তাহাদিগকে বিভিন্ন দেশের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ছোট ছোট প্রবন্ধ রচনা করিতে বলিব।

ভূগোলের সম্বন্ধে যাহা প্রযোজ্য ইতিহাস শিক্ষার বেলাতেও তাহাই বরং আরো বেশী ভাবে খাটে, তবে ইতিহাস শিক্ষা একটু বয়স বেশী হইলে শুরু করিতে হয় কারণ অতি অল্পবয়সে শিশুর সময়-জ্ঞান খুবই কম থাকে। প্রথমে বিখ্যাত লোকদের গল্প বহুচিত্রিত পুস্তকে বিশেষ আকর্ষণীয় ভাবে শিশুদের সম্মুখে ধরিতে হইবে। ঐ রকম বয়সে আমার নিজের একখানা ইংলণ্ডের ইতিহাসের ছবির বই ছিল। তাহাতে একটি ছবি ছিল রাণী ম্যাটিল্ডা আবিংডনে বরফের উপর দিয়া টেমস্ নদী পার হইতেছেন; সে ছবিখানি আমার মনে এমন গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছিল যে, আঠার বৎসর বয়সে আমি যখন ঠিক ঐরূপভাবে বরফ পার হইয়া গিয়াছিলাম তখন আমার দেহ-মনে শিহরণ উঠিয়াছিল, মনে হইতেছিল রাজা ষ্টিফেন যেমন রাণী ম্যাটিল্ডাকে সসৈন্যে অনুসরণ করিয়াছিলেন তেমনি আমার পিছনে যেন ষ্টিফেন ছুটিয়া আসিতেছিলেন। আমার পাঁচ বৎসর বয়সের এমন কোন বালক নাই যে আলেকজাণ্ডারের জীবনী শুনিয়া আনন্দিত না হইবে। কলম্বাসের জীবন-কথায় ইতিহাসের চেয়ে ভূগোলের অংশই বেশী; দুই বৎসর বয়স্ক শিশু অন্ততঃ সমুদ্রের সঙ্গে পরিচয় আছে এমন শিশু যে কলম্বাসের জীবন-কথায় আনন্দ পায় এ প্রমাণ আমি নিজেই দিতে পারি। শিশু যখন ছয় বৎসর বয়সে পদার্পণ করে তখন মিঃ এইচ, জি, ওয়েল্‌সের ধরণের লেখা পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তাহাকে দেওয়া চলে, অবশ্য কোন কোন অংশ আরো সরলভাবে লেখা এবং অধিকতর ছবি সন্নিবেশ করার প্রয়োজন হইবে; অথবা সম্ভবপর হইলে চলচ্চিত্রের সাহায্য গ্রহণ করা চলে। লণ্ডনে বাস করিলে শিশু প্রাকৃতিক ইতিহাসের যাদুঘরে (Natural History Museum) অদ্ভুত প্রাণী দেখিতে পারে কিন্তু দশ বৎসর কিম্বা ঐ রকম কাছাকাছি বয়স ছাড়া শিশুকে আমি

ব্রিটিশ যাদুঘরে (British Museum-এ) লইয়া যাইতে চাই না। ইতিহাস শিখাইবার সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে আমাদের বয়স্ক ব্যক্তিদের নিকট যাহা আনন্দদায়ক তাহা যেন জোর করিয়া শিশুর উপর চাপাইয়া দেওয়া না হয়। যে দুটি বিষয় শিশুকে প্রথমে আকৃষ্ট করে তাহা হইল: পৃথিবীতে মানুষের প্রথম আবির্ভাব, বন্য মানুষ হইতে ক্রমে সভ্য মানুষের পর্যায়ে তাহার জয়যাত্রার কথা: দ্বিতীয়, যেখানে কোন ব্যক্তির বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া বালক তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয় তাঁহার জীবনের ঘটনাগুলির সরস নাটকীয় ভঙ্গীতে বর্ণনা। এখানে মনে রাখিতে হইবে মানুষের অগ্রগতি সরল এবং সহজ পথে হয় নাই; আদিম বর্বর মানুষের নিকট হইতে রক্তের ভিতর দিয়া আমরা যে বর্বরতা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছি তাহাই মাঝে মাঝে সভ্যতার দিকে আগাইয়া যাওয়ার পরে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়াছে কিন্তু জ্ঞানের বলে মানুষ এই প্রতিরোধ জয় করিয়াছে। কোন বিশেষ এক দেশের অধিবাসীদের কথা নয়; সমগ্র মানব জাতির ক্রমবিবর্তন ও অগ্রগতির কাহিনী হইবে ইতিহাস শিক্ষার গোড়ার কথা; মানুষ তখন বাহিরের নানারূপ প্রতিকূল ও বিশৃঙ্খল অবস্থা এবং ভিতরের অজ্ঞানতার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে আগাইয়া চলিয়াছে, বিচার-বুদ্ধির ক্ষুদ্রদীপ জ্ঞানের দীপ্তিতে ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হইয়া অজ্ঞানের অন্ধকার রজনীর অবসান ঘটাইতেছে। বিভিন্ন গোষ্ঠি, জাতি এবং ধর্মসম্প্রদায়ে বিভক্ত হওয়া মানবের পক্ষে নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক; বিশৃঙ্খলা ও অজ্ঞান-তমসারাত্রির অবসানকল্পে মানবের যে সংগ্রাম অবিরাম চলিয়াছে তাহাতে এই ভেদবুদ্ধির মানুষকে দুর্বল এবং বিভ্রান্ত করিয়া ফেলে। পক্ষান্তরে, সুশৃঙ্খল ও জ্ঞানদীপ্ত মানবসমাজ গড়িয়া তোলাই মানবোচিত কাজ।

প্রথমে আমি ছবি ও গল্পের ভিতর দিয়া বিষয়-বস্তুটির অবতারণা করিব, প্রথমে থাকিবে কেবল মানুষের আদিম যুগ হইতে ক্রমোন্নতির পথে জয়যাত্রার কথা: ইহার অন্তর্নিহিত ভাব এবং মানুষের আদর্শ কি হওয়া উচিত সে কথা প্রথমে না বলিয়া পরে—শিশুর বিচারবুদ্ধি কিছুটা বৃদ্ধি পাইলে—অবতারণা করা চলে। আমি দেখাইব কেমন করিয়া আদিম মানব শীতে কষ্ট পাইয়াছে, কাঁচা ফল খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছে। কখন আগুন আবিষ্কার করা হইল এবং ইহার ফলে আদি মানবের জীবনে কি পরিবর্তন আসিল তাহা দেখাইব: এই প্রসঙ্গে প্রমিথিয়ুস কর্তৃক আগুন আনার কাহিনী বর্ণনা করিলে তাহা সময়োপযোগী হইবে। তারপরে দেখাইব কেমন করিয়া মিশর দেশে নীল নদের উপত্যকায় কৃষিকার্যের পত্তন হয় এবং কুকুর, ভেড়া ও গরু পোষা শুরু হয়। গাছের গুঁড়ি খোদাই করিয়া যে নৌকা তৈয়ার করা হইত তাহা হইতে শুরু

করিয়া কেমন করিয়া বর্তমান যুগের বিরাট জাহাজ নির্মাণ করা সম্ভব হইয়াছে তাহা দেখাইব; মানুষের বাসস্থান আদি মানবের পর্বতগুহা হইতে কিভাবে বর্তমানের লণ্ডন ও নিউ ইয়র্কের মত বিরাট সহরের অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহার চিত্র দেখাইব; অক্ষর ও সংখ্যা লেখার ক্রমবিকাশ দেখাইব; গ্রীসের উন্নত সভ্যতার কথা, রোমের বিপুল ঐশ্বর্যের কথা, তাহার পরবর্তীকালের সভ্যতার অবনতি ও অজ্ঞানের অন্ধকারের কথা এবং সর্বশেষ বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির কথা গল্প ও চিত্র সাহায্যে শিশুদিগকে বুঝাইতে হইবে। খুব কম বয়সের শিশুর নিকটও এ বিষয়গুলি চিত্তাকর্ষক করা যায়। মানব-জাতির ইতিহাস বর্ণনায় যুদ্ধবিগ্রহ, অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে নীরব থাকিব না। তবে রণজয়ী বীরদিগকে আমি খুব প্রশংসার পাত্র বলিয়া ছাত্রদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিব না। আমার ইতিহাস শিক্ষায় প্রকৃত বিজয়ী বীর তাঁহাদিগকেই বলিব যাঁহারা মানুষের ভিতরের ও বাহিরের অজ্ঞান-তমসা দূর করিয়াছেন— যেমন বুদ্ধ এবং সক্রেটিস, আর্কিমেডিস, গ্যালিলিও নিউটন এবং আর সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তি যাঁহারা আমাদিগকে আত্মজয় করিতে কিংবা বহিঃপ্রকৃতি জয় করিতে সাহায্য করিয়াছেন। মানুষের মহান সম্ভাবনা এবং বিপুল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি ছাত্রদের ধারণা গড়িয়া তুলিতে চাই। তাহারা যেন বুঝিতে পারে যে যুদ্ধবিগ্রহ এবং আমাদের পূর্বপুরুষ আদি বর্বর মানবের মত আচরণ দ্বারা আমরা এখন ভ্রান্ত পথেই চালিত হইব, মানুষের মধ্যে সদ্ভাব, মানব-জাতির পক্ষে কল্যাণকর কাজ করাতেই মানুষের সভ্যতার আসল পরিচয়।

নৃত্য ও সঙ্গীত :

বিদ্যালয়ে প্রথম কয়েক বৎসরে নৃত্য অভ্যাস করার জন্য কিছু সময় নির্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে। নৃত্য শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে, তাহাদিগকে প্রচুর আনন্দ তো দেয়ই, তাহা ছাড়া সুরুচিবোধ জাগ্রত করে। নৃত্যের প্রথম পাঠ শিক্ষা শেষ করা হইলে শিশুদিগকে সমবেত নৃত্য শিখাইতে হইবে। এই ধরণের সহযোগিতামূলক আনন্দদায়ক কাজ শিশুরা ভালবাসে। সংগীত সম্বন্ধে ঠিক এইরূপ ব্যবস্থা করা চলে, তবে নৃত্যের চেয়ে কিছু পরে ইহা আরম্ভ করিতে হইবে, কারণ নৃত্যে যেমন দেহের আন্দোলনজনিত আনন্দ আছে সংগীতে তেমন সুযোগ নাই; তাহা ছাড়া সংগীত নৃত্যের চেয়ে কঠিনও। সকলে না হইলেও অনেক শিশুই গান গাহিতে আনন্দ পাইবে এবং শিশুর ছড়া শেখার পর ভাল গান গাহিতে শিখিবে। প্রথমেই শিশুদের রুচি বিকৃত করিয়া পরে সংশোধন করার চেষ্টা করিয়া কোন লাভ নাই; ইহার ফলে তাহা-

দিগকে ইঁচড়ে-পাকা করা হয় মাত্র। বয়স্ক ব্যক্তিদের মতই সকল শিশুর গান গাহিবার সমান যোগ্যতা থাকে না। কাজেই কঠিন সুরের গানগুলি শেখার জন্য কতক ছেলেমেয়েকে বাছাই করিয়া লইতে হইবে। এরূপ বালকবালিকার পক্ষেও গান সেচ্ছাধীন বিষয় রাখিতে হইবে ; গান গাহিতে পারে বলিয়াই তাহাদের উপর জোর করিয়া ইহা চাপাইবার প্রয়োজন নাইই।

সাহিত্য শিক্ষার ব্যপারে সহজেই ভুল হইতে পারে। কি শিশু, কি বৃদ্ধ কাহারো পক্ষেই সাহিত্য সম্বন্ধে কেবল কতকগুলি বিষয়, যেমন কবিদের সময়কাল, তাহাদের রচনাবলীর নাম বা এই ধরেরের বিষয় জানিয়া কোন লাভ নাই। এইরূপ নোটবুকে টুকিয়া রাখার যোগ্য যে জ্ঞান তাহা শুধু পল্লব-গ্রাহিতারই পরিচায়ক ; ইহার প্রকৃত মূল্য কিছু নাই। সৎ সাহিত্য যদি পাঠকের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে তবেই ইহার পাঠে সার্থকতা; সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের প্রভাব পাঠকের কেবল রচনাশৈলীর (Style) উপর নয়, চিন্তার প্রকৃতির উপরও পড়া চাই। কয়েক, শতাব্দী আগে বাইবেল ইংরেজ শিশুদের উপর এইরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল : ইংরাজী গদ্যরচনায় ইহার সুফল দেখা গিয়াছে কিন্তু আধুনিক কালের খুব কম বালকবালিকারই বাইবেলের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় আছে। আমার মনে হয় মুখস্থ না করিলে সাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ সুফল পাওয়া যায় না। স্মৃতিশক্তি বেশী করার উপায়-স্বরূপ পূর্বে মুখস্থ করানোর রীতি ছিল কিন্তু মনোবিজ্ঞানিগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইহা এক রকম নিষ্ফল। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ ইহাকে শিক্ষাক্ষেত্রে খুব কম স্থান দিতেছেন কিন্তু আমার মনে হয় ইহাতে ভুল করা হইতেছে। মুখস্থ করার ফলে যে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহা নয়, কথায় এবং লেখায় সুন্দর ভাষা প্রয়োগ করার যে সুফল পাওয়া যায় তাহার জন্য মুখস্থ করা দরকার। কষ্ট করিয়া ভাষার মাধুর্য অর্জন করিতে হইবে না ; চিন্তার স্বতঃস্ফূর্তবাহন হিসাবে যদি সাবলীল ভাষা স্বাভাবিকভাবে আসে তবেই ইহার সার্থকতা প্রমাণিত হইবে। বর্তমান সমাজে প্রাচীন যুগের চেয়ে সৌন্দর্য ও রুচিবোধের আবেগ কমিয়া গিয়াছে, সৎ সাহিত্যের সঙ্গে ভালরকম পরিচয়ের ফলেই চিন্তার পরিচ্ছন্নতা ও ভাষার সৌষ্ঠব আয়ত্ত করা সম্ভবপর। এইজন্যই মুখস্থ করা আমার কাছে এত প্রয়োজনীয় মনে হয়।

কিন্তু এজন্য কতকগুলি বাঁধাধরা গদ্য বা পদ্যের অংশ মুখস্থ করাইলে তাহা শিশুদের নিকট বিরক্তিকর ও অকৃত্রিম বলিয়া মনে হয় ; কাজেই ইহাতে সুফল পাওয়া যায় না। অভিনয় করানোর সুযোগে মুখস্থ করাইলে বরং উপকার হয়, কেননা অভিনয় করিতে শিশুরা খুবই ভালবাসে। তিন বৎসর

বয়স হইতেই শিশুরা ইহাতে আনন্দ পায়; নিজেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এরূপ করে, ইহার জন্য যখন নানারূপ সাজসজ্জা করা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য আয়োজন হয় তখন তাহাদের উল্লাস ধরে না। বাল্যকালে 'জুলিয়াস সীজার' নাটক অভিনয় করিতে ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াসের মধ্যে বিষাদের দৃশ্য অভিনয়ে আমি কিরূপ তীব্র আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম তাহা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

যে সকল শিশু অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে তাহারা যে কেবল নিজেদের অংশই মুখস্থ করে তাহা নয়, অপর অংশগুলিরও প্রায় সবটাই মুখস্থ করিয়া ফেলে। নাটকটি বহুদিন তাহাদের চিন্তায় স্পষ্ট হইয়া থাকে এবং আনন্দ দান করে। ভাল সাহিত্যের উদ্দেশ্যই হইল আনন্দদান করা; শিশুরা যদি সাহিত্য হইতে আনন্দ আহরণ করিতে না পারে তবে ইহা হইতে কোন উপকারও পাইবে না। এই কারণের জন্য আমি বাল্যকালে কেবল অভিনয়োপযোগী অংশগুলি মুখস্থ করানোর পক্ষপাতী। ইহা ছাড়া শিশুরা ইচ্ছামত স্কুলের লাইব্রেরী হইতে সুলিখিত গল্পের বই লইয়া পড়িতে পাইবে।

আজকাল অনেক লেখক শিশুদের জন্য বাজে এবং তরল ভাবোদ্দীপক বই লেখেন; ইহাতে শিশুদের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয় না; এগুলি শিশুদের ছেলেমিকে বাড়াইয়া তুলিয়া তাহাদিগকে অপমান করে। ইহার বিপরীত অবস্থা লক্ষ্য করুন 'রবিনসনক্রুসো' পুস্তকে। শিশুদের জন্য লিখিত হইলে তাহাতে কোথাও ছেলেমি বা ন্যাকামির স্থান নাই। কি শিশুর সঙ্গে আচরণে, কি অন্যত্র তরল ভাবপ্রবণতার আকর্ষণ কখনই বেশী নয়। কোন শিশুই ছেলেমির প্রতি আকৃষ্ট হয় না, সে চায় যতশীঘ্র সম্ভব বয়স্ক ব্যক্তির মত আচরণ অভ্যাস করিতে। কাজেই শিশুদের জন্য বই লিখিতে তাহাদের ছেলেমি অবলম্বন করিয়া কাহিনী গড়িয়া তোলার কোন আবশ্যকতা নাই। শিশুদের জন্য রচিত আধুনিক বইতে এরূপ কৃত্রিম ন্যাকামি বড়ই বিরক্তিকর। শিশুরা ইহা পড়িয়া আনন্দ পায় না, তাহাদের মানসিক বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল স্বাভাবিক ভাবাবেশও ইহা দ্বারা ব্যাহত হয়। শিশুদের মন বিকাশোন্মুখ। এবং সম্প্রসারণের জন্য অধীর। শিশুরা চিরকাল শিশু হইয়া থাকিতে চায় না, তাহারা চায় শক্তিমান কর্মক্ষম বয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হইতে। গল্পের বইতেও তাহারা এই বিকাশের পরিচয় দেখিতে পাইলে আনন্দিত হয়; কাজেই বইতে ইহার বিপরীত অবস্থা দেখিলে শিশুর ছেলেমিতে তাহাদের মন সায় দেয় না। এইজন্যই যে সব ভাল বই বয়স্কদের জন্য লিখিত অথচ তাহাদের পক্ষেও উপযোগী সেইগুলিই শিশুদের জন্য শ্রেষ্ঠ। ইংরাজি সাহিত্যে ইহার ব্যতিক্রম কয়েকখানি মাত্র বই আছে, যেমন লিয়ার (Lear) ও লুই ক্যারোল

কতৃক (Lewis Carol) শিশুদের জন্য লিখিত বই ; এগুলি পড়িয়া বয়স্ক ব্যক্তিরাও প্রচুর আনন্দ পায়।

বিদেশী ভাষা শিক্ষা :

আধুনিক ভাষা শিক্ষার প্রশ্নটি একেবারে সহজ নয়। শৈশবে কোন আধুনিক ভাষায় কথা বলা যেমন সুন্দরভাবে শেখা যায় অন্যকোন বয়সে তত সম্পূর্ণভাবে শেখা যায় না। শৈশবে ভাষা শিক্ষা দেওয়ার স্বপক্ষে ইহাও একটি সুযুক্তি। অনেকে আশংকা করেন যে, শৈশবে বিদেশী ভাষা শিক্ষা দিলে শিশুর মাতৃভাষা শিক্ষায় ব্যাঘাত জন্মে। আমি ইহা বিশ্বাস করি না। টলস্টয় এবং টুর্গেনিভ যদিও শৈশবে ইংরাজি, ফরাসী এবং জার্মান ভাষা শিখিয়াছিলেন তবু রাশিয়ান ভাষায় তাঁহাদের দখল ছিল অসাধারণ। গিবন ইংরাজি ভাষার মত সহজ সাবলীল ভঙ্গীতেই ফরাসীও লিখিতে পারিতেন, কিন্তু এজন্য তাঁহার ইংরাজি রচনার শৈলী (স্টাইল) মোটেই ব্যাহত হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক ইংরেজ অভিজাত ব্যক্তি কৈশোরেই ফরাসী এবং অনেকে ইটালীয়ান ভাষাও শিক্ষা করিতেন, তথাপি তাঁহাদের ইংরাজি ভাষা তাঁহাদের বর্তমান উত্তরাধিকারীদের চেয়ে অনেক ভাল ছিল। কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন শিশু বহুভাষা শিক্ষা করিলে তালগোল পাকাইয়া ফেলিবে। সে যদি বিভিন্ন লোকের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলিবার সুযোগ পায় তবে তাহার নাটকীয় প্রবৃত্তিই তাহাকে এইরূপ খিচুড়ি পাকাইতে দেয় না। আমি ইংরাজি শিক্ষার সময় হইতেই জার্মান ভাষা শিক্ষা করা শুরু করিয়াছিলাম এবং দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পরিচারিকা ও গৃহশিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে ঐ ভাষায় কথা বলিতাম : তারপর ফরাসী ভাষা শিখি ; তখন গৃহশিক্ষয়িত্রী এবং শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলিতে ঐ ভাষা ব্যবহার করিতাম। এই দুই ভাষার কোনটিই ইংরাজির সহিত মিশিয়া যাইত না, কারণ ইহার প্রত্যেকটির সঙ্গে পৃথক ব্যক্তিগত অনুষঙ্গ (association) জড়িত ছিল।

বিদেশী ভাষা শিক্ষার সহজ উপায় :

আমার মনে হয় যদি কোন বর্তমান ভাষা শিক্ষা করিতে হয় তবে উহা যাঁহার মাতৃভাষা এমন লোকের নিকটই শেখা উচিত কারণ তিনি যে কেবল ভাল ভাবে শিখাইতে পারিবেন তাহাই নয়, শিক্ষার্থী শিশুর মাতৃভাষায় যিনি কথা বলেন তাঁহার সঙ্গে বিদেশী ভাষায় কথা বলিতে যেরূপ কৃত্রিমতা থাকে বিদেশীর সঙ্গে বিদেশী ভাষায় বাক্যালাপ করিতে সেরূপ কৃত্রিমতা-বোধ আসে

না। কাজেই আমার মনে হয় প্রত্যেক স্কুলেই একজন করিয়া ফরাসী শিক্ষয়িত্রী এবং সম্ভবপর হইলে একজন জার্মান শিক্ষয়িত্রী থাকা উচিত। ভাষা শিক্ষা-দানের প্রথম অবস্থায় কেবল ইহারা যথারীতি পাঠ দিবেন। তারপর খেলাধূলা এবং শিশুদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার ভিতর দিয়া ভাষা শিক্ষা চলিবে; এমন হওয়া চাই যেন বিদেশী ভাষা বুঝিয়া তাহাতে উত্তর করিতে পারার ভিতর দিয়াই খেলা পূর্ণাঙ্গ ও সফল হয়। শিক্ষয়িত্রী প্রথমে সহজ খেলা হইতে শুরু করিয়া ক্রমে জটিলের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন। এইভাবে কোনরূপ মানসিক পরিশ্রম ছাড়াই আনন্দদায়ক কাজের মাধ্যমে বিদেশী ভাষা শিখানো চলে। বাল্যকালে যেমন সহজে এবং যত কম সময় অপচয় করিয়া ইহা আয়ত্ত করা যায় অন্য কোন বয়সে সেরূপ করা সম্ভবপর নয়।

অঙ্ক ও বিজ্ঞান শিক্ষা

আমরা যে বয়সের পাঠ্যক্রম আলোচনা করিতেছি ইহার শেষদিকে অর্থাৎ বারো বছর বয়সে অঙ্ক ও বিজ্ঞান শিক্ষা শুরু হইবে। অবশ্য আমি ধরিয়া লইতেছি যে ইতোমধ্যে পাটীগণিত শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং জ্যোতিষ ও ভূবিদ্যা, প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী, বিখ্যাত আবিষ্কারক এবং অনুরূপ কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করা হইয়াছে। আমি এখন জ্যামিতি ও পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা শিখানোর কথা চিন্তা করিতেছি। খুব কমসংখ্যক বালকবালিকা জ্যামিতি ও বীজগণিত পছন্দ করে, বেশীর ভাগই পছন্দ করে না। কেবল ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাদান প্রণালীই ইহার কারণ কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। গান গাহিবার ক্ষমতার মতই গাণিতিক বোধ দেবদত্ত শক্তি, মাঝারি রকম মাত্রায়ও ইহা একান্ত বিরল। তথাপি প্রত্যেক বালকবালিকারই গণিতের প্রতি অনুরাগ থাকা উচিত, কাহারো গাণিতিক প্রতিভা আছে কিনা তাহা ইহার অনুশীলনের ভিতর দিয়াই আবিষ্কার করা যায়। যাহারা বিশেষ কিছু শিখিতে পারে না, তাহারা ইহা জানিয়া উপকৃত হয় যে, ঐ ধরনের একটি শিক্ষণীয় বিষয় আছে। উপযুক্ত প্রণালীতে শিক্ষা দিলে প্রায় সকলেই জ্যামিতির বিষয়বস্তু বুঝিতে পারে। বীজগণিত সম্বন্ধে ঠিক একথা বলা চলে না; জ্যামিতির চেয়ে ইহা অধিকতর বস্তুনিরপেক্ষ (abstract) এবং স্থূল বস্তু হইতে যাহারা মনকে সরাইয়া লইতে পারে না তাহাদের পক্ষে ইহা দুর্বোধ্য। উপযুক্তভাবে শিক্ষা দিলে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার প্রতি অনুরাগী ছাত্রের পরিমাণ গণিতানুরাগীর চেয়ে কিছু বেশী হইতে পারে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় ইহার প্রতি অনুরাগ খুব কম-

সংখ্যক যুবকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন বালক বা বালিকার গণিত ও বিজ্ঞানের প্রতি কোনরূপ প্রবণতা আছে কিনা তাহা জানিবার জন্য বারো হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত ইহা শিখানো উচিত। অনেক সময় ইহা প্রথমেই ধরা পড়ে না। আমি প্রথমে বীজগণিত মোটেই পছন্দ করিতাম না, যদিও পরে ইহার কায়দা শিখিয়া লওয়ার বিষয়টি সহজ মনে হইয়াছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্রের কোন প্রতিভা আছে কিনা চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাহা সঠিকভাবে জানা নাও যাইতে পারে। এরূপ ছাত্র বা ছাত্রীকে পরীক্ষামূলকভাবে আরো কিছু-দিন পর্যবেক্ষণ করা চলে কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই চৌদ্দ বৎসর বয়সেই বাছাই করা যায়। কতক এ বিষয়গুলি পছন্দ করিবে এবং ইহাতে ভাল করিবে, কতক ইহা মোটেই পছন্দ করিবে না কিংবা বোকা ছাত্র ইহা পছন্দ করিবে এরূপ ব্যাপার অতি কদাচিৎ ঘটিতে পারে।

প্রাচীন সাহিত্য :

গণিত ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কেও তাহাই প্রযোজ্য। বারো হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সের মধ্যে প্রাচীন ভাষা (যেমন ল্যাটিন) ততটুকুই শিক্ষা দিতে হইবে যাহা হইতে বোঝা যায় কোন বালকের বা কোন বালিকার ইহার প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ এবং দক্ষতা আছে। আমি মনে করি যে, চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতেই ছাত্রের রুচিপ্রবণতা ও ক্ষমতা অনুসারে বিশেষ এবং উন্নত মানের শিক্ষা শুরু হওয়া উচিত। শিশুকে পরবর্তীকালে কি শিক্ষা দিলে ভাল হইবে তাহা ছাত্রের চৌদ্দ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তির কিছু পূর্ব হইতেই বিশেষভাবে নিরূপিত হওয়া আবশ্যক।

বহিঃপ্রকৃতির সহিত পরিচয় :

সারা স্কুল-জীবন ধরিয়াই বাহিরের সহিত পরিচয় হইতে থাকিবে। অবস্থাপন্ন লোকের সন্তানদের বেলায় ইহার ভার ছাত্রের পিতামাতার উপর দেওয়া চলে কিন্তু অপর ছাত্রদের বেলায় এরূপ পরিচয় সাধনের দায়িত্ব বিদ্যালয়কেই আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। আমি যখন বাহিরের বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার কথা বলিতেছি তখন আমি খেলাধুলার কথা ভাবিতেছি না। ইহার অবশ্য উপকারিতা আছে এবং তাহা রীতিমতভাবে স্বীকৃত হইয়াছে কিন্তু অন্য ধরনের বহির্বিষয়ের শিক্ষার কথা বলিতেছি যেমন চাষ-আবাদের প্রণালী, গাছপালা ও জীবজন্তু চেনা, বাগানের কাজের সঙ্গে পরিচয়, পল্লী পর্যবেক্ষণ এবং অনুরূপ বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান। আমি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি যে, এমন

সহরে লোক আছে যাহারা কম্পাস বা দিগদর্শন-যন্ত্রের চিহ্ন বোঝে না। সূর্য কোন্ দিকে যায় জানে না, গৃহের কোন্ দিকটি বায়ু-প্রবাহের আড়ালের দিকে পড়ে জানে না। প্রত্যেক গরু কিংবা ভেড়ার যে জ্ঞান সেরূপ জ্ঞান হইতেও বঞ্চিত। ইহা নিরবচ্ছিন্নভাবে কেবল সহরে বাস করার কুফল। যদি বলি শ্রমিকদল যে পল্লী অঞ্চলে ভোটে জয়ী হইতে পারে না ইহা তাহার অন্যতম কারণ তবে হয়ত অনেকেই আমাকে কল্পনা-বিলাসী বা খামখেয়ালী বলিবেন। কিন্তু সহরে লালিতপালিত ব্যক্তিদের পল্লীর সঙ্গে কোনরূপ সংশ্রব না থাকার ফলেই বহু প্রাচীন এবং মৌলিক জিনিসের সঙ্গেও তাহাদের পরিচয় নাই।

বিভিন্ন ঋতু ও আবহাওয়া, ফসল বোনা ও কাটা, নানা গৃহপালিত প্রাণী প্রভৃতির মানব-জীবনের সহিত সংযোগ আছে; কাজেই জীবধাত্রী বসুন্ধরার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে না চাহিলে ইহাদের সহিত প্রত্যেকের পরিচিত হওয়া উচিত। বিদ্যালয়ের বাহিরে নানা কাজের ভিতর দিয়া শিশুগণ এসবের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারে; বিদ্যালয়ের বাহিরে কাজকর্ম এবং রৌদ্রে ও মুক্ত বায়ুতে অবস্থান ছাত্রদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অশেষভাবে উপকারী; শুধু এই জন্যও পল্লী অঞ্চলে ভ্রমণ বাঞ্ছনীয়। সহরের শিশুরা পল্লীতে গেলে যেরূপ আনন্দিত হয় তাহা হইতে বোঝা যায় যে, তাহাদের একটি বড় অভাব যেন পূরণ করা হইতেছে। যতদিন এই অভাব পূরণ না হয় ততদিন শিক্ষাপ্রণালী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

ষোড়শ অধ্যায়

বিদ্যালয়-জীবনের শেষ কয়েক বৎসর

আমি ধরিয়া লইয়াছি যে, পঞ্চদশ বৎসরে গ্রীষ্মের ছুটির পর যে সকল বালক-বালিকা কোন বিষয়ে উন্নততর বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে তাহাদিগকে ঐরূপ শিক্ষায় সুযোগ দেওয়া হইবে; ইহাও ধরিয়া লওয়া যায় যে, এরূপ শিক্ষার্থীর সংখ্যা হইবে অনেক। যদি কোন শিক্ষার্থীর কোন্ বিষয়ের প্রতি ঝোঁক বা কোন্ বিষয়ের উপযুক্ত মানসিক শক্তি আছে তাহা এ সময়ের মধ্যে নিরূপণ করা সম্ভবপর না হয় তবে তাহাকে আরো কিছুদিন সাধারণ-শিক্ষাই দিতে হইবে। বিশেষ প্রতিভাবান ছাত্রের ক্ষেত্রে উন্নততর শিক্ষা পনর বছর বয়সের আগেও আরম্ভ করা যাইতে পারে। বিশেষ কারণ থাকিলে শিক্ষা ব্যাপারে এ নিয়মগুলির ব্যতিক্রম করা চলে। কিন্তু আমার মনে হয় বুদ্ধি বৃত্তিতে যাহারা সাধারণ বা মাঝারি প্রকৃতির বালক-বালিকার চেয়ে উপরের স্তরে তাহাদের চৌদ্দ বৎসর বয়সের কাছাকাছি সময়ে উন্নততর বিশেষ শিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হওয়া উচিত; যাহারা মাঝারির নীচে তাহাদের হাতের কাজ ছাড়া স্কুলে অন্য কোন বিষয়ে উন্নততর শিক্ষা না দেওয়াই ভাল। হাতের কাজ বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিব না। আমার মনে হয় চৌদ্দ বৎসর বয়সের পূর্বে ইহা আরম্ভ করা উচিত নয় এবং তখনও স্কুলে সর্বক্ষণ কেবল এই কাজেই ছাত্রকে নিয়োজিত রাখা সমীচীন নয়। ইহার জন্য কতখানি সময় দিতে হইবে, সকল ছাত্রকেই এরূপ বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া উচিত কিনা কিংবা কেবল অল্প সংখ্যককেই দিতে হইবে এ সকল প্রশ্ন এখানে আলোচনা করিতে চাই না। ইহা করিতে গেলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার কথা উঠে, সংক্ষেপে ইহা বিশদভাবে আলোচনা করা চলে না। তাহাছাড়া শিক্ষার সঙ্গে ইহা কেবল পরোক্ষভাবে সংযুক্ত। কাজেই চৌদ্দ বৎসর বয়সের পর ছাত্রের বুদ্ধিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রেই আমার বর্তমান আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিব।

স্কুলের পাঠ্যবিষয়গুলিকে আমি তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিতে চাই: (১) প্রাচীন সাহিত্য (২) অঙ্ক ও বিজ্ঞান (৩) আধুনিক সংস্কৃতিমূলক বিষয়। আধুনিক ভাষা, ইতিহা[illegible] ক। আমি অনুমান করিয়া লইয়াছি[illegible] গণ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবে না। [illegible] টিতে বেশ

খানিকটা উন্নততর বিশেষ শিক্ষাদান করা সম্ভব। যাহারা প্রাচীন সাহিত্য পড়িবে তাহারা নিশ্চয়ই ল্যাটিন ও গ্রীক দুই ভাষাই শিখিবে, তবে কেহ হয়তো একটিতে অপর কেহ বা অন্যটিতে বেশী অগ্রসর হইতে পারে; প্রথমে অঙ্ক ও বিজ্ঞান শিক্ষা একই সঙ্গে চলিবে কিন্তু বিজ্ঞানের কতক শাখায় খুব বেশী অঙ্ক ছাড়াও দক্ষতা অর্জন করা সম্ভবপর, বস্তুত এমন কতকজন উঁচুদরের বৈজ্ঞানিক আছেন যাঁহারা অঙ্কে বিশেষ পারদর্শী নন। কাজেই ষোল বৎসর বয়সে আমি কোন বালক বা বালিকাকে অঙ্কে কিংবা কোন বিজ্ঞানে বিশেষ উন্নত শিক্ষা গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করিব, তবে সে যাহাতে অন্য বিষয়টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আধুনিক সংস্কৃতিমূলক বিষয়গুলি সম্পর্কেও এই অভিমত প্রযোজ্য।

কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় আছে তাহা প্রত্যেকের জানা উচিত। শারীরস্থান (anatomy), শারীরবৃত্ত (physiology) এবং স্বাস্থ্যবিদ্যা (hygiene) বয়স্ক ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে যে পরিমাণে কাজে লাগে তাহা অবশ্য শিক্ষণীয়। এ বিষয়গুলি যৌনশিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত, কাজেই হয়ত ছাত্র এই শিক্ষা মোটামুটিভাবে আগেই পাইয়াছে, কারণ যৌবনাগমের পূর্বেই যৌনশিক্ষা দেওয়া উচিত। খুব বেশী বা কম বয়সে যৌন শিক্ষাদানের বিরুদ্ধে যুক্তি এই যে, যখন এ সম্পর্কে জ্ঞানের প্রয়োজন তাহার পূর্বেই ছাত্র যাহাতে ইহা ভুলিয়া না যায়। আমার মনে হয় এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হইল দুইবার এ শিক্ষা দেওয়া—একবার যৌবনাগমের পূর্বে খুব সরল এবং মোটা-মোটিভাবে এবং পুনর্বার স্বাস্থ্য এবং রোগ সংক্রান্ত আলোচনার সময়। ইহা ছাড়া প্রত্যেক ছাত্রেরই পার্লামেণ্ট এবং শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান আবশ্যক; কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে এ সম্পর্কে শিক্ষাদান যেন রাজনৈতিক প্রচারকার্য হইয়া না দাঁড়ায়।

পাঠ্যক্রমের চেয়ে শিক্ষাদান-রীতি এবং শিক্ষকের আন্তরিকতার প্রশ্নই প্রধান। শিক্ষাগ্রহণ কাজ খুব সহজ না করিয়াও কিভাবে আনন্দদায়ক করা যায় তাহাই হইল প্রধান সমস্যা। ছাত্রদিগকে উন্নততর শিক্ষা অর্জন করিতে কঠোর পরিশ্রম করিতেই হইবে। তবে এইরূপ পরিশ্রম লাঘব করিবার জন্য মাঝে মাঝে বিভিন্ন পুস্তক পাঠ ও বক্তৃতার আয়োজন করা চলে। যেমন কোন গ্রীক ভাষার নাটক পড়িতে আরম্ভ করার আগে গিলবার্ট মারে কিম্বা অন্য কোন কবিত্ব শক্তি সম্পন্ন অনুবাদক কর্তৃক অনূদিত গ্রীক নাটক ছাত্রদিগকে পড়িতে দেওয়া উচিত। অঙ্কশিক্ষা ব্যাপারেও তেমনি অঙ্ক আবিষ্কারের ইতিহাস বিভিন্ন বিজ্ঞান এবং দৈনন্দিন জীবনের উপর অঙ্কের প্রভাব আলোচনা করা যায়;

উচ্চতর ধরণের অঙ্কের মধ্যে যে অনেক আনন্দের উপাদান আছে তাহার ইঙ্গিতও দেওয়া উচিত। অনুরূপভাবে ইতিহাস শিক্ষাও ছাত্রদের নিকট প্রীতিপ্রদ করা চলে। মাঝে মাঝে ইতিহাস প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া ছাত্রদিগকে বিস্তৃততর পাঠে উদ্বুদ্ধ করা চলে, যেমন ইতিহাসের কোন ঘটনা বা গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে কোন ব্যাপক মন্তব্য করিয়া তাহা সত্য কিনা প্রমাণ করিবার জন্য ছাত্রদিগকে অধিকতর পাঠে উৎসাহিত করা যায়। বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ যে সকল সহজ পাঠ্যপুস্তকে প্রকাশিত হয় সেগুলি পাঠ করিয়া ছাত্রগণ বিজ্ঞানের প্রগতির সহিত পরিচয় রাখিতে পারে ; তাহারা বিজ্ঞানের যে দিকটা পাঠ করিতেছে তাহা বর্তমানে কোন্ পথে চলিতেছে, তাহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাই বা কিরূপ ইহাও ছাত্রগণ বুঝিতে পারিবে।

এখানে যে প্রণালীর উল্লেখ করা হইল তাহা কেবল শিক্ষার্থীদিগকে গভীরতর পাঠে এবং কঠোরতর অধ্যাবসায়ে প্রবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা উচিত, বিস্তৃততর পাঠে আত্মনিয়োগ না করিয়া ছাত্রগণ যদি এইরূপ আলোচনা বা বহিরঙ্গকেই উন্নততর পর্যায়ের পাঠ বলিয়া গ্রহণ করে তবে ইহা ক্ষতিকর হইবে। জ্ঞানার্জনের সহজ পন্থা আছে ছাত্রদের মনে এই ধরণের ভাব গড়িয়া উঠিতে দেওয়া কখনই সমীচীন নয়। পূর্বে শিক্ষার্থীকে পাঠ অনুশীলনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত ; তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বর্তমানে পাঠানুশীলনকে অত্যন্ত লঘু এবং আরামের কাজ করিবার ঝোঁক দেখা দিয়াছে। এইখানেই আধুনিক শিক্ষার প্রকৃত বিপদ নিহিত। প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে পাঠ অনুশীলনের জন্য কঠোর মানসিক পরিশ্রম সত্যই উপকারী ছিল কিন্তু এ পদ্ধতি শিক্ষার্থীর বুদ্ধিদীপ্ত অনুরাগ নষ্ট করিয়া ফেলিত, ইহাই ছিল তখনকার শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান দোষ। জ্ঞানার্জনের জন্য মানসিক পরিশ্রমের একান্ত প্রয়োজন আছে কিন্তু পূর্বের শিক্ষাবিদ্গণ ইহাকে যেমন নীরস যান্ত্রিক পর্যায়ে ফেলিয়াছিলেন তেমন না করিয়া অন্য উপায়ে আমাদিগকে ইহার অভ্যাস প্রবর্তন করিতে হইবে। ইহা অসম্ভব বলিয়া আমি মনে করি না। আমেরিকায় এমন দেখা গিয়াছে যাহারা স্কুলের পড়াশুনায় অলস ছিল তাহারাই আইন বা ডাক্তারি পড়িবার সময় কঠোর পরিশ্রমের কাজে স্বেচ্ছায় ব্রতী হয়, তাহার কারণ শেষোক্ত কাজে তাহারা গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। মূল কথা এইখানেই : স্কুলের কাজ গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় ছাত্রের মনে এই বোধ জাগাইয়া দিন, তবেই তাহারা ইহার জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। কিন্তু আপনি যদি কাজটি খুবই সহজ করিয়া দেন তবে তাহারা সহজেই বুঝিতে পারিবে আপনি তাহাদিগকে এমন কিছু দিতেছেন না যাহা

বিশেষ মূল্যবান ও যাহা আয়ত্ত করা পরিশ্রমসাপেক্ষ। হরিণ যেমন কলাগাছে শিং ঠুকিয়া আনন্দ পায় না শক্ত গাছের সঙ্গে শিং ঘষিতে চায় তেমনি বুদ্ধি-সম্পন্ন বালিকবালিকা কঠিন বিষয় আয়ত্ত করিতে আনন্দ বোধ করে। উপযুক্ত পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ভিতর দিয়া ছাত্রদের ভীতি দূর করিতে পারিলে অনেক বালকবালিকা যাহাদিগকে এখন বোকা এবং অলস বলিয়া মনে হয় তাহারাই রীতিমত বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে।

শিক্ষার সকল স্তরেই শিক্ষার জন্য আগ্রহ ও উদ্যম ছাত্রদের মধ্য হইতেই প্রকাশ হওয়া উচিত। শিশুদের মধ্যে কিভাবে এই উদ্যম ও শিক্ষালাভের প্রয়াস সৃষ্টি করা যায় তাহা মাদাম মন্তেসরি দেখাইয়াছেন। অধিক বয়স্ক শিশুদের বেলায় ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়। প্রগতিশীল সকল শিক্ষাবিদই এখন স্বীকার করেন যে, একই শ্রেণীতে অনেক ছাত্র বা ছাত্রী একত্রে কাজ করিতে থাকিলেও ছাত্রের ব্যক্তিগত কাজের উপরই বেশী জোর দেওয়া উচিত। গ্রন্থাগার এবং বিজ্ঞানশালা (laboratory) সুসজ্জিত এবং প্রশস্ত হওয়া উচিত। দিনের বেশ কিছুটা সময় ছাত্র নিজের ইচ্ছামত স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার সুযোগ পাইবে ; সে কোন্ বিষয় পড়িতেছে এবং সে সম্বন্ধে কতটুকু জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া রাখিবে। ইহার ফলে পঠিত বিষয় তাহার স্মৃতিতে স্পষ্টতর হইবে, উদ্দেশ্যবিহীন এলোমেলো পাঠের পরিবর্তে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য পাঠ হইবে উদ্দেশ্য-যুক্ত ; শিক্ষকও ছাত্রকে যখন যেটুকু সাহায্য করা প্রয়োজন তাহা করিয়া তাহাকে ঠিকপথে নিয়ন্ত্রিত করিবার সুযোগ পাইবেন। ছাত্র যত বেশী বুদ্ধিমান হইবে তত কম নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক হইবে। কমবুদ্ধি ছাত্রদিগকে অধিকতর সাহায্য ও পরিচালনার প্রয়োজন হইবে , কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রেও পরিচালনার অর্থ ছাত্রকে কোন নির্দিষ্ট কার্য করিতে আদেশ করা নয়, অভিভাবন (Suggestion), অনুসন্ধান ও উৎসাহ দ্বারা তাহাকে আত্মচেষ্টায় জয়যুক্ত হইতে অনুপ্রাণিত করা। ছাত্রদের জন্য কতকগুলি বিষয় নির্ধারিত করিয়া দিতে হইবে এবং প্রথমে সহজ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ কঠিনের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে কতকগুলি অনুশীলনী তাহাদিগকে আয়ত্ত করাইতে হইবে। এইভাবে তাহারা স্বচেষ্টায় সাফল্যলাভের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাস অর্জন করিতে পারিবে।

যুক্তিতর্ক শিক্ষা :

নিয়মিত অধ্যয়ন ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য কাজ ছাড়াও বালকবালিকাদিগকে বর্তমানকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিতর্কমূলক

প্রশ্নগুলির সহিত পরিচিত করাইতে হইবে। এই প্রশ্নগুলির শুধু একদিকে নয়, সকল দিকের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিতর্ক জানিবার জন্য তাহাদিগকে রীতিমত পড়াশুনা করিতে হইবে। কেহ যদি কোন এক পক্ষ সমর্থনযোগ্য মনে করে তবে তাহার বিপরীত মত পোষণকারীকে যুক্তিতর্ক দ্বারা তাহা বুঝাইতে হইবে। এইভাবে বিতর্ক সভার পরিচালনা করা উচিত। সত্য নির্ধারণের জন্য যথার্থ বিতর্কের যথেষ্ট মূল্য আছে। এই সকল বিতর্কসংকুল প্রশ্নের কোন বিশেষ দিকের প্রতি শিক্ষকের গভীর আস্থা থাকিলেও তাঁহার কোন পক্ষ গ্রহণ করা উচিত হইবে না। যদি প্রায় সকল ছাত্রই এক পক্ষ গ্রহণ করে তখন আলোচনা চালাইবার জন্য কেবল তর্কের খাতিরেই এক পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন একথা বলিয়া তিনি যুক্তিতর্কে অবতীর্ণ হইতে পারেন। তাহা না হইলে তাঁহার কর্তব্য হইবে ছাত্রদের যুক্তি বিষয়বস্তুতে ভুল থাকিলে তাহা সংশোধন করিয়া দেওয়া। এইভাবে বিতর্ক ও আলোচনা দ্বারা ছাত্রগণ সত্য নির্ধারণ করিতে শিখিবে; কথার জাল বুনিয়া বাকযুদ্ধে জয়ী হওয়া তর্ক বা বিতর্কের উদ্দেশ্য নয়।

আমি যদি বয়স্ক বালক বালিকাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইতাম তবে বর্তমান যুগের সমস্যা সংক্রান্ত প্রশ্ন এড়াইয়া চলা এবং ইহাদের সম্বন্ধে প্রোপাগাণ্ডা করা মোটেই বাঞ্ছনীয় মনে করিতাম না। জগৎ সংসারে সকল লোকের নিকট যে-সমস্যা প্রধান বলিয়া মনে হয় তাহা যদি শিক্ষায়তনেও স্বীকৃত ও আলোচিত হয় তবে শিক্ষার্থীরা অনুভব করে যে, তাহারা জগৎ হইতে পিছাইয়া পড়িয়া নাই এবং তাহাদের শিক্ষা তাহাদিগকে জীবনের জন্য প্রস্তুত করিতেছে। তাহারা বুঝিতে পারে যে, পুঁথিগত শিক্ষা তাহাদিগকে বাস্তব জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করে না। কিন্তু আমি আমার নিজের অভিমত ছাত্রদের উপর চাপাইতে চাই না। বাস্তব প্রশ্নের বিশ্লেষণ করিয়া সত্য নির্ধারণ করিতে কিভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যুক্তিপ্রবণ মনোভাব গ্রহণ করিতে হয় তাহারই আদর্শ আমি ছাত্রদের সম্মুখে স্থাপন করিব। আমি আশা করিব ছাত্রগণ বাজে তর্ক ও হৈ-চৈ করার পরিবর্তে সুযুক্তি প্রয়োগ করিতে শিখিবে। রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া এই অভ্যাস খুব মূল্যবান কিন্তু খুবই বিরল। প্রত্যেক উগ্র রাজনৈতিক দল গুটিপোকার মত কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণার আবরণের আড়ালে মানসিক দিক দিয়া নিশ্চেষ্টনিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে। উত্তেজনা অনেক সময় বুদ্ধিনাশ করে; পক্ষান্তরে বুদ্ধিপ্রধান ব্যক্তিগণের জীবনে দেখা যায় বিচার-বুদ্ধি তাহাদের ভাবের আবেগ নাশ করিয়া তাহাদিগকে শুষ্ক নীরস ব্যক্তিতে পরিণত করে। এই দুই অবস্থার কোনটিই কাম্য নয়; এ দুই অবস্থাই

এড়াইতে পারিলেই ভাল। ভাবাবেগ বাঞ্ছনীয় যদি ইহা ধ্বংসমুখী না হয়; বুদ্ধির বেলাতেও সেই কথা খাটে। আমি আশা করিব রাজনৈতিক ভাবাবেগ হইবে গঠনমূলক এবং বুদ্ধি এই আবেগ সফল করিয়া তুলিতে সাহায্য করিবে; বুদ্ধির কাজ হইবে কতকগুলি অলীক কল্পনার রাজ্যে ভাবাবেগকে চালিত না করিয়া বাস্তব এবং প্রকৃত পক্ষে মঙ্গলজনক কার্যে ইহাকে নিয়োগ করা। বাস্তব জগতে আমরা যখন কোন বাঞ্ছিত বিষয়লাভে অসমর্থ হই, তখন আমরা কল্পনার আশ্রয় লই যেখানে চেষ্টা ব্যতিরেকেই আমাদের কামনা তৃপ্তিলাভ করে; বাস্তবের রূঢ় আঘাত মনকে কোমল কল্পনার জগতে ঠেলিয়া দেয়। ইহাই হিষ্টিরিয়া রোগের মূল কারণ। ইহাই উগ্র জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত, ধর্মতত্ত্বগত ও শ্রেণীগত ভ্রান্ত ধারণারও মূল কারণ। ইহা চরিত্রের দুর্বলতার পরিচায়ক; এইরূপ দুর্বলতা বর্তমান যুগে প্রায় সর্বজনীন হইয়া পড়িয়াছে। চরিত্রের এই দুর্বলতা জয় করা বয়স্ক ছাত্রদিগকে শিক্ষাদানের সময় আদর্শ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এই চারিত্রিক দুর্বলতা দূর করিবার দুইটি উপায় আছে, যদিও ইহাদিগকে পরস্পরবিরোধী মনে হইতে পারে। প্রথমত, এই বাস্তব জগতে কতখানি কাজ আমাদের সাধ্যায়ত্ত সে সম্বন্ধে ধারণা বৃদ্ধি করা, দ্বিতীয়ত, রূঢ় বাস্তবতা কেমন করিয়া আমাদের স্বপ্ন কল্পনা ভাঙিয়া দিতে পারে সে সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হওয়া। ঐ উভয় প্রক্রিয়ারই মূলনীতি এক—অলস কল্পনার রাজ্যে ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে বাস না করিয়া আমাদিগকে বলিষ্ঠচিত্ত ও বস্তুনিষ্ঠ হইতে হইবে।

আত্মমুখিতার একটি প্রধান উদাহরণ ডন্‌কুইক্‌সোট। প্রথমে সে যখন একটি শিরস্ত্রাণ তৈয়ার করে, ইহা আঘাত সহ্য করিবার পক্ষে যথেষ্ট শক্ত হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিতে গিয়া সে শিরস্ত্রাণটিকে পিটিয়া বিকৃত করিয়া ফেলে। পরে যখন অন্য একটি তৈয়ার করিল সে আর পরীক্ষা করিয়া দেখিল না, 'মনে করিল' সেটি চমৎকার হইয়াছে। এইরূপ 'মনে করিবার' অভ্যাস তাহার সমগ্র জীবন প্রভাবিত করিয়াছে। অপ্রীতিকর কোন অবস্থার সম্মুখীন না হওয়াও এই একইরূপ মনোভাবের ফল: আমরা সকলেই কমবেশী রকমের ডন্‌-কুইক্‌সোট। ডন্‌কুইক্‌সোট যদি স্কুলে ভাল শিরস্ত্রাণ নির্মাণ করিতে শিখিত এবং তাহার সঙ্গীরা যদি সে যাহা ভাল বলিয়া মনে করে তাহাই বিনা প্রতিবাদে ভাল বলিয়া মানিয়া না লইত তবে সে এরূপ আচরণ করিত না। শিশুরা যখন দুর্বল থাকে এবং মনের বাসনাকে কার্যে পরিণত করিতে পারে না তখন তাহাদের পক্ষে কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করা শোভন এবং স্বাভাবিক। এরূপ মনোবিলাস তাহাদের মানসিক রোগের পরিচায়ক নয়। কিন্তু বয়ঃবৃদ্ধির

সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ইহা উপলব্ধি করা চাই যে কল্পনা কেবল অবাস্তব কল্পনারূপে মনে বাসা বাঁধিয়া থাকিলে কোন লাভ নাই, আগে হোক আর পাছেই হোক কল্পনাকে যতখানি বাস্তবে পরিণত করা যায় ততখানিই ইহার সার্থকতা। বালকেরা যেমন অন্য বালকদিগের ব্যক্তিগত অহংমিকা দূর করিতে পারে এমন আর কেহ পারে না। সঙ্গীদের সঙ্গে মিশিয়া কোন বালকের পক্ষে নিজের অসাধারণ ক্ষমতার বড়াই করা সম্ভবপর হয় না, কেননা তাহাদের নিকট তাহার দোষগুণ বিশেষ ঢাকা থাকে না। কিন্তু অনেক সময় শিক্ষকদিগের সহযোগিতায় নূতন ধরণের দম্ভ ছাত্রদের মনে দানা বাঁধিয়া উঠে যেমন : নিজের স্কুল সকল স্কুলের চেয়ে ভাল, নিজের দেশ সকল দেশের সেরা, নিজের সামাজিক শ্রেণী (ছাত্র যদি অভিজাত বংশসম্ভূত হয়) অন্য যে-কোন শ্রেণী হইতে শ্রেষ্ঠ। এ সমস্তই অবাঞ্ছনীয় মনোভাব। ইহা আমাদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করে যে, আমাদের 'শিরস্ত্রাণ' খুব মজবুত কিন্তু কার্যত হয়ত অন্যের তরবারি ইহা দুই খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতে পারে। এইভাবে নিজের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা আলস্য উৎপাদনে সাহায্য করে এবং শেষ পর্যন্ত অলস কল্পনাবিলাসী লোকদিগকে বাস্তব বিপদের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়।

মনের এই অভ্যাস দূর করিবার উপায় হইল—বিপদ আসতে পারে ভাবিয়া তাহার জন্য মনে মনে প্রস্তুত থাকা এবং ভয়কে সম্পূর্ণরূপে মনে স্থান না দেওয়া। ভয়ের জন্যই মানুষ প্রকৃত বিপদের সম্মুখীন হইতে ইচ্ছা করে না। যে ব্যক্তি নিজের বিপদের কথা চিন্তা করিতেই সাহস পায় না সে যদি হঠাৎ 'আগুন আগুন' চিৎকার শুনিয়া ঘুম হইতে জাগিয়া উঠে, তবে প্রথমেই সে ভাবিবে অন্য কাহারো বাড়িতে আগুন লাগিয়াছে ; এবং আগুন যদি তাহার নিজের বাড়িতেই হয় তবে হয়ত যে সময়ে চেষ্টা করিলে নিরাপদে বাহিরে আসিতে পারিত তাহার পরে সচেতন হইয়া বাহির হইবার পথ পর্যন্ত পাইবে না। অবশ্য কেবল মনোরোগীর ক্ষেত্রেই এরূপ ঘটিতে পারে। কিন্তু রাজনীতিতে এরূপ আচরণ খুবই স্বাভাবিক। যেসকল ক্ষেত্রে চিন্তা দ্বারা সঠিক পন্থা বাছিয়া লইতে হয় সেখানে ভয় মানসিক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া তাহাকে বিঘ্ন উৎপাদন করে এবং বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই ভীত না হইয়া আমরা বিপদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অবহিত হইতে চাই, আর সেই সঙ্গে যাহা অনিবার্য নয় বুদ্ধি এরূপ বিপদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে চাই। যে বিপদ সত্যই অনিবার্য এবং অপ্রতিরোধ্য সাহসের সঙ্গে তাহা গ্রহণ করাই সমীচীন। এরূপ বিপদের ক্ষেত্রে কি করা উচিত তাহা এখানে আলোচ্য বিষয় নয়।

পূর্বের এক অধ্যায়ে ভয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহার পুনরুল্লেখ করিতে

চাই না। বুদ্ধির ক্ষেত্রে ভয় কিভাবে সঠিক চিন্তার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায় এখানে শুধু তাহা বলা হইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে পরবর্তী বয়স অপেক্ষা প্রথম জীবনেই ইহা জয় করা সহজ, কেননা কোন বালক বা বালিকা যদি মতের পরিবর্তন করে তবে তাহাতে এমন কোন গুরুতর বিপৎপাত ঘটে না। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তির জীবন ও কর্মধারা কতকগুলি নীতি ও অভিমতের উপর গড়িয়া উঠে; অকস্মাৎ তাহার পরিবর্তন করিলে বিপর্যয় ঘটা সম্ভব। এইজন্য কিছু অধিক বয়স্ক বালক-বালিকাকে আমি স্বাধীন মতামত প্রকাশ ও বিতর্ক করার সুযোগ দিতে চাই, তাহারা যদি আমি যাহা একান্ত সত্য বলিয়া মানি তাহার সত্যতা সম্বন্ধেও প্রশ্ন করে তবু আমি তাহাতে বাধা দিব না। আমি তাহাদিগকে চিন্তা করিতে শিখাইতে চাই; প্রচলিত গোঁড়া মতবাদ কিংবা তাহার বিরুদ্ধে অভিমত—কোনটিই তাহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিব না, তাহারা নিজেরাই আলোচনা ও বিতর্কের ভিতর দিয়া সত্যের সন্ধান করুক, ইহাই চাই। কল্পিত নীতির (moral) নামে বুদ্ধির বলিদান আমি কখনই সমর্থন করিব না। সাধারণতঃ লোকের ধারণা এই যে, উপদেশ দিতে গেলেই কিছুটা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। রাজনীতিতে আমরা আপন দলের খ্যাতনামা রাজনীতিকদের দোষগুলি গোপন করি। ধর্মনীতিতে ক্যাথলিকরা পোপদের এবং প্রোটেস্ট্যাণ্টরা লুথার ও ক্যালভিনের পাপ গোপন করে; যৌন ব্যাপারে আমরা কিশোরদের কাছে এই ভান করি যে, সংযম প্রভৃতি গুণ আয়ত্ত করা খুব কঠিন নয়। সকল দেশে পুলিস যাহা অবাঞ্ছনীয় মনে করে তাহা বয়স্ক ব্যক্তিদিগকেও জানিতে দেওয়া হয় না এবং ইংলণ্ডে সেন্সর মনে করেন যে মানবসমাজের বাস্তব অবস্থা নাটকের মারফৎ নাট্যমঞ্চে অভিনীত হইতে দেওয়া উচিত নয়, বাস্তব চিত্র দেখাইয়া নয়, ফাঁকিতে ভুলাইয়া রাখিয়াই মানুষকে ধার্মিক ও গুণবান করিয়া তোলা যায় ইহাই তাঁহার ধারণা। এ সমস্তই দুর্বল মনের পরিচায়ক। সত্যের স্বরূপ যাহাই হোক না কেন আসল সত্যই আমাদের জানা উচিত; তাহা হইলেই আমরা যথাযথ বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া কাজ করিতে পারিব। ক্রীতদাসগণ যাহাতে নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিতে না পারে সেজন্য শক্তিমান ব্যক্তি তাহাদের নিকট হইতে সত্য গোপন রাখিবে; ইহার উদ্দেশ্য বোঝা যায় কিন্তু যেখানে গণতন্ত্র বিরাজিত সেখানেও লোকে স্বেচ্ছায় এমন আইন রচনা করিবে যাহাতে সত্য তাহারা জানিতে না পারে! এই বিষয়টি দুর্বোধ্য! দেশের সব লোকই যেন ডনকুইক্‌সোটে পরিণত হইয়াছে। তাহারা যেন জানিতে চায় না যে, তাহাদের শিরস্ত্রাণ তাহারা যেরূপ মনে করে ততখানি শক্ত নয়। এরূপ হীন ভীতি স্বাধীন নরনারীর পক্ষে শোভা পায় না। আমার স্কুলে

জ্ঞানের প্রতিবন্ধক কোন কিছু থাকিবে না। মিথ্যা ও ভাঁওতা দ্বারা নয়, ছাত্রদের প্রবৃত্তি ও আবেগ যথোপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আমি তাহাদের সাহস ও অন্যান্য গুণ বিকাশে সহায়তা করিব। এইরূপ গুণবিকাশের ক্ষেত্রে ভীতিরহিত হইয়া জ্ঞান এবং সত্যের অনুশীলন একান্ত আবশ্যক, নতুবা গুণগুলির বিশেষ কোন মূল্য থাকেনা।

বৈজ্ঞানিক মনোভাবের উন্মেষ :

আমি যাহা বলিতে চাই তাহা এই যে, ছাত্রদের মধ্যে আমি বৈজ্ঞানিক সুলভ মনোভাব গড়িয়া তুলিব। অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী নিজেদের বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রের বাহিরে এই মনোভাব প্রয়োগ করেন না। বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রথম প্রয়াস হইল সত্য নির্ধারণের বাসনা। এই বাসনা যত প্রবল হয় ততই ভাল ইহার সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিজাত কতকগুলি গুণও জড়িত। কোন বিষয় সম্পর্কে প্রথমে অনিশ্চয়তার ভাব থাকিবে, পরে প্রমাণ দ্বারা তাহার সত্যাসত্য নির্ধারণ করিতে হইবে। 'সাক্ষ্য প্রমাণ দেখিয়া কি জানা যাইবে তাহা আমরা আগেই জানি' এই ধরণের মনোভাব পোষণ করা উচিত নয়; 'কিম্বা সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা কিছুই হইবে না'—এই ধরণের আলস্যপ্রসূত সংশয় মনে স্থান দেয়াও অনুচিত। ইহা আমাদের স্বীকার করা উচিত যে, দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আমাদের বিশ্বাসগুলিরও হয়ত কিছু কিছু সংশোধন আবশ্যক হইতে পারে; যে-কোন বিষয়েই চরম সত্য জানা গিয়াছে এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। বিভিন্ন যুগে মানুষের অধিগত জ্ঞানের মাত্রা কমবেশী হইয়াছে। পদার্থ-বিদ্যা সম্বন্ধে মানুষের বিশ্বাস গ্যালিলিওর সময়ের পূর্বে যেমন ছিল, এখন তার চেয়ে আমাদের ধারণা অনেক বেশী সত্য। এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই পূর্ব নির্ধারিত অভিমত একান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিয়া এ সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ করার ফলেই নূতন তথ্য জানা গিয়াছে। এজন্যই প্রাথমিক অনিশ্চয়তার অর্থাৎ পূর্ব হইতেই কোন বিষয় চরম সত্য বলিয়া গ্রহণ না করার একান্ত আবশ্যকতা আছে। ছাত্রদিগকে এই শিক্ষা দিতে হইবে এবং এই সঙ্গে প্রমাণ প্রয়োগের কৌশলও শিখাইতে হইবে। জগতে যখন নানা অভিসন্ধিপূর্ণ নানা লোক মিথ্যা প্রচার করিয়া সকলকে বিভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে তখন সত্য-মিথ্যা যাচাই করিয়া লইবার মানসিক অভ্যাস গড়িয়া তোলা বিশেষ প্রয়োজন। বারংবার একটি মিথ্যা শুনিতে শুনিতে তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করার প্রবণতা বর্তমান যুগের একটি অভিসম্পাৎ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, স্কুলের শিক্ষার ভিতর দিয়া ইহা প্রতিরোধ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

শিক্ষার্থি-জীবনের সমগ্র কালটিই বুদ্ধিগত অভিযানের সময় বলিয়া ছাত্র-দের মনে সজীব তারুণ্যের ভাব জাগাইয়া রাখিতে হইবে। নিজেদের নির্দিষ্ট পাঠ আয়ত্ত করার পর ছাত্রগণ যাহাতে স্বচেষ্টায় নূতন নূতন তথ্য উদ্ঘাটন করিতে পারে সে বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে হইবে; এজন্য তাহাদের প্রতিদিনকার পাঠ খুব গুরুভার হওয়া উচিত নয়। ছাত্রের কাজ প্রশংসনীয় হইলে তাহার প্রশংসা করিতে হইবে; ভুল হইলে তাহা সংশোধন করিতে হইবে কিন্তু ভুলের জন্য তাহাকে নিন্দা করা সঙ্গত হইবে না; বোকামি দেখাইলেও ছাত্রগণ যেন লজ্জা অনুভব না করে। চেষ্টা দ্বারা যে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভবপর এই ধারণা শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বড় প্রেরণা। যে জ্ঞান নীরস, শিক্ষার্থী যাহা লাভে আনন্দ অনুভব করেনা তাহার মূল্য বিশেষ কিছু নাই, সানন্দে সে যাহা নিজস্ব করিয়া লয় তাহাই হয় স্থায়ী এবং কার্যকরী। ছাত্র-দিগকে জ্ঞানের সঙ্গে বাস্তব জীবনের সম্বন্ধ বুঝিতে দিন, জ্ঞানের ভিতর দিয়া কিভাবে জগতের পরিবর্তন সাধন সম্ভবপর তাহাও তাহারা উপলব্ধি করুক। শিক্ষক যেন ছাত্রগণ কর্তৃক সহায়রূপে বিবেচিত হন, স্বাভাবিক শত্রুরূপে নয়। প্রথম কয়েক বৎসরে উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে অধিকাংশ বালক বালিকাই অধিকতর জ্ঞান অর্জনের কাজ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করিবে।

সপ্তদশ অধ্যায়

দিবা স্কুল ও বোর্ডিং স্কুল

কোন বালক বা বালিকা বাড়ি হইতেই স্কুল করিবে, না আবাসিক বিদ্যালয়ের বোর্ডিং-এ থাকিয়া পড়াশুনা করিবে, তাহা অবস্থা এবং মনঃপ্রকৃতি বুঝিয়া নির্ধারণ করা উচিত। উভয় ব্যবস্থারই সুবিধা আছে; কোন কোন বিষয়ে দিবা স্কুল বেশী সুবিধাজনক, কোন বিষয়ে আবার আবাসিক স্কুলের সুবিধা বেশী। আমার নিজের ছেলেমেয়ের শিক্ষার ব্যাপারে আমি কোন্ কোন্ যুক্তি বিবেচনা করিব তাহারই উল্লেখ করিতেছি. বিবেকবান অপর মাতাপিতার নিকটও এগুলি গ্রহণীয় মনে হইতে পারে।

প্রথম বিবেচ্য বিষয় হইল স্বাস্থ্য। স্কুলের সাতাকারের অবস্থা যাহাই হোক না কেন, গৃহ হইতে স্কুলে ছাত্রের স্বাস্থ্যরক্ষার বেশী সুবন্দোবস্ত করা সম্ভবপর, সেখানে সাধারণ চিকিৎসক, দন্তচিকিৎসক, এবং শিশুদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সর্বাধুনিক জ্ঞানসম্পন্না তত্ত্বাবধায়িকা নিযুক্ত করা চলে কিন্তু কর্মব্যস্ত পিতামাতার পক্ষে চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা সহজ নয়। ইহা ছাড়া স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিদ্যালয় অবস্থিত হইতে পারে। সহরবাসী পিতামাতার পক্ষে এরূপ বিদ্যালয়ের প্রতি যথেষ্ট আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। তরুণদের পক্ষে মফঃস্বল অঞ্চলে জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটানোই ভাল; তাহাদের পিতামাতাকে সহরে বাস করিতে হইলে শিক্ষার জন্য তাহারা বোর্ডিং স্কুলে থাকিতে পারে। স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল মনে করিয়া বোর্ডিং স্কুলে ছেলে মেয়ে পাঠাইবার যে যুক্তি তাহাও বেশীদিন প্রয়োগ করা যাইবে না, কেননা সহরেও লোকের স্বাস্থ্য ক্রমশ ভালর দিকে যাইতেছে; লণ্ডনে কৃত্রিম অতি-বেগুনি আলো (ultra violet light) প্রয়োগ করিয়া পল্লী অঞ্চলের অনুরূপ স্বাস্থ্যবিধানের ব্যবস্থা হইতেছে। তবু সহরে রোগের প্রকোপ কমাইতে পারিলেও, শিশুদের স্নায়ুর উপর কুফল বিস্তার করিতে পারে এরূপ বিষয় থাকিবে। অবিরাম শব্দ ও কোলাহল শিশু এবং বয়স্ক সকলের পক্ষেই খারাপ; পল্লীর দৃশ্য, ভেজা-মাটির গন্ধ, বাতাস, নক্ষত্র প্রভৃতি প্রত্যেক নরনারীর স্মৃতিতে জমাইয়া রাখা উচিত। কাজেই আমার মনে হয়. সহরে স্বাস্থ্যের উন্নতি যতই হোক না কেন, বছরের মধ্যে বেশীর ভাগ সময় কিশোর-কিশোরী-দের পল্লী অঞ্চলে বাস করার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

আবাসিক বিদ্যালয়ের পক্ষে আর একটি যুক্তি যদিও খুব প্রবল যুক্তি নয়। অনেকেরই বাড়ির কাছাকাছি ভাল স্কুল থাকে না, বাড়ি হইতে স্কুলের দূরত্ব বেশ কিছুটা হইতে পারে। পল্লীবাসীদের পক্ষে এ যুক্তির গুরুত্ব আছে; স্বাস্থ্যের অনুকূল যুক্তিটি সহরবাসীদের প্রতি প্রযোজ্য।

শিক্ষাপ্রণালীতে যখন কোন নূতন পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তখন আবাসিক বিদ্যালয় না হইলে চলে না কারণ যে সকল পিতামাতা এরূপ পরীক্ষার পক্ষপাতী তাঁহারা যে একই অঞ্চলে বাস করিবেন এবং নিজেদের ছেলেমেয়েদিগকে একই দিবা স্কুলে পাঠাইবেন এরূপ আশা করা যায় না। শিশুদের বেলায় একথা খাটেনা, তাহারা তখনও শিক্ষাকর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ আওতার মধ্যে আসে না। এইজন্য মাদাম মন্তেসার এবং শ্রীমতী ম্যাকমিলান অত্যন্ত গরীব ছেলেমেয়েদের উপর তাঁহাদের শিক্ষাপ্রণালীর পরীক্ষা করার সুযোগ পাইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে বালকবালিকার বিদ্যালয় জীবন শুরু হইলে কেবল ধনীব্যক্তিরাই তাহাদের ছেলেমেয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারে। বেশীর ভাগই পুরাতনী গতানুগতিক পন্থাই পছন্দ করে। যে সামান্য কতকজন নূতনত্ব চায় তাহারা দেশের মধ্যে ইতস্তত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসিয়া তাহাদের ছেলেমেয়েদের একই দিবা স্কুলে পাঠাইতে পারে না। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে বোর্ডিং স্কুলই গবেষণা ও নূতন প্রণালী পরীক্ষার এক মাত্র স্থান হইয়া দাঁড়ায়।

বোর্ডিং স্কুলের বিরুদ্ধে যুক্তিগুলিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। স্কুলে জীবনের অনেক দিকই অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়: স্কুল একটি কৃত্রিম জগৎ, এখানকার সমস্যা আর বাহির্জগতের সমস্যা একই জাতীয় নয়। যে বালক বোর্ডিং-স্কুলে থাকে এবং কেবল ছুটির দিনে বাড়িতে আসে এবং তাহার ফলে সকলেই তাহার প্রতি স্নেহের আতিশয্য প্রকাশ করে সংসার সম্বন্ধে সে যেটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাহার চেয়ে অনেক বেশী অভিজ্ঞতা লাভ করে সেইসব বালক যাহারা প্রতি সকাল-বিকালে বাড়িতে থাকে। মেয়েদের সম্বন্ধে একথা ততখানি সত্য নয় কেননা অনেক বাড়িতেই আজকাল তাহাদিগকে অনেক কিছু করিতে হয় কিন্তু মেয়েদের শিক্ষা যতই বালকদের অনুরূপ হইবে ততই তাহাদের গৃহের জীবনও বালকদের মত হইতে থাকিবে এবং আবাসিক বিদ্যালয়ে বাস করার ফলে গার্হস্থ্য-জীবন সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান লোপ পাইবে। পনর ষোল বৎসর বয়সের পর ছেলেমেয়েদের পিতামাতার পেশা ও সাংসারিক জীবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়; সংসারের সমস্যা বা অভিভাবকদের উৎকণ্ঠা বেশী পরিমাণে তাহাদের উপর চাপিলে পড়া-শুনার বিঘ্ন হইতে পারে কিন্তু

তবু তাহাদের কিছু কিছু উপলব্ধি করা উচিত যে, বয়স্ক ব্যক্তিদের নিজেদের জীবন আছে, আশা আকাঙ্ক্ষা আছে : সংসারের জন্য তাহাদের প্রয়োজনও আছে। স্কুলে কিশোর তরুণ ছাত্রগণই সব : তাহাদের জন্যই সব কিছু করা হয়। ছুটির দিনে, উৎসবের দিনে তরুণদেরই প্রাধান্য। কাজেই আবাসিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের উদ্ধতভাবে গড়িয়া উঠার দিকে ঝোঁক দেখা যায় ; বয়স্ক ব্যক্তিদের জীবনের সমস্যা সম্বন্ধে তাহারা বিশেষ কোন খোঁজ খবর রাখে না, পিতামাতার সংস্রব হইতেও তাহারা দূরে থাকিয়া যায়।

এই অবস্থা কিশোরদের জীবনে কিছুটা খারাপ প্রভাব বিস্তার করে ; পিতামাতার প্রতি তাহাদের ভালবাসা কমিয়া যায় এবং যে সকল লোকের রুচি কর্মজীবন তাহাদের মত নয় এরূপ লোকের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলিবার শিক্ষা তাহারা পায় না। ইহার ফলে স্বার্থপরতা এবং অন্য সকলের সংস্রব হইতে নিজেকে দূরে পৃথক করিয়া রাখিবার প্রবণতা দেখা দেয়। এরূপ মনোভাবের প্রধান প্রতিষেধক হইল পারিবারিক জীবন ; পরিবারে একসঙ্গে বিভিন্ন বয়সের বালক-বালিকা বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ বাস করে, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন কাজ আছে। কিন্তু ছাত্রাবাসে শুধু একই ধরণের প্রায় একই বয়সের লোক বাস করে। এজন্য ইহা পরিবারের অভাব পূরণ করিতে পারে না। সন্তানগণ পিতামাতাকে জ্বালাতন করে বলিয়াই প্রধানত তাঁহারা তাহাদিগকে ভালবাসেন ; পিতামাতা যদি সন্তানদের উপর কাজের চাপ না দেন তবে তাহারাও পিতামাতাকে বিশেষ আমল দিতে চায় না। তবে শাসন এবং কাজের চাপ যেন অস্বাভাবিক না হয় সে বিষয়ে অবশ্য লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অপরের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা তরুণদিগকে শিখিতে হইবে. অন্য যে-কোন স্থান অপেক্ষা গৃহেই ইহা শিক্ষা করা সহজতর। ছেলেমেয়েদের ইহা জানা ভাল যে, তাহাদের পিতাকে অনেক সময় নানা ঝামেলায় বিব্রত থাকিতে হয়, তাহাদের জননীরও সংসারের নানা খুঁটিনাটি লইয়া ঝামেলা কম নয়। কৈশোরে, ছেলেমেয়েরা যখন বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনে প্রবেশ করে সেই বয়ঃসন্ধির যুগে তাহাদের মনে পিতামাতার প্রতি প্রীতিবোধ থাকা চরিত্রগঠনের পক্ষে উপকারী। পারিবারিক প্রীতির সম্বন্ধ না থাকিলে সংসার হয় মাধুর্যবিহীন ও যান্ত্রিক ভাবাপন্ন ; এরূপ সংসারের লোকজন প্রত্যেকেই স্বার্থপরভাবে আত্মপ্রাধান্য লাভের চেষ্টা করে এবং অকৃতকার্য হইলে মুষড়াইয়া পড়ে। স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি অপরের সুখদুঃখের অংশভাগী হইতে পারে না, নিজেদের ব্যর্থতার দুঃখ লাঘব করার জন্য তাহারা অপরের সহানুভূতিও পায় না। গৃহের পরিবেশ হইতে দূরে আবাসিক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়ে শৈশব অতিবাহিত করিলে

এই কুফল ফলে। আবাসিক বিদ্যালয়ের অন্যান্য কতক সুবিধা আছে কিন্তু তাহার সঙ্গে তুলনায় এ-কুফলের গুরুত্বই বেশী।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানী অবশ্য বলেন, পিতা বা মাতার অত্যধিক প্রভাব শিশুর জীবনে খুবই অপকারী। কিন্তু শিশু যেখানে দুই বা তিন বৎসর বয়স হইতেই বিদ্যালয়ে যাইতে শুরু করে সেখানে এরূপ প্রভাবের কোন কারণ আছে বলিয়া মনে করি না। অল্প বয়স হইতেই দিবা-স্কুলে যাইতে আরম্ভ করিলে পিতামাতার অতিরিক্ত শাসন বা একেবারে সম্পর্ক-শূন্যতা—এই দুই চরম অবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভবপর হয়। গৃহের পরিবেশ যদি ভাল হয় তবে বাড়ি হইতে দৈনিক স্কুলে গিয়া পড়াশুনা করাই সর্বোত্তম পন্থা।

বোর্ডিং-এ বাস করার আরো একটি অসুবিধা আছে। ভাবপ্রবণ বালককে সমবয়সীদের সঙ্গে রাখায় অনেক সময় বিপদের কারণ ঘটে। বছর বারো বয়সের বালকগণ সাধারণতঃ দুর্দান্ত ও ভাবপ্রবণ হয়। কিছুদিন আগেও একটি বড় পাবলিক স্কুলে শ্রমিকদলের সমর্থক বলিয়া একটি ছাত্র অন্য ছাত্রগণ কর্তৃক প্রহৃত হইয়া আহত হইয়াছিল। যে-সকল বালক অভিমত ও রুচিতে বেশীর-ভাগের মত হইতে পারে না তাহাদের ভাগ্যেই লাঞ্ছনা ঘটিবার সম্ভাবনা। বুয়োর যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের সর্বাধুনিক ও প্রগতিশীল বোর্ডিং-স্কুলেও বুয়োরদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছাত্রদের উপর অত্যাচার হইত।

যে বালক বেশী পড়াশুনা করিতে ভালবাসে কিংবা নিজের কাজ অপছন্দ করে না তাহারই অন্য সকলের হাতে লাঞ্ছিত হইবার সম্ভাবনা। ফ্রান্সে বুদ্ধিমান ছাত্রদিগকে পাঠান হয় ইকোল নর্মাল সুপিরিয়রে অর্থাৎ উচ্চতর ধরণের বিদ্যালয়ে; সেখানে তাহারা মাঝারি ধরণের ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা করে না। এ ব্যবস্থার সুবিধা আছে, মেধাবী ছাত্রদিগকে জোর করিয়া সাধারণের পর্যায়ে নামাইয়া রাখা হয় না বা অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে কতকগুলি মাঝারি বুদ্ধিসম্পন্ন তরুণের স্তাবকে পরিণত করা হয় না। এরূপ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার ফলে মেধাবী ছাত্রগণ অন্যের অপ্রীতিভাজন হওয়ার হাত হইতে অব্যাহতি পায়। তাহা ছাড়া সকল ছাত্রই তীক্ষ্ণধী হওয়ায় তাহাদের পাঠও দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে, কম বুদ্ধিমান ছাত্র সহপাঠী থাকলে এত দ্রুত পাঠদান সম্ভবপর হইত না। এরূপ বিদ্যালয়ের একটি দোষ এই যে, বুদ্ধিমান লোকদিগকে ইহা সমাজের সাধারণ মানুষ হইতে পৃথক করিয়া দেয়; ইহার ফল ইহাদের পক্ষে সাধারণ মানুষকে বোঝা একটু কঠিন হয়। ইংলণ্ডের সমাজে উচ্চশ্রেণীর বালকদের জন্য যে বিদ্যালয় রহিয়াছে সেখানে ভালরকম খেলাধুলা না জানিলে অসাধারণ প্রতিভাবান বালকের উপরও অত্যাচার করা হইয়া

থাকে। ইহার তুলনায় ফ্রান্সের উন্নত বিদ্যালয়গুলিতে কিছু সম্ভাব্য অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও সেইগুলিই আমার নিকট শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয়।

তবে বালকদের বর্বরতা দুরারোগ্য নয়, বস্তুতঃ পূর্বের চেয়ে ইহা এখন অনেক কমিয়াছে। 'টম ব্রাউন্‌স স্কুল ডে' (Tom Brown's School Day) পুস্তকে যেরূপ বিবরণ আছে বর্তমানে পাবলিক স্কুল সম্বন্ধে তাহা প্রয়োগ করিলে অতিরঞ্জন বলিয়া মনে হইবে। যে সকল বালক বাল্যে উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়াছে তাহাদের পক্ষে ইহা আরো কম প্রযোজ্য। আমার মনে হয় সহশিক্ষা বালকদিগকে ভদ্র হইতে অভ্যস্ত করে। বালক ও বালিকার মধ্যে যে প্রকৃতিগত কোনরূপ পার্থক্য আছে তাহা স্বীকার না করিলেও আমি মনে করি যে বালকেরা নিজেদের সঙ্গে কাহারো মতের গরমিল হইলেই যেমন দৈহিক অত্যাচার করিতে কসুর করে না, বালিকাদের প্রবৃত্তি সেরূপ নয়। কোন বালকের বুদ্ধি যদি অন্যান্য সাধারণ বালকের চেয়ে অধিকতর প্রখর হয়, কিম্বা নীতিজ্ঞান ও ভাবপ্রবণতায় অনন্যসাধারণ হয় অথবা সে যদি রাজনীতিতে রক্ষণশীল ভাবের সমর্থক ও ধর্মমতে গোঁড়া না হয় তবে তাহাকে পাঠানো চলে এমন বোর্ডিং-স্কুল ইংলণ্ডে খুব কমই আছে। এরূপ বালকদের পক্ষে বর্তমানের পাবলিক স্কুলের ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। অথচ অসাধারণ প্রতিভাবান প্রায় সকল ছাত্রই এইরূপ ছাত্রের দলভুক্ত।

বোর্ডিং-ইস্কুলের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যে যুক্তিগুলি আলোচনা করা হইল তাহার মধ্যে দুইটিই প্রধান এবং অপরিবর্তনীয়—একটি স্বপক্ষে, একটি বিপক্ষে। স্বপক্ষে যুক্তি হইল—পল্লীর স্বাস্থ্য, ফাঁকা আলোবাতাস, প্রশস্ত জায়গার সুবিধা; বিপক্ষে যুক্তি হইল—পারিবারিক স্নেহপ্রীতি এবং কর্তব্যবোধ শিক্ষার অসুবিধা। যে-সকল পিতামাতা পল্লীতেই বাস করেন তাঁহাদের পক্ষে বোর্ডিং-স্কুলের স্বপক্ষে অন্য যুক্তি আছে—যেমন, কাছাকাছি কোথাও ভাল দিবা স্কুল না থাকা। বোর্ডিং-স্কুলের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে এমন যুক্তি রহিয়াছে যে, কোন্‌টি শ্রেয় তাহা নির্ণয় করা সত্যই কঠিন। ছেলেদের স্বাস্থ্য যদি খুব ভাল হয় তবে বোর্ডিং স্কুলে থাকিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে এ যুক্তির জোর কমিয়া যায়; আবার ছেলেরা যদি পিতামাতার প্রতি অনুরক্ত হয় তবে বাড়িতে থাকিয়া স্কুল না করিলেই যে তাহারা পিতামাতার প্রতি প্রীতিশূন্য হইয়া পড়িবে এ যুক্তিও দুর্বল হইয়া পড়ে। কেননা ছুটির মধ্যে তাহারা বাড়িতে আসার সুযোগ পাইবে এবং পারিবারিক স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইবে না। দীর্ঘ ছুটির মধ্যে বাড়িতে থাকিলে স্নেহের বাড়াবাড়িও বেশী থাকিবে না। অসাধারণ প্রতিভাবান বালকের বোর্ডিং স্কুলে না যাওয়াই ভাল, সে যদি অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ হয়

তবে তাহাকে স্কুলে না পাঠানই সমীচীন। অবশ্য ভাল স্কুল খারাপ গৃহের চেয়ে শ্রেয় এবং ভাল গৃহ খারাপ স্কুলের চেয়ে বাঞ্ছনীয়। যেখানে দুইটিই ভাল সেখানে অবস্থা বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

ধনশালী অভিভাবকগণ নিজেদের ইচ্ছামত সন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন; এ পর্যন্ত এরূপ অভিভাবকের দিক হইতে প্রশ্নটি বিবেচনা করা হইয়াছে। রাজনৈতিক দিক হইতে বিবেচনা করিলে এই প্রসঙ্গে আরো অন্য প্রশ্ন ওঠে। বোর্ডিং-স্কুল পরিচালনার ব্যয়ের কথা আছে, আবার শিশুদিগকে গৃহ হইতে সরাইয়া লইলে বাসগৃহের সমস্যা কতটা সহজ হয় সে বিষয়ও বিবেচনা যোগ্য। আমার দৃঢ় অভিমত এই যে, খুব অল্পসংখ্যক ছাত্রকে ব্যতিক্রমস্বরূপ বাদ দিয়া, প্রত্যেকের আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত পুঁথিগত শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, কেবলমাত্র বৃত্তিমূলক শিক্ষা ইহার পরে শুরু করিতে হইবে।

দিবা-স্কুল বোর্ডিং-স্কুলের মধ্যে কোনটি শ্রেয় এ প্রশ্নের উত্তরে উভয়ের পক্ষেই যথেষ্ট বলিবার আছে। তবে টাকার প্রশ্ন বিবেচনা করিলে দিনমজুরদের ছেলেমেয়ের শিক্ষার জন্য দিবা স্কুল বাঞ্ছনীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয়

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা চরিত্র-গঠনমূলক ও বুদ্ধিমূলক যে শিক্ষার আলোচনা করিয়াছি তাহা সমাজের সকল ছেলেমেয়ের জন্যই উন্মুক্ত থাকিবে; কোন গুরুতর বিশেষ কারণ না থাকলেই সে শিক্ষা দিতে হইবে। শিশুর প্রতিভা যদি বিদ্যালয়ে পড়ার দরুন ব্যাহত হয় এবং অন্য ব্যবস্থা করিলে বিকাশ লাভ করে, তবে তাহার জন্য পৃথক ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা উচিত। (মোজার্টকে যদি জোর করিয়া বিদ্যালয়ে পাঠ্যবিষয়গুলি পড়িতে বাধ্য করা হইত তবে ইহা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় হইত; তাহার সঙ্গীত-প্রতিভা হয়ত সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইতে পারিত না।) কিন্তু আদর্শ সমাজেও এমন অনেক লোক থাকে যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করিবে না। এ বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই যে, পুথিগত শিক্ষাকাল একুশ অথবা বাইশ বৎসর বয়স পর্যন্ত বর্ধিত করিলে কেবলমাত্র অল্পসংখ্যক লোকই ইহাতে উপকৃত হইবে। যেসব অলস ধনীর দুলাল এখন পুরাতন ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তাহারা কতকগুলি কায়দা-কানুন এবং বে-হিসেবীরূপে খরচ করার অভ্যাস ছাড়া আর বিশেষ কিছু শেখে না। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কিরূপ ছাত্র নির্বাচন করা উচিত তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য। বর্তমানে দেখা যায়, যাহার টাকা আছে সেই সন্তানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য পাঠায়, পরীক্ষার ফলাফল দেখিয়া স্কলারশিপ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকায় অবশ্য কতক ভাল ছাত্রও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ছাত্র নির্বাচন আর্থিক যোগ্যতা দ্বারা না হইয়া ছাত্রের মেধা ও বুদ্ধির যোগ্যতা দ্বারাই হওয়া উচিত। আঠারো বৎসরের বালক বা বালিকা যদি বিদ্যালয়ে মোটামুটি ভাল শিক্ষা পাইয়া থাকে তবে সমাজে অনেক কিছু উপকারী কাজ করিতে পারে। তাহাকে আরো তিন-চার বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠে বৃথা নিযুক্ত না রাখিলে এই সময় সে সমাজ-সেবার কাজে লাগাইতে পারে। কিরূপ ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান উচিত তাহা নির্ধারণ করিবার পূর্বে আমাদের সমাজ-জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য কি তাহা জানা আবশ্যক।

বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয় তিনটি পর্যায়ের ভিতর দিয়া পার হইয়া আসিয়াছে,

যদিও তৃতীয় পর্যায় এখন পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়কে সম্পূর্ণরূপে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। প্রথম অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় কেবল ধর্মযাজকদের শিক্ষার কলেজ ছিল; মধ্যযুগে উচ্চশিক্ষা কেবল ইহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রেনেসাঁসের যুগে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে নূতন ভাবপ্রবণের যুগে প্রত্যেক অবস্থাপন্ন পুরুষের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এই ভাব ক্রমে প্রসার লাভ করে; পুরুষদের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের শিক্ষা কম হওয়াই উচিত তখন এই ধারণা প্রচলিত ছিল। সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 'ভদ্রলোকের শিক্ষা' চলিতে থাকে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও তাহাই চলিতেছে। এই আদর্শ এক যুগে প্রয়োজনীয় মনে হইয়াছিল কিন্তু এখন ইহা বাতিল হইয়া গিয়াছে। কি কি কারণে এরূপ ঘটিয়াছে প্রথম অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। এই 'ভদ্রলোকের শিক্ষা' আভিজাত্যের উপর নির্ভর করিত কিন্তু গণতন্ত্রে অথবা শিল্পপ্রধান ধনতন্ত্রবাদের যুগে ইহা টিকিয়া থাকিতে পারে না। আভিজাত্য যদি থাকেই তবে বরং শিক্ষিত লোকের দ্বারা গঠিত হইয়াই থাকুক; তবে আভিজাত্য না থাকাই সবচেয়ে ভাল। এ সম্বন্ধে এখন আর আলোচনা করিয়া লাভ নাই; ইংলণ্ডে সংস্কার আইন (Reform Bill) ও শস্য আইন (Corn Law) পাশ করার ফলে এবং আমেরিকায় স্বাধীনতার যুদ্ধে (War of Independence) দ্বারা এ সমস্যার সমাধান হইয়াছে। সত্য বটে এখনও ইংলণ্ডে আভিজাত্যের কাঠামো রহিয়াছে কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত মূল ভাব হইল ধনতন্ত্রবাদসঞ্জাত যাহার সঙ্গে আভিজাত্যের কোন মিল নাই। ধনী ব্যবসায়ীরা তাহাদের পুত্রদিগকে 'ভদ্রলোক' করিবার বাসনায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠায়; ধনীর দুলালরা সেখানে ব্যবসায়ের প্রতি বিরূপ মনোভাব অর্জন করে; অর্থের অভাবে তাহাদের অবস্থা যখন খারাপের দিকে যায়, তখন আবার তাহারা অর্থোপার্জনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে থাকে। কাজেই দেখা যায়, সমাজ-জীবনের পক্ষে 'ভদ্রলোকের শিক্ষার' বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই: বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরিকল্পনা করিবার সময় এরূপ অকেজো শিক্ষাকে উপেক্ষা করা চলে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ক্রমে মধ্যযুগে যেমন ছিল তেমনি বিভিন্ন বৃত্তির ট্রেনিং-স্কুলে পরিণত হইতেছে। ব্যারিস্টার, ধর্মযাজক, চিকিৎসক এবং উপরের স্তরের সিভিল সার্ভিস কর্মচারিগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে: এঞ্জিনীয়ার এবং অন্যান্য ব্যবসায়ে টেকনিক্যাল শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মিগণের অনেকেই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করিতেছে। জগৎ যত জটিল এবং শিল্প যতই বিজ্ঞানের প্রভাবাধীন হইতেছে ততই বিভিন্ন বিষয়ের জন্য দক্ষ লোকের

প্রয়োজন হইতেছে; জটিল বিষয়ে দক্ষতাসম্পন্ন লোক এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে হইতেই বাহির হইতেছে। প্রাচীনপন্থীরা দুঃখ করেন যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের মন্দির বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে বড় টেকনিক্যাল স্কুলে পরিণত হইতে চলিয়াছে, কিন্তু ইহা প্রতিরোধ করার উপায় নাই কারণ ধনতন্ত্রবাদীরা ইহাই চায়; তাহাদের নিকট বিশুদ্ধ জ্ঞান বা কৃষ্টির কোন মোহ নাই। শিল্পের জন্যই শিল্প-সাধনার মত 'অকেজো' শিক্ষা ও আভিজাত্যের আদর্শ, ধনতন্ত্রের কাম্য নয়। যেখানে এখনও ইহার রেশ রহিয়াছে সেখানে বুঝিতে হইবে রেনেসাঁস যুগের ঐতিহ্য এখনও শেষ হইয়া যায় নাই। এই আদর্শের বিলোপ আমার নিকট শোচনীয় মনে হয়; বিশুদ্ধ জ্ঞান আভিজাত্যের অলংকারস্বরূপ ছিল কিন্তু আভিজাত্যের অন্যান্য দোষ এত বেশী ছিল যে তাহার তুলনায় গুণ হইয়াছিল অত্যন্ত হাল্কা। আমরা পছন্দ করি আর নাই করি শিল্পতন্ত্রের হাতে আভিজাত্যের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কাজেই আভিজাত্যের কোন প্রশংসনীয় গুণ যদি রক্ষা করিতে চাই শক্তিশালী কোন নূতন ভাবধারার সঙ্গে তাহার সংযোগ সাধন করিতে হইবে; আভিজাত্যের ক্রমবিলীয়মান ঐতিহ্য আঁকড়াইয়া ধরিতে থাকিলে নূতন যুগের ধনতন্ত্রবাদের আক্রমণের হাত হইতে ইহাকে রক্ষা করা যাইবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ শিক্ষার ধারা যদি জীয়াইয়া রাখিতে হয় তবে অল্প কয়েকজন ভদ্রলোকের অবসর বিনোদনের আনন্দদায়ক উপাদান হিসাবে না রাখিয়া ইহাকে সাধারণ মানুষের সমাজ-জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করিতে হইবে। উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা আমার নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়; শিক্ষার্থীর জীবনে ইহা হ্রাস না পাইয়া দিন দিন বেশী হউক ইহাই আমি দেখিতে চাই। ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায় এরূপ শিক্ষা যে ক্রমশ বিলোপের দিকে যাইতেছে তাহার প্রধান কারণ অল্প ক্রোরপতিদের নিকট হইতে শিক্ষার উন্নতির জন্য মোটা টাকা সাহায্য গ্রহণের অভিলাষ। এই ধনতান্ত্রিক শিল্পপতিগণ কৃষ্টিমূলক শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল নন; অর্থকরী এবং শিল্পের উন্নতিবিধায়ক শিক্ষার প্রতিই যে তাঁহাদের ঝোঁক থাকিবে তাহা স্বাভাবিক। এরূপ অবস্থায় প্রতিকার সম্ভবপর; তবে এজন্য শিক্ষিত গণতন্ত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে, তখন শিল্পপতিগণ যে বিদ্যার কদর বুঝিতে পারে নাই, জনগণই তাহার জন্য অর্থব্যয় করিতে আগ্রহশীল হইবে। ইহা একেবারে অসম্ভব নয়, কিন্তু ইহা সাধন করিতে হইলে আগে সর্বসাধারণের শিক্ষার মান উন্নত হওয়া আবশ্যক। পূর্বে শিক্ষিত পণ্ডিতব্যক্তিগণ (জীবিকার জন্য) ধনবান পৃষ্ঠপোষকের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতেন; আধুনিক যুগের বিদ্বজ্জন যদি সর্বদা অর্থশালী লোকদের কৃপাপ্রার্থী না হন তবে ভাল হয়। শিক্ষা এবং

শিক্ষিত লোক এক বিষয় নয় তবু শিক্ষা ও শিক্ষিত ব্যক্তিকে একত্রে তালগোল পাকাইয়া ফেলা অসম্ভব নয়। একটি কাল্পনিক উদাহরণ মনে করা যাক—একজন শিক্ষিত ব্যক্তি জৈব রসায়নবিত্ত। শিক্ষাদানের পরিবর্তে মদ তৈয়ার করা শিখাইয়া অর্থোপার্জন করিতে পারেন; তিনি অর্থলাভ করিবেন কিন্তু শিক্ষার অবনতি ঘটিবে। শিক্ষিত ব্যক্তির যদি জ্ঞানের প্রতি প্রকৃত অনুরাগ থাকিত তবে মদ তৈয়ারী শিক্ষার জন্য যদি কেহ অর্থদান করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকপদ সৃষ্টি করিতেন তিনি তাহাতে যোগদান করিতেন না। তিনি যদি গণতন্ত্রের পক্ষে থাকিতেন তবে গণতন্ত্রই তাঁহার বিদ্যার যথাযোগ্য সমাদর করিত। এই সব কারণে আমার মনে হয় শিক্ষাবিদ্‌গণ যদি ধনী লোকের নিকট অর্থের প্রত্যাশা না করিয়া জনসাধারণের অর্থের উপরই নির্ভরশীল হন তবেই প্রকৃত কল্যাণ হইবে; বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ধনশালী ব্যক্তিদের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য গ্রহণের কুরীতি ইংলণ্ড অপেক্ষা আমেরিকাতেই বেশী; তবে ইংলণ্ডেও ইহা আছে এবং ক্রমশ বেশী হইতে পারে।

এই সব রাজনীতির প্রভাব ও কার্যপরম্পরার কথা বাদ দিয়া আমি ধরিয়া লইব যে, বিশ্ববিদ্যালয় দুইটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রহিয়াছে; প্রথম, কতকগুলি বৃত্তি বা পেশার জন্য পুরুষ ও নারীদিগকে শিক্ষা দিয়া প্রস্তুত করা; দ্বিতীয়, আশু কোন কিছু লাভের সম্ভাবনা সম্মুখে না রাখিয়াও উচ্চস্তরের জ্ঞান অর্জনের ও গবেষণার সুযোগ দান। কাজেই আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন ছাত্রদিগকে দেখিতে চাই যাহারা এইরূপ বৃত্তি বা পেশার জন্য উচ্চশিক্ষা চায় এবং যাহাদের এমন বিশেষ যোগ্যতা আছে যদ্দ্বারা তাহারা উচ্চশিক্ষাও গবেষণা করিয়া সমাজকে মূল্যবান কিছু দান করিতে পারে। বিভিন্ন বৃত্তি-শিক্ষার জন্য কিরূপ ছাত্রছাত্রী নির্বাচন করা উচিত তাহা এই নীতি দ্বারা নির্ণয় করা গেল না।

বর্তমানে ধনীলোকের সন্তান না হইলে আইন বা চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করা ছাত্রদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, কেননা এ শিক্ষা ব্যয়বহুল; তাহা ছাড়া শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পরই অর্থোপার্জন শুরু হয় না। কাজেই দেখা যায় এই বৃত্তিগুলির জন্য নির্বাচন হয় ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকের সামাজিক ও আর্থিক প্রতিপত্তি দ্বারা, ছাত্রদের কাজের যোগ্যতা ও গুণপনার দ্বারা নয়। উদাহরণ স্বরূপ চিকিৎসাবিদ্যার কথা ধরা যাক। যদি প্রকৃত যোগ্য লোকদিগকেই চিকিৎসা বিদ্যা শিখাইয়া সমাজ-সেবার কাজে নিয়োগ করিতে হয় তবে যাহাদের এ বিষয়ে সব চেয়ে বেশী আগ্রহ, আন্তরিকতা ও প্রবণতা আছে এমন ব্যক্তিদিগকে নির্বাচন করা উচিত। বর্তমানে যাহারা খরচ বহন করিতে সমর্থ কেবল এমন প্রার্থীদের মধ্য হইতেই লোক বাছাই করিতে হয়; কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, যাহারা

চিকিৎসাবিদ্যায় সবচেয়ে পারদর্শিতা দেখাইতে পারিত এমন লোক অর্থাভাবে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করার সুযোগই পাইল না। ইহার ফলে প্রতিভার অপচয় ঘটে। অন্য রকম একটি উদাহরণ লওয়া যাক্। ইংলণ্ড অত্যন্ত জনবহুল দেশ, ইহার বেশীরভাগ খাদ্যই বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। কতকগুলি বিষয় বিবেচনা করিলে বিশেষতঃ যুদ্ধের সময় নিরাপত্তার কথা চিন্তা করিলে বোঝা যায় এদেশে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। এখানকার চাষযোগ্য জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম; তথাপি এগুলি যথাসম্ভব উন্নত প্রণালীতে সুযোগ্যভাবে চাষ করার ব্যবস্থা হয় নাই। বংশানুক্রমিক ভাবেই কৃষকগণ এ পেষা গ্রহণ করে; সাধারণতঃ তাহারা কৃষকদেরই পুত্র। আর কতক কৃষিক্ষেত্র কিনিয়াছে; ইহার জন্য তাহারা টাকা খরচ করিয়াছে তাই বলিয়া কৃষিকাযের যোগ্য নিপুণতা অর্জন করিয়াছে এমন কথা নাই। ডেনমার্কের কৃষকদের চাষের প্রণালী ইংলণ্ডের চাষীদের চেয়ে বেশী ফলপ্রদ কিন্তু এদেশের কৃষকদের তাহা শিখাইবার কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয় না। একজন মোটরচালককে যেমন লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র লইতে হয় তেমনি যে কৃষকই কিছু বেশী পরিমাণ জমি চাষ করিবে তাহাকেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য করান উচিত। সরকারী কাজকর্মে বংশানুক্রমিক নিয়োগপ্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছে কিন্তু জীবনের কোন ক্ষেত্রে এখনও ইহা চলিতেছে। যেখানে ইহা আছে সেখানেই অযোগ্যতা প্রবেশ করিয়াছে। দুইটি সংশোধক নিয়ম দ্বারা এই অযোগ্যতা দূর করা উচিত: প্রথম, উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত কাহাকেও কোন প্রয়োজনীয় কাজে নিযুক্ত হইতে দেওয়া উচিত নয়; দ্বিতীয়, যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক অর্থশালী হোক বা না হোক অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার ব্যয় বহনে তাহাদের সামর্থ্য থাকুক আর নাই থাকুক তাহা বিবেচনা না করিয়া তাহাদের শক্তি ও প্রতিভা বিকাশের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। এই দুইটি নিয়ম পালন করিলে লোকের বৃত্তিগত যোগ্যতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে।

যাহাদের বিশেষ কোন শক্তি বা গুণ আছে তাহা পরিপূর্ণমাত্রায় বিকাশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা উচিত; যাহাদের যোগ্যতা আছে কিন্তু শিক্ষার ব্যয়নির্বাহের যোগ্য অর্থ নাই রাষ্ট্রকর্তৃক তাহাদের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা উচিত। যোগ্যতার প্রমাণ দিতে না পারিলে কাহাকেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা সমীচীন নয় এবং ভর্তি হওয়ার পরও কেহ যদি প্রমাণ দিতে না পারে যে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার এবং সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেছে তবে তাহাকেও থাকিতে দেওয়া উচিত নয়। পূর্বে ধারণা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়

ধনীর দুলালদের আরাম-নিকেতন, তাহারা সেখানে তিন-চার বৎসর আলস্যে ও বিলাসে কাটাইতে পারে, এই ধারণা এখন লোপ পাইতেছে।

যখন বলি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত যুবক-যুবতীদিগকে আলস্যে সময় কাটাইতে দেওয়া উচিত নয় তখন ইহাও আমি বলিতে চাই যে, কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়ম মানিয়া চলাই কাজের প্রকৃত প্রমাণ নয়। ইংলণ্ডে নূতন বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে অসংখ্য বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয় এবং তাহাতে ছাত্রদিগকে হাজিরা দেওয়ানোর ঝোঁক দেখা যায়। মন্তেসরি বিদ্যালয়ে শিশুদের ব্যক্তিগত কাজের স্বপক্ষে যে যুক্তি প্রয়োগ করা হয়, কুড়ি বৎসর বয়সের যুবকদের ক্ষেত্রে —বিশেষতঃ যখন তাহাদের বুদ্ধি ও উদ্যম সাধারণ ছাত্রদের চেয়ে বেশী বলিয়া ধরিয়া লই, তাহাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ কাজে আত্মনিয়োগ করানোর যুক্তি আরো প্রবল। আমি যখন আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট ছিলাম তখন আমার এবং আমার অধিকাংশ বন্ধুর ধারণা হইয়াছিল যে বক্তৃতা দ্বারা কেবল সময়ের অপচয় করা হইত। আমাদের অভিমত অতিরঞ্জিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু খুব বেশী নয়। বক্তৃতার ব্যবস্থা করার আসল কারণ এই যে, দৃশ্যতঃ ইহাকে কাজ বলিয়া মনে হয়, কাজেই ব্যবসায়িগণ ইহার জন্য ব্যয় করিতে রাজী হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যদি সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করেন ব্যবসায়ীরা তাঁহাদিগকে অলস মনে করিবে এবং শিক্ষকের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকিবে। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের প্রতিপত্তির বলেই কিছু পরিমাণে উপযুক্ত প্রণালী অবলম্বন করিতে পারেন ; কিন্তু নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারেন না ; আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবস্থাও এইরূপ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের প্রকৃত প্রণালী এইরূপ হওয়া উচিত : শিক্ষা-বৎসরের প্রারম্ভে শিক্ষক কতকগুলি বই-এর তালিকা দিবেন যেগুলি ছাত্র-দিগকে যত্নের সঙ্গে অধ্যয়ন করিতে হইবে, আর কতকগুলি বই-এর নাম দিবেন যেগুলি সকলে না পড়িলেও কতক ছাত্র পড়িতে পারে। তিনি এমন কতক-গুলি প্রশ্ন জানাইয়া দিবেন যাহা ভালভাবে উত্তর করিতে হইলে বুদ্ধি খাটাইয়া উল্লিখিত বইগুলি হইতে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিতে হইবে। ছাত্রগণ স্বচেষ্টায় অধ্যয়নের ফলে প্রশ্নের উত্তর তৈয়ার করিলে শিক্ষক একে একে প্রত্যেকের উত্তর দেখিবেন। যে সকল ছাত্র তাঁহার সঙ্গে পাঠ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চায় সপ্তাহে একদিন কিংবা একপক্ষকালে একদিন সন্ধ্যায় তিনি তাহাদিগকে আলোচনার সুযোগ দিবেন। প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রায় এই ধরণের ব্যবস্থাই আছে। যদি কোন ছাত্র শিক্ষকের নির্দিষ্ট প্রশ্নের পরিবর্তে নিজেই

প্রশ্ন বাছিয়া লয় তাহাতে আপত্তি করিবার কোন কারণ নাই ; একাজে তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে তবে দেখিতে হইবে তাহার স্বয়ং নির্বাচিত প্রশ্ন শিক্ষক-নির্ধারিত প্রশ্নের সমান কঠিন হওয়া চাই। ছাত্রের লিখিত উত্তরপত্র পরীক্ষা করিলেই তাহার অধ্যবসায় কতখানি তাহা বোঝা যাইবে।

একটি বিষয়ের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষককে গবেষণা কার্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে, তাঁহার অধ্যাপনার বিষয়ে অন্যান্য সকল দেশে কি কি গবেষণা হইতেছে এবং কোথাও কোন নূতন তথ্য বা জ্ঞাতব্য বিষয়ের উপর নূতন আলোকপাত হইতেছে কিনা তাহা অধ্যয়ন করিবার যথেষ্ট অবসর ও অধ্যবসায় তাঁহার থাকা চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের কৌশল একান্ত প্রয়োজনীয় নয়; যিনি যে বিষয় পড়ান সে সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা এবং তৎসংক্রান্ত আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় থাকা চাই। যিনি অত্যধিক কাজের চাপে পরিশ্রান্ত এরূপ লোকের পক্ষে ইহা সম্ভবপর নয়। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার অধ্যাপনার বিষয় তাঁহার নিকট নীরস হইয়া দাঁড়ায় এবং যৌবনে তিনি যাহা শিখিয়াছিলেন তাহাই হয় তাঁহার শিক্ষাদান কার্যে একমাত্র মূলধন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষকের পক্ষে প্রতি সাত বৎসরে এক বৎসরকাল সময় বিদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা অন্য কোন দেশে জ্ঞানার্জনের জন্য কাটানো উচিত। আমেরিকায় এরূপ ব্যবস্থা আছে কিন্তু ইউরোপীয় দেশসমূহের বিদ্যার অহমিকা এতই বেশী যে, এরূপ প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা স্বীকার করিতে চান না। এ বিষয়ে তাঁহারা ভ্রান্ত। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যাঁহাদের নিকট গণিতশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলাম তাঁহারা ইউরোপের অন্যান্য দেশে পূর্ববর্তী কুড়ি হইতে ত্রিশ বৎসর গণিতবিদ্যায় যে অগ্রগতি হইয়াছিল সে সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর রাখিতেন না— আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্রাবস্থায় আমি ভিয়ারষ্ট্রাসের নাম কখনো শুনি নাই। পরে ইউরোপ ভ্রমণের সময় আমি আধুনিক গণিতের সংস্পর্শে আসি। এইরূপ ঘটনা কেবল একক বা একান্ত বিরল ছিল না; অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই ইহা প্রযোজ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে কিছুটা মতানৈক্য আছে: একদল শিক্ষাদানের উপর জোর দেন, অন্যদল গবেষণা কার্যকেই প্রধান মনে করেন। ইহার প্রধান কারণ শিক্ষাদান সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন ছাত্রের প্রবেশ যাহাদের মানসিক ও বুদ্ধিগত শক্তি এবং অধ্যবসায়ের পরিমাণ উচ্চতর শিক্ষার উপযুক্ত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুলের মত শিক্ষাদানের রীতি এখনো কিছুটা রহিয়াছে। ছাত্রদের নিকট বক্তৃতা করিয়া, স্কুলের ছাত্রদের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকেও পাঠ অনুশীলনে বাধ্য করিয়া

সুফল লাভের চেষ্টা করা হয়। ছাত্রদিগকে কাজের জন্য মৌখিক উপদেশ ও উৎসাহ দিয়া কোন লাভ নাই; আলস্যবশতঃ অথবা সামর্থ্যের অভাবে যে কোন কারণেই হোক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের যোগ্যতার পরিচয় দিতে না পারিলে তাহাকে সেখান হইতে বিদায় দিতে হইবে, কারণ এরূপ ছাত্র অন্যত্র কোন কাজে নিযুক্ত থাকিলে বরং সময়ের ও অর্থের বৃথা অপচয় হইবে না। শিক্ষকের বহু ঘণ্টা ধরিয়া অধ্যাপনা করিবার প্রয়োজন নাই; জ্ঞানার্জন সাধনায় তাঁহাকে অবসর সময়ে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে।

মানব-জাতির জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কি কাজ তাহা বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে গবেষণা শিক্ষার মতই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়। নূতন জ্ঞান অবলম্বন করিয়াই ক্রমোন্নতির ধারা চলিয়াছে, ইহার অভাবে বিশ্বের (উন্নতির গতি) প্রগতি থামিয়া যাইবে। বর্তমান সময় পর্যন্ত যে জ্ঞান মানুষের অধিগত হইয়াছে তাহার প্রসার ও ব্যাপক প্রয়োগের ফলে আরো কিছুকাল উন্নতির ধারা অব্যাহত থাকিবে কিন্তু ইহা খুব বেশীদিন চলিবে না। নিছক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যে জ্ঞান তাহাও চিরদিন মানুষের মন অধিকার করিয়া রাখিতে পারে না। বিশ্বরহস্যকে ভালভাবে বুঝিবার জন্য যে নিঃস্বার্থ উদ্যম ও গবেষণায় মানুষ প্রবৃত্ত হয় তাহা হইতেই প্রয়োজনার্থ জ্ঞান উদ্ভূত হয়। প্রথমে মানুষ বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক (theoretical) জ্ঞান অর্জন করে পরে তাহাই প্রয়োজনে খাটানো সম্ভবপর হয়। কোন উচ্চস্তরের তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রয়োজনে লাগানো সম্ভবপর না হইলেও ইহার নিজস্ব মূল্য আছে কেননা বিশ্বের রহস্য সম্বন্ধে অবগত হওয়ায় মানুষ যে জ্ঞানের অধিকারী হয় তাহার মূল্যও কম নয়। বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সংস্থা যদি মানুষের দেহের প্রয়োজন মিটাইতে এবং যুদ্ধ ও নিষ্ঠুরতা দূর করিতে পারে তবে জ্ঞান ও সৌন্দর্যের সাধনা আমাদের মনে সৃষ্টির প্রেরণা যোগাইতে থাকিবে। কবি, চিত্রশিল্পী, সাহিত্যিক অথবা গণিতবিদ্ নিজেদের সৃষ্টিকে কেবল মানুষের প্রয়োজনে লাগাইতে ব্যস্ত থাকুন ইহা আমার কাম্য নয়। ভাবজগতে বিচরণ করিতে স্রষ্টার মানস-গগনে যে নূতন জ্ঞানের প্রথম আলোর আভাস ক্ষীণ আভায় ফুটিয়া উঠে তাহাকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে এবং নবসৃষ্টিতে রূপায়িত করিতে তাহার যে আনন্দ তাহার সহিত তুলনায় জগতের সকল আনন্দ ম্লান হইয়া যায়। জগতে শিল্প ও বিজ্ঞানের যত কিছু উন্নতি, তাহার মূলে আছে দুর্লভকে লাভ করার অদম্য বাসনা; যাহা প্রথমে মনে হয় অবাস্তব কল্পনা তাহাই বৈজ্ঞানিকের সাধনায় বাস্তবে পরিণত হয়; যে রূপ-কল্পনা শিল্পীর ভাবনেত্রে প্রথমে অস্পষ্ট কমনীয় আভায় ফুটিয়া উঠে তাহাই পরে রেখায়, রঙে, সাহিত্যে, শিল্পে মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া উপভোগ্য হইয়া

উঠে। দুর্লভকে লাভ করার সাধনায় মানুষ অকুণ্ঠিত চিত্তে বিপদের মুখে আগাইয়া যায়, সকল রকম কৃচ্ছসাধন স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লয়। যে-সকল লোকের এইরূপ গভীর অনুরাগ ও মানসিক সামর্থ্য থাকে তাঁহাদিগকে প্রয়োজনার্থক কাজের শিকলে বাঁধিয়া রাখিয়া তাঁহাদের প্রতিভা স্ফুরণে বাধা দেওয়া উচিত নয়। কেননা যাহা কিছু মানুষকে মহান করিয়াছে তাহা সবই এই জাতীয় লোকের প্রচেষ্টা হইতে উদ্ভূত।

ঊনবিংশ অধ্যায়

উপসংহার

আমাদের ভ্রমণশেষে পেছন দিকে তাকাইয়া বিহংগ-দৃষ্টিতে আলোচিত বিষয়গুলির উপর এক চোখ বুলাইয়া লই।

শিক্ষকের থাকা উচিত স্নেহ-ধৃত এবং প্রীতিপুষ্ট জ্ঞান; এই জ্ঞান তাঁহার নিকট হইতে ছাত্রগণ অর্জন করিবে। শিক্ষার্থীর বাল্যকালে শিক্ষক তাহার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিবেন; পরে, শিক্ষার্থীর বয়স কিছু বেশী হইলে, শিক্ষকের প্রীতি শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর দিকে চালিত হওয়া আবশ্যক। শিশুর শিক্ষায় কাজে লাগিবে যে জ্ঞান তাহার মধ্যে শারীরবৃত্ত (Physiology) স্বাস্থ্য তত্ত্ব এবং মনস্তত্ত্ব প্রধান; শেষোক্তটি অর্থাৎ মনোবিদ্যার সহিত শিক্ষকের বিশেষ পরিচয় থাকা উচিত। শিশু যেরূপ প্রবৃত্তি ও প্রতিবর্তী (reflex) লইয়া জন্মগ্রহণ করে পরিবেশের প্রভাবে তাহা হইতে নানারূপ অভ্যাস গড়িয়া তোলা যায়, এবং এইভাবে তাহাদের চরিত্রের বৈচিত্র্য সম্পাদন করাও সম্ভবপর। অতি শিশুকালেই এরূপ শিক্ষার প্রকৃষ্ট সময়; কাজেই এই বয়সে আমাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত শিশুর চরিত্রগঠনের কাজে ব্রতী হইতে হইবে। যাহারা বর্তমান জগতের অন্যায় অনাচার জীয়াইয়া রাখিতে চায় তাহারাই বলিবে মানুষের প্রকৃতিকে বদলানো সম্ভবপর নয়। তাহারা যদি বলে যে শিশুর বয়স ছয় বৎসর হওয়ার পর তাহার স্বভাব বদলানো সম্ভবপর নয় তবে তাহাদের কথায় কিছুটা সত্য আছে বলিতে হইবে। যদি তাহারা বলে যে, শিশু যে প্রবৃত্তি ও প্রতিবর্তী লইয়া জন্মে তাহার পরিবর্তন সাধন অসম্ভব তবে তাহাতেও কিছুটা সত্য আছে স্বীকার করিতে হইবে, যদিও সুপ্রজনন (eugenics) দ্বারা হয়ত এক্ষেত্রে সুফল লাভের আশা করা যায়। কিন্তু তাহারা যখন বলে যে, বর্তমান যুগের সাধারণ মানুষ যেরূপ জীবন ও যেরূপ অভ্যাসে অভ্যস্ত হইয়াছে তাহা হইতে অন্য ধরনের আচরণে অভ্যস্ত মানুষ গড়িয়া তোলা অসম্ভব তখন তাহারা আধুনিক মনোবিজ্ঞানকেই উপেক্ষা করিতেছে। দুইটি শিশু যদি একই রকম চরিত্র অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও প্রতিবর্তী এবং অন্যান্য শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে ভিন্ন রকম পরিবেশে লালিত-পালিত করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকম অভ্যাসে অভ্যস্ত বয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত করা যায়। বাল্যকালীন শিক্ষার কর্তব্য হইল শিশুর প্রবৃত্তিগুলিকে এমনভাবে শিক্ষা দিয়া বিকশিত

করা যাহার ফলে শিশুর চরিত্রের প্রয়োজনীয় গুণগুলি সুসমঞ্জসভাবে বর্ধিত হইতে পারে। এইরূপ শিক্ষার ফলে শিশুর মনোভাব ধ্বংসশীল না হইয়া হইবে সৃজনশীল. কোপনস্বভাব না হইয়া সে হইবে স্নেহশীল, সে হইবে সাহসী, সরল এবং বুদ্ধিমান। বেশীরভাগ শিশুর ক্ষেত্রেই এরূপ শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর, যেখানে যেখানে শিশুর উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা আছে সেখানে প্রকৃতই এইরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে। যদি শিশুশিক্ষা সম্পর্কিত আধুনিক জ্ঞান এবং পরীক্ষিত প্রণালী প্রয়োগ করা যায় তবে এক পুরুষকালের মধ্যেই আমরা এমন মানব-সমাজ গড়িয়া তুলিতে পারি যাহা হইবে প্রায়-সম্পূর্ণ রোগমুক্ত, বিদ্বেষমুক্ত এবং মূর্খতামুক্ত। আমরা এরূপ করি না, কারণ আমরা অত্যাচার ও যুদ্ধেরই বেশী পক্ষপাতী।

শিশু যে প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাঞ্ছিত এবং অবাঞ্ছিত উভয় কার্যের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। পূর্বে লোকে প্রবৃত্তিকে শিক্ষার ভিতর দিয়া সুসংস্কৃত করিয়া তুলিবার কৌশল জানিত না। তাহারা দমননীতির আশ্রয় লইত। শাস্তি দিয়া এবং ভয় দেখাইয়া শিশুর গুণগুলির বিকাশের চেষ্টা করা হইত। আমরা এখন জানি যে, দমনপ্রণালী একান্ত ভ্রান্ত, ইহা কখনও সফল হয় না, তাহা ছাড়া ইহা মানসিক বিফলতা সৃষ্টি করে। প্রবৃত্তিকে বাঞ্ছিত পথে চালিত করার জন্য নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। অভ্যাস এবং কৌশল যেন শিশুর প্রবৃত্তিগুলির আত্মপ্রকাশের পথ; পথের গতি যেদিকে প্রবৃত্তিও জলধারার মত সেইদিকে প্রবাহিত হয়। শিশুকে উপযুক্ত অভ্যাস এবং উপযুক্ত কৌশল আয়ত্ত করাইয়া তাহার প্রবৃত্তিকে বাঞ্ছিত কাজে উদ্দীপ্ত করা যায়। শিশুর লোভ দমনের কোন প্রয়োজন হয় না কাজেই জোর জবরদস্তিরও কোন আবশ্যকতা নাই। নিষেধ করিয়া শিশুকে কোন কাজ হইতে নিবৃত্ত করায় তাহার মনে যে নৈরাশ্যের সৃষ্টি তাহা উৎপাদনের কোন কারণ ঘটে না, সকল কাজেই শিশু স্বতঃপ্রবৃত্ততা ও স্বাধীনতা বোধ করে। শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধে যে প্রণালী উল্লেখিত হইয়াছে সকল ক্ষেত্রেই যে তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে হইবে এমন কথা নাই, অদৃষ্টপূর্ব এমন কারণ ঘটিতে পারে যেখানে হয়ত প্রাচীন প্রণালী প্রয়োগ করার আবশ্যকতা দেখা দিবে। কিন্তু শিশু মনোবিদ্যা যতই পরীক্ষিত হইয়া বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে প্রতিপন্ন হইতে থাকিবে এবং নার্সারি স্কুলের অভিজ্ঞতা যতই সঞ্চিত হইতে থাকিবে শিশুর চরিত্রগঠনে নূতন প্রণালী ততই যথার্থভাবে প্রয়োগ করা সহজ হইয়া আসিবে।

আমাদের সম্মুখে যে বিস্ময়কর সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত আছে তাহারই কথা

পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। চিন্তা করিয়া দেখুন ইহার ফল কিরূপ সুদূরপ্রসারী হইতে পারে; স্বাস্থ্য, স্বাধীনতা, সুখ, সহৃদয়তা, বুদ্ধি—সবই প্রায় সার্বজনীন। আমরা ইচ্ছা করিলে এক পুরুষকালের মধ্যেই পৃথিবীতে নূতন মানব-সমাজের সৃষ্টি করিতে পারি।

কিন্তু স্নেহপ্রীতি ব্যতীত ইহার কিছুই সম্ভবপর নয়। জ্ঞান বিদ্যমান আছে; কিন্তু প্রীতির অভাবের কথা চিন্তা করিয়া আমি নিরাশ হইয়া পড়ি— উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যৌনব্যাধিসহ শিশুর জন্ম নিরোধ করার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা হয় না; প্রায় সকল নৈতিক নেতাই এ বিষয়ে নিক্রিয়। ইহা সত্ত্বেও শিশুদের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক যে প্রীতিবোধ আছে তাহা ক্রমশ প্রসার লাভ করিতেছে। সাধারণ নরনারী অন্তরে শিশুর প্রতি যে মমতা ও সহানুভূতির প্রকাশ দেখা যায় কয়েক যুগের নিষ্ঠুরতা তাহা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। ধর্মে দীক্ষিত না হইলে শিশু যে মহাপাতকী হয় এইরূপ প্রচারকার্য হইতে ধর্মপ্রচারকগণ অল্পকিছু কাল আগে মাত্র নিরত হইয়াছেন। উগ্র জাতীয়তাবোধের উত্তাপে মানবতাবোধ শুকাইয়া যায়; যুদ্ধের সময় আমরা এমন অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিলাম যাহার ফলে জার্মানীর সকল শিশু রিকেট রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের স্বাভাবিক মমত্ববোধকে মুক্তি দিতে হইবে; যদি কোন নীতির ফলে শিশুদের উপর অত্যাচার বা দুর্ভোগ প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় তবে আমাদের নিকট প্রিয় যতই হোক না কেন সে নীতি বর্জন করিতে হইবে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নিষ্ঠুর নীতির মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি হইল ভীতি; এইজন্যই বাল্যকালে ভয় দূর করার প্রতি আমি এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছি। আমাদের মনের অন্ধকার-গুহায় যে-ভয় লুকাইয়া আছে তাহাকে নির্মূল করিতে হইবে। আধুনিক শিক্ষাধারা যে সুখপূর্ণ জগতের সম্ভাবনা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে তাহা লাভ করিতে কিছুটা ব্যক্তিগত বিপদ বরণ করিতে হইলেও তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

আমরা যদি কিশোর-কিশোরীদিগকে ভয় ও দমন হইতে মুক্ত রাখিতে পারি, আমরা যদি তাহাদিগকে বিদ্রোহী এবং প্রতিহত প্রবৃত্তিগুলির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারি তবে আমরা তাহাদের নিকট জ্ঞানের রাজ্য সম্পূর্ণ অবারিত করিয়া দিতে পারিব; বিজ্ঞতার সহিত শিক্ষা দিলে তখন শিক্ষাগ্রহণকার্য শাস্তির মত মনে না হইয়া শিশুর নিকট আনন্দদায়ক হইয়া দাঁড়াইবে। শিশুকে এখন যে পরিমাণ শিক্ষণীয় বিষয় শিখানো হয় তার চেয়ে বেশী শিখানো প্রয়োজন হইবে না। শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ ব্যাপারে মনোভাবের পরিবর্তন-সাধনই বিশেষ প্রয়োজন—শিক্ষা ব্যাপারটিকে ছাত্র যেন স্বাধীনতার ভিতর

দিয়া নূতন বিষয় আবিষ্কারের জন্য আনন্দপ্রদ অভিযান বলিয়া মনে করে। শিক্ষা-ক্ষেত্রে এইরূপ ভাবধারা প্রবর্তিত হইলে বুদ্ধিমান ছাত্রগণ নিজেদের চেষ্টায় তাহাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াইতে চেষ্টা করিবে; এ বিষয়ে তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য সকল রকম সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে। জ্ঞান মানুষকে ধ্বংসকারী প্রবৃত্তি ও আবেগ হইতে রক্ষা করে, জ্ঞান বিনা আমাদের আশার জগৎ গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে না। আমাদের নির্জ্জন মনের গোপনস্তরে কুসংস্কারের ভয় লুকাইয়া থাকে কিন্তু সকল বালক-বালিকা যদি নির্ভীক স্বাধীনতার মধ্যে শিক্ষালাভের সুযোগ পায় তবে এক পুরুষকালের মধ্যেই তাহারা আমাদের চেয়ে ব্যাপকতর এবং বলবত্তর আশার অধিকারী হইবে। আমরা দেখিতে পাইব না কিন্তু আমরা যে মুক্ত নরনারী নূতন শিক্ষাব্যবস্থার ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিব তাহারাই নূতন জগৎ দেখিতে পাইবে। প্রথমে দেখিবে তাহাদের আশার স্বপ্নে; পরে দেখিবে বাস্তবের পরিপূর্ণ মহিমায়।

পথ পরিষ্কার। যেরূপ সন্তানপ্রীতি থাকিলে এ-পথ গ্রহণ করিতে বাসনা জাগে তাহা কি আমাদের আছে? কিংবা আমরা নিজেরা যেরূপ দুর্ভোগ ভুগিয়াছি আমাদের শিশুদিগকেও সেরূপ ভুগিতে দিব? আমরা কি তাহাদিগকে নির্যাতন ও নিপীড়নের ভিতর দিয়া বাল্যকাল কাটাইতে দিয়া যৌবনে নিরর্থক প্রতিরোধী যুদ্ধে নিহত হইতে দিব? সুখ-সমৃদ্ধি ও মুক্তির পথে হাজার রকমের ভয় ও বাধাবিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয় কিন্তু প্রেমপ্রীতির শক্তি সবরকম ভয় জয় করিতে পারে। আমরা যদি আমাদের সন্তানদের প্রকৃতই ভাল বাসি জগতে কিছুই আমাদিগকে এই কল্যাণকর কার্য হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইবে না।

॥ শেষ ॥